জিজ্ঞাসা ও জবাব

(৪র্থ খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

লেখক পরিচিতি

ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
জন্ম: ঝিনাইদহ জেলায় ১৯৫৮ সালে।
মৃত্যু: ১১ই মে ২০১৬।

পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান। মাতা বেগম লুৎফন্নাহার।

ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল পর্যন্ত অধ্যয়নের পর ১৯৭৯ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে হাদীস বিষয়ে কামিল পাশ করেন। সৌদি আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬, ১৯৯২ ও ১৯৯৮ সালে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন । দেশ ও বিদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমের কাছে তিনি পড়াশোনা ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক (রাহ.), মাওলানা মিয়া মোহাম্মাদ কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আব্দুল বারী সিলেটী (রাহ.), মাওলানা ড. আইউব আলী (রাহ.), মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহ.), আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয ইবন বায (রাহ.), আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন (রাহ.), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (রাহ.), শাইখ সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল শাইখ, শাইখ সালিহ ইবন ফাওযান ইবন আব্দুল্লাহ আল ফাওযান।

কর্ম জীবনে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৯৮ সালে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের ১১ই মে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ইংরেজী ও আরবি ভাষায় তাঁর প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।

গবেষণা কর্মের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আল ফারুক একাডেমী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রচার ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে 'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১২ সালে Education and Charity Foundation Jhenaidah নামে একটি শিক্ষা ও সমাজ সেবাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষাপ্রচার, ধর্ম প্রচার, দুস্থ নারী ও শিশুদের সেবা ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

জিজ্ঞাসা ও জবাব

(৪র্থ খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদনা

শাইখ ইমদাদুল হক

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

মোবাইল:০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮

dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust

www.assunnahtrust.com

জিজ্ঞাসা ও জবাব (৪র্থ খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
(১৯৫৮-২০১৬)

সম্পাদনা
শাইখ ইমদাদুল হক

অনুলিখন

আল মাসুদ আব্দুল্লাহ

সাফায়াত শাহরিয়ার সাক্ষর

প্রচ্ছদ : আলি মেসবাহ

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২০ ঈসায়ি, জুমাদাল উলা ১৪৪১ হিজরী

প্রকাশক : উসামা খোন্দকার

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

বিক্রয়কেন্দ্রঃ

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮, ০১৭১৬৪৮৯৯৭৫
আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ, মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫, ০১৭১৬৪৮৫৯৬৬

ফুরফুরা দরবার, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা, মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯২৬

হাদিয়াঃ ২২০ (দুইশত বিশ টাকা মাত্র)

Jiggasa O Jawab (Volume-4) (Question & Answer)
by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir.(Rahimahullah)
First Published by As-Sunnah Publications.
As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. January-2020

Price : Taka 220 only

ISBN : 978-984-93633-7-8

প্রকাশকের কথা

প্রশংসা আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন মাহফিলে ও টিভি চ্যানেলে বহু মানুষের যুগজিজ্ঞাসার জবাব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রদান করেছেন। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মাহফিলগুলো ভিডিও ক্যাসেটবদ্ধ করতেন। ফলে তাঁর প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা যেমন সংরক্ষিত রয়েছে; তেমনি তা সংযোজন ও বিয়োজনের হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছে। তিনি তাঁর মৌলিক রচনাগুলো যেমন তথ্যনির্ভর করে সাজিয়ে গেছেন, তেমনি তাঁর যুগজিজ্ঞাসার জবাবগুলোও কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রদান করে গেছেন। বর্তমান জটিল জীবনধারায় তাঁর প্রদত্ত বহু জিজ্ঞাসার জবাব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে ইসলামের আলোর পথ দেখাবে বলে আমরা আশা রাখি। বিভিন্ন ভিডিও ক্যাসেট, টিভি চ্যানেল ও ইউটিউবে থাকা তাঁর প্রশ্নোত্তরমালা সংগ্রহ করে *'জিজ্ঞাসা ও জবাব'* নামে সিরিজ আকারে আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স তা প্রকাশ করছে বলে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। মহান আল্লাহ যেন লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করেন এবং লেখকের রচনাগুলোকে তাঁর জন্য কবুল করেন। পরিশেষে সকলের নিকট দুআ কামনা করি।

উসামা খোন্দকার
চেয়ারম্যান
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট।

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান দয়াময় আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন, সহচর ও কল্যাণ কামনায় প্রলয়দিবস পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর।

আমাদের রব মহান দয়াময়। তাঁর দয়ার অন্যতম নিদর্শন, দুনিয়ার অন্ধকারে কল্যাণপথে চলবার জন্য তিনি আপন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন ওহির জ্ঞান এবং আপন শরীআতে জ্ঞানার্জনকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা। বান্দার কথা ও কর্ম, এমনকি চিন্তাকে পর্যন্ত সঠিকভাবে চালিত করবার জন্য জ্ঞানকে করেছেন সকল বিধানের উপর অগ্রগামী। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্বমানবতা ছিল ধ্বংস ও সর্বনাশের একেবারে দ্বারপ্রান্তে, যেখান থেকে আর একপা ফেললেই সে হারিয়ে যাবে চিরপতনের অতল তলে– যদি আমরা চিন্তাক্তির সবটুকু প্রয়োগ করে মানুষের দ্বারা সম্ভব এমন সকল পাপ ও অপরাধের তালিকা প্রস্তুত করি এবং ইতিহাসের পাতা উল্টে ফিরে যাই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীতে, তবে সেখানে কোনো একটি জনপদ হয়ত এমন পাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে আমাদের প্রস্তুতকৃত অপরাধ ও পাপের তালিকার কোনো একটি পাপ অনুপস্থিত; সেসময়ে মানবতা যেন নিজেদেরকে ধ্বংস ও সর্বনাশের খেলায় ও নেশায় মেতে উঠেছিল– এই ধ্বংস-উন্মুখ, মুমূর্ষু মানবতাকে মুক্তি ও চিকিৎসার জন্য এই মঙ্গলময় কল্যাণকামী সর্বজ্ঞ সত্তা আমাদের উম্মি নবী ﷺ এর নিকট যে আসমানি ব্যবস্থাপত্র পাঠালেন তার সর্বপ্রথম অবতারণ যে মাত্র পাঁচটি আয়াত, সেখান একটি মাত্র আদেশ, দ্বিরুক্ত– 'পড়ো'। এই অবতারণ-দস্তুরই বলে দেয়, মানবতার মুক্তি, সুস্থতা, চিকিৎসা ও সফলতার জন্য 'সর্বস্রষ্টা রবের নামে' পড়ার গুরুত্ব কতটুকু।

পথ-পদ্ধতির ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামে জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প রাখা হয় নি। ইমাম বুখারি রাহ. তাঁর **'কিতাবুস সহীহ'**র একটি পরিচ্ছেদের

শিরোনাম দিয়েছেন, 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞানার্জন'। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব তোমাদের জানা না থাকলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও"।[১] নবীজি ﷺ বলেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ"।[২] অতএব পড়া, শোনা ও দেখা– যে কোনো পথ ও পদ্ধতিতে আমাদেরকে জ্ঞানার্জন করতে আদেশ করা হয়েছে।

জ্ঞানার্জন তাই মুসলিম উম্মাহর কাছে এক মহান ইবাদত। এই উম্মাহর মনীষী পুরুষগণ জ্ঞানের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন জনপদের পর জনপদ। জ্ঞান তাদের কাছে হারানো সম্পদ, জ্ঞানের অন্বেষায় কদম উঠানো 'আল্লাহর রাস্তা', জান্নাতের সহজতম পথ।

মহান আল্লাহ বলেন, "আমি এ উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি আর আমিই তার সংরক্ষক"।[৩] তিনি এই উম্মাতের উলামায়ে কিরামকে দিয়ে আল কুরআন ও তার ভাষ্যবাণী নবীজি ﷺ এর হাদীসকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। যেখানে অন্যান্য উম্মাত তাদের নবীদের তিরোধানের সাথেসাথেই বড় অবহেলায় নিজেদের কিতাব হারিয়ে ফেলেছে, বিস্মৃত হয়েছে, অপসারণ ও বিকৃত করেছে, সেখানে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর কিতাব ও নবী ﷺ এর হাদীস অবিকল সংরক্ষণের জন্য সাধ্যের সবটুকু করেছে। তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আমলি নমুনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং কিয়ামত পর্যন্তই এধারা অব্যহত থাকবে।

আর চৌদ্দশত বছর পরে এই পতনুম্মুখ কালেও উম্মাতের অসংখ্য সদস্য কুরআন-সুন্নাহর বিধান জেনে জীবনে তা প্রতিপালনের জন্য পাগলপারা। যারা নানান কারণে ইসলামকে অ্যাকাডেমিকভাবে জানার সুযোগ পান নি তারা বিভিন্নভাবে আলিমদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে শরীআত পালনের চেষ্টা করেন। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ. ছিলেন এমন অসংখ্য মানুষের জিজ্ঞাসাস্থল।

দিনদুপুরে মেঘমুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সূর্যের পরিচয় দানের জন্য

১. সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ৪৩; সূরা: [২১] আম্বিয়া, আয়াত: ৭।
২. সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬৩১; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-১৬৫৮।
৩. সূরা: [১৫] হুজর, আয়াত: ৯।

একটি শব্দও উচ্চারণ করা যেমন বাহুল্য ও বোকামি, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.কে পাঠক মহলের কাছে পরিচিত করবার জন্য বাক্য ব্যয় করাও তেমনই। আমরা শুধু মহান আল্লাহর দরবারে সকৃতজ্ঞ শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমাদেরকে এই সূর্যসম মহান মনীষীর ইলমি খেদমতের সাথে কোনোভাবে শরীক হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। আর তাঁর নিকট সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই কল্যাণকর্মটি সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

পাঠক, **'জিজ্ঞাসা ও জবাব'** সিরিজের যে বইটিতে আপনি এখন চোখ রেখেছেন তা কোনো লিখিত পুস্তক নয়– এর কিছু প্রশ্ন হয়ত লিখিত, যেসব প্রশ্ন আপনারা বিভিন্ন সময়ে মিম্বারে, ময়দানে ও টিভিতে করেছিলেন। আর জবাবগুলো সবই মৌখিক। তখন স্যার রাহ. আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব আর মুখভরা হাসি নিয়ে আপনাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তখন আপনারা ছিলেন শ্রোতা আর এখন পাঠক।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তথ্য প্রেরক আর অনুধাবনকারী হচ্ছে মস্তিষ্ক। এক্ষেত্রে চক্ষু ও কর্ণের বিরোধ সুস্পষ্ট। কানের পাঠানো যে তথ্যগুলো মস্তিষ্কের জন্য সুখকর ও সহজবোধ্য, ঠিক সে তথ্যগুলোই যখন চোখ পাঠায় অবিকলভাবে তখন অনেক সময় তা হয়ে পড়ে বিরক্তিকর ও দুর্বোধ্য। উচ্চসাহিত্যমান সম্পন্ন সুলিখিত কোনো প্রবন্ধ, যার পাঠ আপনাকে মুগ্ধ, মোহিত ও আনন্দিত করেছে, সেটি একই গাঁথুনিতে যখন কোনো মঞ্চের বয়ান বা ওয়াযে আপনাকে শোনানো হবে আপনি বিরক্ত হয়ে পড়তে পারেন। তেমনি কোনো মঞ্চ কাঁপানো, দর্শক মাতানো বক্তব্য যখন হুবহু লিখিত হয়ে চোখের সামনে আসে তখন তা সম্পূর্ণ অখাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এজন্যই লেখা ও বলার রয়েছে আলাদা আলাদা ধাঁচ।

পাঠক, স্যার রাহ.র হাসিমুখ দেখতে দেখতে যে জবাবগুলো এক সময় আপনারা শ্রবণ করেছেন এখন হতে যাচ্ছেন তার পাঠক। কিন্তু এক্ষেত্রে চক্ষু-কর্ণের বিরোধ যেন আপনার মস্তিষ্ককে পীড়িত না করে সে জন্য আমরা আমাদের সীমা ও সাধ্যের ভেতর থেকে চেষ্টা করেছি। তবে এদিকেও ষোলোআনা খেয়াল রাখা হয়েছে, যেন মূল বক্তব্যের মর্ম কোনোভাবেই

ব্যাহত না হয়, আবার বক্তব্যের কথ্য আমেজ হারিয়ে সম্পূর্ণ লেখ্যাকৃতে পরিণত না হয়। আমরা চেয়েছি, এই সঙ্কলনটি পাঠ করতে গিয়ে আপনি একই সাথে পাবেন বক্তব্য শ্রবণ ও প্রবন্ধ পঠনের স্বাদ।

'*জিজ্ঞাসা ও জবাব*' সঙ্কলনটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনের করা প্রশ্নের জবাবের সঙ্কলন হওয়ার কারণে একই প্রশ্নোত্তরের রিপিট হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একই বিষয়ের একাধিক প্রশ্নের জবাবগুলোতে অতিরিক্ত ভিন্নভিন্ন কিছু তথ্য বা বিষয় থাকলে আমরা সবগুলো প্রশ্নোত্তরই অবিকল রেখে দিয়েছি। তবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নোত্তরকে মূল রেখে অন্য উত্তরগুলোর অতিরিক্ত উপকারী অংশগুলো তার সাথে বিন্যাস্ত করে দেওয়া যেত। চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য আমরা এই চিন্তাটা তুলে রাখছি এবং পাঠকের সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। পাঠকের জন্য সুবিধাজনক ও উপকারী হত প্রশ্নোত্তরগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজাতে পারলে। সেজন্য প্রয়োজন প্রশ্নোত্তরের পুরো ভাণ্ডারটা লিখিত হয়ে যাওয়া। তাই এই বিষয়টাও আমরা চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য রেখে দিচ্ছি। তবে এ খণ্ডের ভেতরের বিষয়গুলোকে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে শুরুতে একটা সূচিপত্র সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও পাঠক দেখতে পাবেন, প্রশ্নে লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু পয়েন্ট স্যার উত্তরে আলোচনা করেছেন। প্রধানত তিনটি কারণে এমনটি হয়েছে। টেলিভিশনের লাইভ প্রোগ্রামে স্যার কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, তখন হয়ত কোনো দর্শক-শ্রোতা ফোনে প্রশ্ন করলেন। উপস্থাপক প্রশ্নটির কিছু পয়েন্ট ইঙ্গিতে লিখে রাখলেন এবং চলমান প্রশ্নের জবাব শেষ হলে স্যারকে তার লেখা ইঙ্গিতের আলোকে প্রশ্নটি করলেন। কিন্তু কোনো পয়েন্ট হয়ত বাদ পড়ে গেছে। যেটা স্যার নিজের স্মৃতি থেকে জবাব দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের লিখিত প্রশ্নে আসে নি। স্যারকে লিখিতভাবে প্রশ্ন করলে সবসময় তিনি পুরোটা প্রশ্ন শব্দ করে পড়তেন না, কিন্তু জবাব দিতেন। প্রশ্নের সেই নিঃশব্দে পঠিত অংশ আমরা লিখতে পারি নি। কেননা আমরা তো লিখেছি রেকর্ড থেকে শুনে। আবার কখনো স্যার রাহ. মনে করেছেন, এই প্রশ্নের মৌলিক জবাবের সাথে অতিরিক্ত কিছু কথা না বললে শ্রোতার জন্য বিষযটি বোঝা কষ্টকর হবে অথবা তিনি ভুল বুঝতে পারেন। কখনো তিনি প্রশ্ন শুনে ভেবেছেন, সমাজে এ সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান। যে কারণে শুধু

প্রশ্নের উত্তরটুকু যথেষ্ট নয়। তখন তিনি অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কথা বলে সমাজের ভ্রান্তি দূর করতে চেয়েছেন। কেননা পর্দার সামনে শুধু একজন প্রশ্নকর্তা নয়, বরং সেখানে বসে আছে গোটা একটি সমাজ।

সাধারণতই লিখিত বক্তব্যের মতো মৌখিক বক্তব্য উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ হয় না। তবে স্যার রাহ. এক্ষেত্রে ছিলেন অনেকটা ব্যতিক্রম। এসব প্রশ্নের মৌখিক জবাবেও যথেষ্ট কোটেশন তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণত রেফারেন্স দেন নি। আমরা তাঁর উদ্ধৃতিগুলোর পাশে রেফারেন্স সংযুক্ত করে দিয়েছি। তবে তার অর্থ এই নয় যে, উদ্ধৃতিটি শুধু আমাদের উল্লেখিত রেফারেন্স গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ, এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থে তা থাকতে পারে।

বিভিন্ন হাদীসের বইয়ের একাধিক অনুবাদ বাজারে আছে। সেসব অনুবাদের একটার সাথে আরেকটার হাদীস নাম্বারের অনেক অমিল রয়েছে। তাই পাঠক, বাজারের যেকোনো অনুবাদ হাতে নিয়ে যদি আমাদের উদ্ধৃতির সাথে মেলাতে যান হয়ত মিলবে না। আমরা হাদীসের মতন ও নাম্বার সংযোজন করেছি **'মাকতাবা শামিলা'** থেকে। একই হাদীস যখন একাধিক সঙ্কলক তাদের নিজনিজ সঙ্কলনে বা একই সঙ্কলক তার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন সেক্ষেত্রে শব্দের তারতম্য ঘটেছে এবং কোথাও অংশবিশেষ, কোথাও পূর্ণ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। পাঠক সাধারণকে কোটেশন মেলানোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

কুরআন-হাদীসের কোটেশন উল্লেখ করে স্যার রাহ. সর্বত্র হুবহু অনুবাদ করেন নি। আগে বা পরের বক্তব্যের মধ্যে মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও সবক্ষেত্রে অনুবাদ সংযোজনের প্রয়োজন মনে করি নি। কোথাও সংযোজন করলে তা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রেখেছি। পাঠক দেখতে পাবেন, তিনি কখনো পূর্ণ কোটেশন উল্লেখ করে অংশবিশেষের অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন, আবার কখনো আয়াত বা হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও তেমনই রেখে দিয়েছি। তবে দুআর ক্ষেত্রে স্যার যেখানে আংশিক বলে ইঙ্গিত করে থেমে গেছেন, পাঠকের সুবিধার্থে আমরা সেখানে হাদীসের কিতাব থেকে পূর্ণ দুআ সংযোজন করে দিয়েছি।

স্যার রাহ. ছিলেন অত্যন্ত শরীফ তবিয়তের মানুষ। ছোটবড়, দূরের, কাছের

সবাইকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন এবং হাসি মুখে কথা বলতেন। কিন্তু পাঠক, দেখবেন অনেক জবাবের ক্ষেত্রে স্যার প্রশ্নকর্তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি এমনটি করেছেন যখন বুঝতে পেরেছেন, এই প্রশ্নকর্তা তাঁর ছাত্র বা সন্তানতুল্য অত্যন্ত স্নেহভাজন কেউ।

উলামা ও আয়িম্মায়ে কিরামের প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনের ধারা অনেক প্রাচীন। অনেকেরই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলিত হয়ে উম্মাতের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং ইলমি আকাঙ্ক্ষার পিপাসা মিটিয়েছে। তার ভেতর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রাহ.র **'মাজমুউল ফাতাওয়া'** সমাদর, গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতায় অনন্য। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ. যে দরদ ও কল্যাণেচ্ছা নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং উম্মাতের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন, আমাদের আশা, মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনকেও সমাদৃত, উপকারী ও দীর্ঘস্থায়ী করবেন।

'জিজ্ঞাসা ও জবাব' সিরিজের এখণ্ডটির শ্রুতিলিখন করেছে স্নেহাস্পদ ***আল মাসুদ আব্দুল্লাহ ও সাফায়াত শাহরিয়ার সাক্ষর*** । মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে এ সঙ্কলনটির ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে কবুল করে নেন। একে অনুলেখক, সম্পাদক, ব্যবস্থাপক, প্রকাশক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক– সকলের নাজাতের ওয়াসীলা বানিয়ে দেন। একাজের মূল ব্যক্তিত্ব ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.র সকল উত্তম কর্মকে কবুল করেন, তাকে উম্মাতের জন্য কল্যাণকর করেন, তাঁর সকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে আপন রহমতের কোলে আশ্রয় দেন, তাঁর প্রিয় বান্দাদের সর্বোচ্চদের কাতারে শামিল করে নেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে তাঁর সাথে একত্রিত করেন। আমীন! সালাত ও সালাম আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন ও সহচরগণের উপর।

ইমদাদুল হক
মাদরাসাতুত তাকওয়া
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

সূচিপত্র

ঈমান/আকীদা

প্রশ্ন: ০১। তাকওয়ার লেভেল বাড়ানোর উপায় কী?

উত্তর: ব্যক্তিগতভাবে সবসময় আল্লাহ তাআলার সুন্নাত যিকির করা। মাঝে মাঝে সোহবত অর্জন করা। নেককার মানুষদের সাথে বসা। এবং তাদের সাথে বসে দীনের আলোচনা করা। নিয়মিত কুরআনের তরজমা, হাদীসের তরজমা, নিয়মিত ১০ থেকে ২০ মিনিট পড়া। যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রবণতা। আরেকটা জিনিস, আপনাদেরকে বলি, আমার আমেরিকার একভাই একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা অনেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক চিন্তা করছি, কিন্তু আমাদের পরিবারের খুব খারাপ অবস্থা। উনি বললেন, আমি প্রতিদিন ১০ মিনিট আমার প্রাইমারি লেভেলের ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটু ইসলামি আলোচনা করি। আমি বলি, চিল্ড্রেন! টাইম অব হালাকা। ওরা জানে, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। আমি ভেবেছিলাম, ১০ মিনিট মনে হয় খুব কম। কিন্তু একবছরে ওদের আকীদার লেভেল অনেক বেড়ে গেছে। Knowing Allah, Knowing Prophet এরকম কয়েকটা বই উনি শেষ করেছেন। ওদের ঈমান-আকীদার লেভেল এত বেড়ে গেছে ওরা যেখানে যেটা শোনে, প্রশ্ন করে। আমি সেটার কাউন্টারে কিছু হলেও বলি। আমার অনুরোধ হল, আমাদের তাকওয়া লেভেল বাড়ানোর জন্য, প্রত্যেকে নিজের পরিবারে সকল সদস্য নিয়ে অন্তত

১০ /১৫ মিনিট আমরা বসি। ওরা যেন বিরক্ত না হয়, যদি লম্বা করে একবারে ওয়ায মাহফিল করে ফেলি, এত বিরক্ত হবে যে, ওরা আর বসবে না। আমরা তাদেরকে নিয়ে বসি, এতে আমাদের তাকওয়া বাড়বে এবং তাদে ঈমান ও তাকওয়া উজ্জীবিত হবে। আল্লাহ তাওফীক দিন।

প্রশ্ন: ০২। আল্লাহ তাআলা তাঁর সিফাতি নামগুলো কি তিনি নিজেই রেখেছেন? নাকি এগুলো আল্লাহর রসূল রেখেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তাআলার নামগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই জানতে হবে। এখানে একটা মূলনীতি আমাদের বুঝতে হবে। গায়েবি জগত সম্পর্কে, আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে, আল্লাহর মর্যাদা সম্পর্কে, জান্নাত-জাহান্নাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মর্যাদা– এগুলোর ব্যাপারে আমাদের ওহির ওপর নির্ভর করতে হবে। আল্লাহ তাআলাকে আল্লাহ তাআলা নিজেই সর্বোচ্চ এবং সঠিকভাবে জানেন এবং তিনি তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার নামগুলো কুরআন এবং সুন্নাহ থেকেই জানতে হবে। এটাকে কেউ বানিয়ে বলতে পারে না। বরং বানিয়ে বলাটা অবৈধ। কুরআনে আল্লাহ যে নাম নিজের জন্য ব্যবহার করেন নি, হাদীসে যে নাম রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জন্য বলেন নি, এই নাম বলা উচিত নয়। আমাদের সমাজে আলিমদের ভেতরে 'কাদীম' একটা শব্দ আল্লাহ তাআলার সিফাতি নাম হিসাবে বলা হয়, প্রাচীন অর্থে। এটা কুরআনে আল্লাহ তাআলার নামে নেই, হাদীসেও নেই। কাজেই এই নামটা ব্যবহার করা আমাদের জন্য ঠিক নয়। এর বদলে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

[তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত এবং তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।][১]

১. সূরা [৫৭] হাদীদ, আয়াত: ০৩।

আল্লাহ তাআলার নামগুলো নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন। আল্লাহকে জানতে হলে, আল্লাহর মা'রিফাত, আল্লাহর মুহাব্বাতের জন্য এই বিশেষণগুলো জানা দরকার। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, এই নাম দিয়ে, এই নামের অসীলা দিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকো।[২] আল্লাহর নামগুলোর ব্যাপারে কাফিররা ভিন্নমত পোষণ করত। আরবের মুশরিকরা একেশ্বরবাদী, অর্থাৎ আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করত। আল্লাহর ইবাদত করত, আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে মানত। তাহলে তারা শিরক করত, আল্লাহর পাশাপাশি অন্যদের ইবাদত করত। আর আল্লাহ নামের ব্যাপারে বিতর্ক করত। তারা আল্লাহকে রহীম বলত, খালিক বলত, কিন্তু রহমান বলত না। এই নামের ব্যাপারে আপত্তি করত। এজন্য আল্লাহর নামগুলো আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে এই এই নামে ডাকা যাবে।

এই নামগুলো নিয়ে এখন বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলছেন, এগুলো নাকি দেবদেবীর নাম। এটা আসলে মূর্খতা। অনেকেই এতবড় মূর্খ যে, মূর্খতার কোনো শেষ নেই। বিষয়টা খুব সহজ। আরবের কাফিররা আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামীন বিশ্বাস করত। তারা কোনো দেবদেবীকে রহমান রাহীম কারীম হান্নান মান্নান হত না। যেমন আমাদের মুসলিমদের যারা দেবদেবী হয়ে গেছে– গাউস কুতুব ওলি আবদাল– এদের কাউকে আমরা আল্লাহর নাম বলি না। হিন্দুদের ভেতরে যারা এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন, দেব-দেবীদেরকে ঈশ্বরের যে মূল এট্রিবিউট, তা কিন্তু দেন না। তাদের ভিন্ন নাম থাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলার যে নামগুলো

---

২. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত: ১৮০।

এগুলো কখনোই দেবদেবীদের নাম নয়। দেবদেবীদের নিজস্ব নাম ছিল, লাত মানাত উজ্জা হাবল। এবং এই দেব-দেবীদেরকে আরবের মুশরিকরা কখনোই রাহীম কারীম হান্নান মান্নান বলত না। তাদেরকে তাদের নামে ডাকত। যেমন আমাদের সমাজের দেব-দেবীদেরকে তাদের নামে ডাকা হয়, কিন্তু বলা হয় না, অমুক দেবী সর্বশক্তিমান, অমুক দেবী সৃষ্টিকর্তা, অমুক দেবী সর্বশ্রোতা। এরকম বলা হয় না। বলা হয় অমুক দেবী অমুক বিষয়ের দেবী। কাজেই আল্লাহ তাআলার নামগুলো কোনো দেবদেবীর নামে ব্যবহার হত এটা নিরেট মূর্খতা। এটা আরবের ইতিহাস; আরবের ধর্মে এর অস্তিত্ব নেই। কারণ আরবরা নিজেরাই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বিভিন্ন নাম আরোপ করত, বাকি কিছু নাম নিয়ে তারা বিতর্ক করত। আর কোনো দেবদেবীর নামে তারা এই নামগুলো ব্যবহার করেছে এটার প্রমাণ ঐতিহাসিকভাবেও নেই যৌক্তিকভাবেও নেই। কেউ যদি বলে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় মূর্তির নাম ঈশ্বর, তাহলে তাকে কী বলবেন? এটা একটা নিরেট ও অকাট মূর্খতা। আমরা যদি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলি, গির্জায় যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটা আছে ওটার নাম ঈশ্বর গড। এটা কেউ মানবে না। মানুষের মূর্খতা দূষণীয় নয়, মূর্খ নিজেকে জ্ঞানী মনে করলে এটা দূষণীয়। যে মানুষ যে বিষয়ে জানে তার সেই বিষয়ে কথা বলা উচিত। যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে কথা বলা ডাবল মূর্খতা। আমরা বলি জাহিলে মুরাক্কাব। মূর্খ এবং যিনি জানেন না যে তিনি মূর্খ। ঈশ্বরের কোনো মূর্তি কেউ করে না, গডের কোনো মূর্তি কেউ করে না। আরবের কাফিররা একেশ্বরবাদী, এক আল্লাহয় বিশ্বাসী, এক আল্লাহর উপাসক ছিল। যেমন ভারতের হিন্দুরা এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী, তারা যেমন বিভিন্ন দেবদেবীর ইবাদত কর, আরবের কাফিররা আল্লাহর ওলি, নবী বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আল্লাহর মধ্যস্থ হিসাবে ইবাদত করত। কাজেই যিনি বলেছেন, কাবা ঘরে বড় মূর্তি ছিল তার নাম ছিল আল্লাহ, তিনি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ,

ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, অন্যান্য বিশ্বের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, তিনি নিরেট মূর্খ, কিন্তু নিজেকে জ্ঞানী দাবি করছেন।

প্রশ্ন: ০৩. একভাই প্রশ্ন করেছেন। আমার একবন্ধু আমাকে কোনো একজন আল্লাহওয়ালা লোকের কাছে নিয়ে গেল। যাওয়ার পরে দেখলাম তার পায়ের উপরে মানুষ সিজদা করছে। আরও যা বুঝলাম, এখানে শরীআত বিরোধী কাজ হয়। এই জাতীয় মানুষের কাছে আমাদের যাওয়া উচিত কি না?

উত্তর: প্রথম কথা হল আমরা মানুষের কাছে কেন যাব? 'কেন যাব' প্রশ্নটা থেকেই সকল সমস্যার উৎপত্তি। এই যে বিশ্বে মানুষ শিরক করে। কোনো নাস্তিক তো শরিক করে না। শিরক করে কে? যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আল্লাহর মমতা-মায়া পাওয়ার জন্য একটা মধ্যস্থ খোঁজা, এটার নামই হল শিরক। মানুষ না বুঝে এ শিরকের মধ্যে পড়ে। কখন? আমি গুনাহগার। আল্লাহ বোধহয় আমার কথা শুনবে না। আমি একজন আল্লাহওয়ালা মানুষের কাছে গেলে, আমার কথা তিনি আল্লাহকে বলে দিলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি শুনবেন। যেমন একজন দুষ্টু ছাত্রের কথা স্যার শুনতে চায় না। ভালো ছেলের কথা শোনে। কাজেই দুষ্টু ছেলেটা ভালো ছেলেকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে দেয়। এই হীনমন্যতা থেকে সকল শিরকের শুরু। কারণ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক মায়ের সাথে সন্তানের সর্ম্পকের চেয়েও গভীর। কোনো সন্তান কখনোই মনে করে না– আমার মা আমাকে মারধর করে আমাকে রাগ করে– কাজেই আমার মা বোধহয় আমার কথা শুনবে না, আমি মার বান্ধবী, মায়ের বিয়ান সাহেব বা মায়ের অমুক আপনজনকে নিয়ে একটু সুপারিশ করিয়ে দিলে মা বোধহয় তাড়াতাড়ি শুনবে। কোনো সন্তান যদি এমন হয়, তার সকল চাওয়া-পাওয়া মাকে না বলে মায়ের বান্ধবীকে বলে, তার মাধ্যমে মায়ের কাছে চায়। মা কিন্তু সেই সন্তানকে পছন্দ করে না। সে সন্তান কিন্তু

মায়ের মাতৃত্বকে অপমান করল। ঠিক তেমনি কোনো বান্দা যদি মনে করে, আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন। কিন্তু আমি চাইলে আল্লাহ দেবেন না। আরেকজন বলে দিলে দেবেন- এটা থেকে সকল শিরক। সে আল্লাহর রুবুবিয়াতকে অপমান করে। কাজেই আমরা আল্লাহওয়ালার কাছে কেন যাব! আল্লাহওয়ালার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য আছে। সেটা হল আল্লাহওয়ালা মানুষদের সাহচর্যে বসে আল্লাহওয়ালা আমলগুলো শেখা। তাদের কাছ থেকে মুখে শুনে মাসআলা-মাসায়িল শেখা, তাদেরকে মহব্বত করা। এই উদ্দেশ্যে যাওয়া ভালো। আর দুআ করবে আল্লাহওয়ালা। আল্লাহওয়ালা মানুষের মাধ্যমে বিপদ কাটাবে এটা শিরক। কিন্তু আমরা অধিকাংশ এজন্য যায়।

এই সিজদাহটা কেন করেন? হুজুর খুশি হয়ে আল্লাহকে বলে দিবেন। এজন্য করে। অথচ প্রথম কথা, উনি আল্লাহওয়ালা কিনা আমরা জানি না। উনি আল্লাহওয়ালা হতেন তাহলে সিজদাহ দিতেন না। কারণ সবচেয়ে বড় আল্লাহওয়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো সেজদাহ নেন নি। দুইনাম্বার কথা, আল্লাহওয়ালা বলে দিলে আল্লাহ আমাকে দেবেন। আর আমি বললে দেবেন না। কেউ যদি বিশ্বাস করে, আমার খালা বলে দিলে মা আমাকে বেশি আদর করবে। আমি বললে করবে না। সে কিন্তু মায়ের মাতৃত্বকে অপমান করে। কেউ যদি মনে করে, কোনো নেককার মানুষ বলে দিলে আল্লাহ আমাকে বেশি দেবে আমি বললে দেবে না, সেও কিন্তু আল্লাহর রুবুবিয়াতকে অপমান করে। অনেক সময় আমার বলি রাজা-বাদশার কাছে যেতে গেলে একটা লোক লাগে। কেন লাগে? কারণ রাজা-বাদশা আমাকে চেনে না। অথবা চিনলেও পারশিয়ালিটি করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তো তা না। আল্লাহ আমাকে চেনেন। আল্লাহ আমার কথা সবার চেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ আমার বিপদ জানেন। মনের আবেগ

আল্লাহ জানেন। আমি মনের অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে চেয়েছি তারপরও আল্লাহ আমাকে দেবেন না, কিন্তু অমুক হুজুর বলে দিলে আল্লাহ আমাকে দেবেন– এই চিন্তা করা হল আল্লাহর রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত কে অপমান করা।

অনেক সময় আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি, মেয়ে হচ্ছে কিন্তু ছেলে হচ্ছে না– এই ছেলের জন্য কারো কাছে গিয়ে হয়তো বলা হচ্ছে, একটা ছেলে সন্তানের ব্যবস্থা করে দিন। সবকিছু, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে যা চাওয়ার এটা চাওয়ার জন্য মধ্যস্থ লাগে– এই কল্পনা সকল শিরকের মূল। কারণ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

আমার বান্দারা আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলে দিচ্ছি আমি তাদের কাছে। তারা ডাকলেই আমি সাড়া দেব।[৩]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি আল্লাহর কাছে চাই।[৪] চাওয়ার জন্য, অর্থাৎ ছেলে দরকার মেয়ে দরকার, কোন বিপদ থেকে মুক্তি দরকার...।

আমি আরেকটা বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আর্কষণ করব। আল্লাহ বিপদ দেন কেন? যেমন মা সন্তানকে রাগ করেন এজন্য না যে সন্তান চলে যাক। আমার কাছে ফিরে আসুক। আল্লাহ বিপদ দেন যে, বান্দা আমাকে ডাকবে তার বিপদও কাটবে, অন্তরে শান্তিও চলে আসবে। কাজেই ক্রন্দনটা আমরা আল্লাহর কাছে করি। অন্য কারো কাছে

---

৩. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত: ১৮৬।
৪. সূরা [১] ফাতিহা, আয়াত: ০৫।

গিয়ে না করি।

প্রশ্ন: ০৪। আমাদের সমাজের মধ্যে এরকম একটা প্রবণতা রয়েছে যে, কারো রোগ হয়েছে অথবা ছেলে সন্তান হচ্ছে না, কোনো বিপদে পড়েছে, তাহলে কোনো বাবার মাযারে নিয়ে যায় এবং ওই বাবার নামে পশুটা জবাই করে দেয়। অথবা বাবার কবরে নিয়ে গিয়ে এখানে বলি দেয়। এটা কিন্তু আমাদের সমাজে খুব মারাত্মক আকারে রয়েছে এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন...!

উত্তর: আমি গত কয়েকদিন আগে মানিকগঞ্জ একটি প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম। মানিকগঞ্জের ধামরাইয়ের ভেতরে। সেখানে একজন বললেন, অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে মুসলিম মনে করেন, তারা আল্লাহর নামে জবাই করলে খান না, বাবার নামে জবাই করলেই শুধু খান। তারাও নিজেদেরকে মুসলিম মনে করেন। আসলে জবাইটা হল সর্বোচ্চ মর্যাদা। আর এটা কার নামে হবে? যাকে আমি মাবুদ হিসেবে বিশ্বাস করি। এজন্য আল্লাহর নাম নিয়েও যদি অন্য কারোর মর্যাদা বা অন্য কারোর জিন্দাবাদ দিয়ে জবাই করা হয়, ওটা হারাম। ওই জবাইকৃত প্রাণিটা শুয়োরের মতোই হারাম আর জবাইকারী আবু জাহেলের মতোই কাফের মুশফিক। আবু জাহেল আল্লাহ মানত, আল্লাহর ইবাদত করত। তার সমস্যাটা কী ছিল? সে আল্লাহর ইবাদত করত হজ্জের সময়, আর যখন কোনো প্রয়োজন হত সে তার দেবদেবী, ইবরাহীম ইসমাঈল ঈসার নামে মূসার নামে জিবরাঈলের নামে। আল্লাহর ফেরেশতা নবী অথবা ওলি আউলিয়ার নামে। ভালো মানুষ, অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় মানুষদেরকে ভক্তির নামে মাবুদ বানিয়ে ফেলত। আমরা যখন রাস্তায় বের হব... কার নাম নেব? যাকে মাবুদ মানি। কেউ যদি রাস্তায় বেরানোর সময় বলে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নামে যাত্রা শুরু করলাম, তাহলে সেও মুশরিক। ইসলামে 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া কিছু নেই। 'বিসমিল্লাহ

বিসমিন্নাবী' বলে কিছু নেই। যদি কেউ নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে, আল্লাহ, পাক পাঞ্জাতনের নাম ঝাঁপ দিলাম, তাহলে সেও মুশরিক। অথবা পাঁচ পীরের নামে ঝাঁপ দিলাম... বা বদর বদর বলে দিলাম– এই একই রকমের শিরক। দেবতার নামে, মায়ের নামে, অমুক বাবার নামে, বাবা গনেশের নামে, মা কালীর নামে অথবা সেইন্টের নামে অথবা বাবা আলীর নামে, মা ফাতেমার নামে– একই রকমের শিরক। কারণ এটা একই অনুভূতি প্রকাশ করে যে, একজন মানুষকে, আল্লাহর সৃষ্টিকে, দেবত্ব আরোপ করা হয়, এটা শিরক।

হিন্দু ধর্মের যে বিভিন্ন পূজা হয়, সেসবে দেখা যায়, বিভিন্ন খাবার তারা তৈরি করে, সে খাবারগুলোকে তো আমরা বৈধ মনে করি না। সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মুসলিমদের মধ্যে ওই রকম জবাই করে, ছাগল বা পাঠা বলি দিয়ে আবার শিন্নি তৈরি করে। এখানে মূল শিরক আসছে কোথা থেকে? কোনো নাস্তিক কিন্তু শিরক করে না। যে আস্তিক সে শিরক করে, সে আল্লাহর রহমত চায়। তবে তার বিশ্বাস, আল্লাহর রহমত আমার মত গুনাহগার পেতে পারে না। একটা মধ্যস্থ লাগবে, মিডিয়া লাগবে। আর আল্লাহর রহমত পেতে মাধ্যম লাগবে– এটাকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন। যেমন কোনো মায়ের সন্তান যদি মনে করে, আমার মা খুব বদরাগী। আমার মায়ের সব কথা শুনতে পারি না। মায়ের কাছে আমি চেয়ে সব পাব না। যা কিছু চাওয়ার দরকার সে তার ভাই, তার আপা বা তার খালার মাধ্যমে চায়। সে খালাকে বলে যে, খালা তুমি আমার কত আপন, মার কাছ থেকে আমার রুটি এনে দাও, অথবা মাকে একটু বলে দাও। মা কিন্তু এই সন্তানের উপর খুব বিরক্ত হয়। কারণে সে মায়ের মাতৃত্বকে অপমান করছে। সে প্রমাণ করছে তার মা ভালো মা নয়। মা হলে চাইলে দেবে না আর কেউ বলে দিলে দেবে!!

ঠিক যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহর রহমত সর্বব্যাপী নয়, আল্লাহর

রহমত আমার জন্য নয়, কোনো মধ্যস্থ উকিল ছাড়া আমি পাব না। এই ব্যক্তি মূলত তার বিশ্বাসে চেতনায় তার রবকে মালিক কে অপমান করেছে। আল্লাহর কাছে অ্যাডভোকেসি লাগবে, উকিল লাগবে, এ চিন্তা...

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا.

উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[৫] তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তোমার উকিল তিনি। তোমাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন তিনি। দয়ালু সবচেয়ে বেশি তিনি। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য, আল্লাহ কুরআন কারীমের প্রথমে বলেছেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। দয়া মায়ার জন্য তিনি যথেষ্ট। পীর দয়ালু, বুযুর্গ দয়ালু, নবী দয়ালু...। আমরা মনে করি যেন, আল্লাহর চেয়ে এরা বেশি দয়ালু! আল্লাহ মহাজন, রেগে আছেন, আর এইসব দয়ালু আমাকে আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচিয়ে দেবে। আল্লাহ সবচেয়ে বেশি দয়ালু বান্দার জন্য। আল্লাহর চেয়েও বেশি দয়ালু কেউ হতে পারে, এটা আল্লাহর দয়াকে এক্সপ্রেস করে। আর কেউ তাঁর কাছ থেকে দয়া কেড়ে এনে দিতে পারে, এই চিন্তা তাই হল সব শির্কের মূল।

এখানে আরেকটা ভয়ঙ্কর বিষয় আছে, একজন মন্ত্রী এমপি, তিনি খুব লুজ! তার প্রিয়জনেরা, বউ ছেলে সেক্রেটারি ড্রাইভার যা বলে তাই শুনে নেয়। সীলটা তার কাছে রেখে দিয়েছে। এরকম কোনো লোককে কেউ দ্বিতীয়বার এমপি বানাবে না। বলবে এটা ভালো লোক না। আর যে ব্যক্তি যাচাই না করে কোনো সই করেন না, নিজে পড়ে সই করেন...। যে প্রধানমন্ত্রী সব দপ্তরের খোঁজ নেয়, সবাই বলবে, এটা ভালো প্রধানমন্ত্রী। আমরা কি মনে করি, আল্লাহ লুজ!

৫. সূরা [৪] নিসা, আয়াত: ৮১, ১৩২, ১৭১; সূরা [৩৩] আহযাব, আয়াত: ৩, ৪৮।

আল্লাহ সব জানেন, আর যে কেউ বলে দিলে মেনে নেন! আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সব দুআ শুনতেন। তাঁর মনের আবেগ কবুল করতেন। তার পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দুআ করেছেন আল্লাহর মর্জির বাইরে, তখন আল্লাহ ধমক দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করেছেন মুনাফিকের জন্য যে, আল্লাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ বলেছেন, ৭০ বার দুআ করলেও মাফ করব না।[৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ বদদুআ করেছেন, যারা ইসলামের ক্ষতি করছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে ক্ষতি করো। আল্লাহ বলেছেন, না। তুমি বদদুআ কোরো না, বদদুআর অধিকার তোমাকে দেওয়া হয় নি। তুমি দাওয়াত দাও। আমি বুঝব, কার ভালো আমি করব, কার মন্দ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে বদদুআ করতে চেয়েছেন, আল্লাহ তাদেরকে মুসলিম করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসেন, তাঁর কাছে চাইতে হবে। তাঁর সাথে সম্পর্ক হবে। আল্লাহর মহব্বত প্রেম ভালোবাসা পেতে কারো মাধ্যমে যেতে হবে– এই চিন্তা হল আল্লাহকে অপমান করা। আল্লাহ বোধহয় ভালো আল্লাহ নন, মাবুদ ভালো মাবুদ নন। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমাকে মানুষ করেছেন আমার সব জানেন, জেনেও আমি চাইলে দেবেন না, আর অন্য কেউ বলে দিলে দেবে– আল্লাহর জন্য এর চেয়ে অবমাননাকর বিশ্বাস আর নেই।

প্রশ্ন: ০৫। আমাদের সমাজে বর্তমানে বহু ওলি-আওলিয়াদের জীবনে অনেক কারামত আছে। ওই কারামতগুলো তাদের বিভিন্ন দরবার থেকে বা বিভিন্ন ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বলা হয়। কারো কারো কারামত দিয়ে কোনো একটা বিষয়কে জারি করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কোনো একটা আমল, কোনো ড্রেস, কোনো একটা সুন্নত জারি করা হয় ওই কারামতের স্বপ্নের মাধ্যমে। শরীআতে এর কোনো অথেন্টিসিটি আছে কি না? কোনো ব্যক্তির কারামত অথবা ব্যক্তির স্বপ্ন শরীআতের দলীল

৬. সূরা [৯] তাওবাহ, আয়াত: ৮০।

হতে পারে কি না?

উত্তর: অনেকগুলো বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটা হল, আমরা বুযুর্গদের কারামতের কথা শুনতে পাই। এখানে প্রথম কথা হল, এই বর্ণনাগুলোর প্রায় শতভাগ কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র নেই। 'কারামাতুল আউলিয়া হক' কথাটির অর্থ– সহীহ সনদে নির্ভরযোগ্য সূত্রে অথেন্টিকভাবে যদি কোনো মানুষের থেকে, যে মানুষটা ওলি বলে প্রমাণিত– অলৌকিক কর্ম বর্ণিত হয়, সেটা সত্য বলে মানব, তার বেলায়াতের মানদণ্ড হিসেবে না। এটা প্রায় অধিকাংশ কারামতের ক্ষেত্রে সত্য না। যেমন কারামত পাওয়া যায় কখন? তার জন্মের ১০০-২০০ বছর পরের বর্ণনায়। আব্দুল কাদির জিলানির জীবদ্দশায় অনেকে বই লেখেছেন, তাঁর মৃত্যুর তাৎক্ষণিক পরে লেখেছেন, এতে এতগুলো কারামত পাওয়া যায় না। পরের যুগে এগুলো বাড়ছে। দ্বিতীয় বিষয় হল, কারামত দিয়ে যদি বেলায়াত মাপা যায় তাহলে সাহাবিরা সবচেয়ে কম ওলি হবেন। তাদের, চার ইমামের কোনো কারামত পাবেন না। তাবিয়িদের কোনো কারামত পাবেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন যে, উম্মতের শ্রেষ্ঠ ওলি, পীর-মুর্শিদ, বুযুর্গ সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ তারপর তাবি-তাবিয়িগণ।

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

[উত্তম যুগ আমার যুগ, তারপর তার পরবর্তীরা, তারপর তার পরবর্তীরা][৭]

আল্লাহ কুরআনে সাহাবিদের সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। অথচ আপনি কারামত দিয়ে মাপলে মনে হবে, শাররুল কুরূন, সবচেয়ে খারাপ বোধ হয় তাঁরা। তাদের কোনো কারামত নেই। ইমাম আবু হানীফা রাহ., ইমাম শাফিয়ি রাহ., ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের

৭. সুনান তিরমিযি, হাদীস-২২২১; ইবন হাজার, আত তালখীসুল হাবীর, হাদীস-২১৩০।

কারামত পাওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয় বিষয় হল, এই কারামত, স্বপ্ন সত্য হলেও এগুলো কখনোই শরীআতের মানদণ্ড নয়। আমরা একটা বিষয় আলোচনা করি। মুসলিম উম্মাহর সবাই জানে, সাহাবিদের ভেতরে কারামতের দিক থেকে সহীহ রেয়াওয়াত যেটা আসছে উমার ﵁ থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রত্যেক নবীর উম্মতে কিছু কাশফ, এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন। আমার উম্মতের সে হল উমার ﵁। এবং তাঁর কিছু কারামতও আমরা জানি। তার অগণিত ফিকহি মতামত আমরা মানি না। একেবারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই না। সাহাবিরা ফেলে দিয়েছেন। সাহাবির কারামত বলে তাঁর সব বক্তব্য দলীল হয়ে গেছে! কখনোই না।

ইসলামের দলীল একটাই কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ। আর এর আলোকে আমরা মানব কিংবা না মানব। যেমন, উমার ﵁ তামাত্তু হজ্জ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন কিরান করতে হবে। সাহাবিরা বাতিল করে দিয়েছে। আলী ﵁ বলেন, যে যা-ই বলুক, আমি আমার নবীকে ﷺ দেখেছি তামাত্তু করতে, আমিও তামাত্তু করব। যদি কোনো আগ্রহী গবেষক মুসন্নাফাত বইগুলো পড়েন দেখবেন, সাহাবিদের, সাহেবে কারামত, শাহাদত, আল্লাহর সাক্ষ্যপ্রাপ্ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষ্যপ্রাপ্ত সাহাবিদের অনেক মত আমরা মানি না। কারণ সেগুলো কুরআন বা সুন্নাহর সাথে মেলে না। আমরা বলব, আমরা তাদের ইহানত করব না। আমরা বলব, এটা তাঁর ইজতিহাদ, তিনি ভুল করেছেন অথবা তিনি হাদীসটা জানতেন না। কিন্তু কেউ যদি বলে... বিভিন্ন বিষয়ে উদাহরণ দিতে গেলে লম্বা হয়ে যাবে। আমরা সাহাবিগণ তাবিয়িগণ, তাবি-তাবিয়িনগণের ইহানত করি না। আমরা তাদের বলি, তারা এটা ইজতিহাদি ভুল করেছেন অথবা হাদীসটা জানতেন না। কিন্তু হাদীসের বিপরীতে, সুন্নাতের বিপরীতে তাঁদের স্বপ্ন-কাশফ দিয়ে দলীল দিলে হবে– এটা মুসলিম

উম্মাহ কখনো গ্রহণ করবে না।

প্রশ্ন: ০৬। ঢাকা দেওয়ানবাগ দরবার শরীফের একজন খলীফা, সে নবী করিম ﷺ এর ছবি, হুসাইন রা.এর ছবি, উনার মেয়ের ছবি, আমার এক কলিগের কাছে দিয়েছে। আসলে এটা কতটুকু সত্য?

উত্তর: প্রথম কথা হল, ছবি সংরক্ষণ করা, ভক্তি করা– এগুলো কঠিন হারাম গুনাহ এবং ভয়ঙ্কর শিরক হয়ে যেতে পারে, যদি এগুলোর প্রতি আমরা ভক্তি প্রকাশ করি। দ্বিতীয় যে বিষয়টা, এগুলোর বাস্তবতা। ছবি সংরক্ষণ মূর্তি বানানোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। বিভিন্ন হাদীস এসেছে। এগুলো শিয়া ধর্মে আছে। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিগণ কখনও ছবি তোলেন নি, আঁকেন নি। পরবর্তী যুগে, যখন পারস্যে উমাইয়া যুগে, আরব অনারব বৈরিতার মাধ্যমে, শিয়া মত ইরান পারস্যে ছড়িয়ে যায়। ইরানের মানুষেরা, অর্থাৎ শিয়া ধর্মের অনুসারীদের মূল বিষয়টা, মূলত ভক্তির উপরে। হাসান, হুসাইন, ফাতিমা, আলী ইত্যাদি ইমামদের ভক্তি করা, তাদের সিজদাহ করা, তাদের মাজারে গিয়ে সিজদা করা, তাদের চাওয়া, তাদের ভক্তিই তাদের দীন। এখানে নামায রোযা ইত্যাদি গৌণ। এদের সমাজে আপনি সবই পাবেন। সেখানে ছবি আছে, মানে ছবিই সেখানে দীন। একমাত্র এই সমাজ ছাড়া মুসলিম উম্মাহর কেউ ছবি ভিত্তিক দীন করেন নি। আমাদের দেশের তরীকা তাসাউফের ভেতরে শিয়ারা ব্যাপক ঢুকেছে। কারণ আমাদের ভারতে ইরানে অন্যান্য জায়গায় শিয়ারা একসময়ে ব্যাপক প্রভাবশালী ছিল। এই তরীকা তাসাউফ পীর-মুরিদী, হাকিকত-মারিফত ইত্যাদি যত গল্পকাহিনী রয়েছে, এর ভেতরে আপনারা কেউ ইরানে গেলে দেখবেন, সব ইরানিদের উদ্ভাবন। কিন্তু দুটো জিনিস আমাদের বাকি ছিল। আমরা শিয়াদের সবই নিয়েছিলাম, দুটো জিনিস আমরা নিয়েছিলাম না। একটা হল, এই ছবি মূর্তি। আরেকটা হল, সাহাবিদের গালি দেওয়া।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন সেই শিয়া ধর্মের ছবি মূর্তি আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এখন দীনের নামে, পীর মুর্শিদের নামে, পীর মুর্শিদের ছবি টাঙানো, তাদের সন্তানদের ছবি টাঙানো অথবা আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবিগণ, তাবিয়িদের অথবা হাসান হুসাইনের ছবি টাঙানো হচ্ছে। প্রথম কথা, এগুলো সব কাল্পনিক। সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দ্বিতীয় কথা, এগুলো সংরক্ষণ করা, হিফাযত করা কঠিন কবীরা গুনাহ। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। তৃতীয়ত, এগুলো দেখা কিংবা ভক্তি প্রকাশ করতে গেলে শিরক হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদেরকে হিফাযত করেন।

প্রশ্ন: ০৭। একটা মানুষ কি নবী করিম ﷺ এবং আল্লাহর দীদার লাভ করতে পারে?

উত্তর: খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। এ প্রশ্নের কারণ হল, আমরা একটা ছোট্ট জায়গায় গলত করে ফেলেছি। সেটা হল ঈমান। আমরা বলছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। তার মানে, আমাদের একমাত্র মাবুদ আল্লাহ, আমরা ইবাদত করব একমাত্র আল্লাহর এবং সেই ইবাদতটা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতিতে। এর অর্থই হল, আল্লাহর ইবাদত করব এবং কীভাবে কোন পদ্ধতিতে ইবাদত করতে হয়, কীভাবে দীদার হয়, কীভাবে পীর হয়, কীভাবে ওলি হয়, সবকিছু মুহাম্মাদ ﷺ থেকে শিখব। এই জিনিসটা যদি আমাদের ব্রেনে থাকত, তাহলে আমরা সব অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত হতাম। সহজ প্রশ্ন করলেই হত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিরা কোনো দীদার করেছেন কি না, তাঁরা আল্লাহকে দেখেছেন কি না? কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা আমাদের সমাজের প্রচলিত অগণিত গল্প, যে গল্পগুলো রাসূলুল্লাহ বা সাহাবিকেন্দ্রিক না, পরবর্তী যুগের মানুষদের ওলি বুযুর্গদের কেন্দ্রিক, এগুলোর কোনো সনদ নেই। এগুলোর কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা

কিছুই জানি না। সর্বাবস্থায় এগুলো শরীআতের কোনো বিষয় নয়। এইগুলো দিয়ে আমরা নিজেদের ব্রেনগুলোকে, নিজেদের মন মগজকে একটা অস্বচ্ছতার মধ্যে ফেলে দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দীদার বলতে যদি স্বপ্নে দেখা বোঝানো হয়, অবশ্যই! রাসূলুল্লাহ ﷺ কে স্বপ্নে দেখা যায়। যদি কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে...! সহীহ বুখারির শেষে কিতাবুর রুইইয়াতে পাবেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, অন্যান্য সাহাবিগণ, ইবন সিরীন অন্যান্য তাবিয়ীগণ, কেউ যদি বলত আমি নবীজিকে স্বপ্নে দেখেছি, তখন জিজ্ঞাস করতেন, কেমন দেখেছ, চুলগুলো কেমন দেখেছ, কপাল কেমন দেখেছ? যদি তাঁর জীবদ্দশার চেহারার সাথে মিলে যায়, তাহলে নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কেই দেখেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي

শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[৮] কাজেই রাসূল ﷺ কে তাঁর নিজের আকৃতিতে স্বপ্ন দেখা নিআমত। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কারামত। কেউ যদি দেখেন, এটা খুবই ভালো। এটা শরীআতের কোনো দলীল নয়, নিজের আমল নয়। এটা একটা নিআমত মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে স্বপ্নে দেখার দ্বিতীয় বিষয় হল, অন্য আকৃতিতে তাকে স্বপ্নে দেখা। তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে নয়। এক্ষেত্রে কখনোই এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্বপ্ন নয়। কারণ শয়তান যেখানে হাদীস জাল করতে পারে...! এটা হাদীস শরীফে এসেছে, বাজারে বাজারে ঘুরে বলবে আমি নবীজির হাদীস শুনেছি, কাজেই অন্য আকৃতিতে এসে বলবে আমি নবী, নবীর নামে কথা বলবে, এটা তার জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। এইজন্য, রাসূল ﷺ এর আকৃতি শয়তান

৮. সহীহ বুখারি, হাদীস-১১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৬৬।

ধরতে পারবে না, প্রকৃত আকৃতিতে কেউ যদি দেখে, তাহলে সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখা।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহর দীদার বলা বলতে যদি বোঝে আল্লাহকে দেখা, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা তবে আল্লাহ কুরআন কারীমে তিন জায়গায় খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, আল্লাহকে দেখা যায় না। এক জায়গায় মূসা عليه السلام বললেন:

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ

আল্লাহ বললেন:

لَنْ تَرَانِي

তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।

وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي

পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি স্থানে ঠিক থাকে তাহলে দেখতে পাবে।

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

যখন আল্লাহ সামান্য প্রকাশিত হলেন, পাহাড়টা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।[৯] পাহাড় যেহেতু ঠিক থাকলো না, মূসার তো দেখার প্রশ্নই আসে না। মূসা عليه السلام অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাওবা করলেন, যে আমি ভুল করেছিলাম।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

---

৯. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত: ১৪৩।

কোনো দৃষ্টি তাকে দেখতে পারে না। তিনি সবাইকে দেখেন।[১০] অন্য আয়াতে নবীদের কথা বলেছেন।

مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

পর্দার আড়াল ছাড়া কোনো নবীর সাথেও কথা বলেন না। দেখা দেন না।[১১] আমাদের রাসূল ﷺ আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না, এটা নিয়ে সাহাবিরা মতভেদ করেছেন। সহীহ বুখারির হাদীসে আয়িশা রা. বলেছেন:

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ

যদি কেউ বলে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন, তাহলে তিনি মিথ্যা বললেন আল্লাহর নামে।[১২] অন্য দিকে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তরের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখেছিলেন। এটা তাঁর মুজিযা। মূসা আ. আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, এটা মুজিযা। আমাদের নবী যদি দেখেন, এটা মুজিযা। উম্মাতের জন্য কমন নয়। কাজেই কোনো উম্মাত যদি দাবি করে, আমি আল্লাহকে দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি, আল্লাহর দীদার হয়েছে, তিনি কুরআন অস্বীকার করার কারণে ঈমানহারা হয়ে যাবেন। আর সবচে' বড় যেটা, প্রথমেই বলেছিলাম, আমাদের মডেল কে? আল্লাহ কুরআন কারীমে খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। আমাদের আদর্শ মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ। এরপরে সাহাবায়ে কিরামগণ। সূরা তাওবায় আল্লাহ বলেছেন:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

মুহাজির আনসার সাহাবিগণ তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত বানিয়ে

১০. সূরা [৬] আনআম, আয়াত: ১০৩।
১১. সূরা [৪২] শুরা, আয়াত: ৫১।
১২. সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৮৫৫।

রেখেছেন। আর পরবর্তীরা...

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ

পরবর্তী মানুষেরা যদি জান্নাত পেতে চায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায়, মুহাজির আনসার সাহাবিদেরকে ইত্তিবা করতে হবে।[১৩] আপনি সাহাবিদের জীবন দেখেন। একটা ঘটনা পাবেন না, কেউ বলেছেন আল্লাহকে দেখা যায়, কলবে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমনভাবে ইবাদত করবে যেন আল্লাহকে দেখছ। কারণ তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।[১৪] এইজন্য আল্লাহকে দেখা, আল্লাহকে দেখে ইবাদত করা...! অনেকে আলীর নামে মিথ্যা কথা বলে, যে আল্লাহকে দেখি না, তার ইবাদত করব কেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন:

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

না দেখে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।[১৫] দেখলে তো আর ঈমান হল না। আল্লাহর ইবাদত হবে দুনিয়াতে আর দীদার হবে আখিরাতে। والله اعلم

১৩. সূরা [৯] তাওবাহ, আয়াত: ১০০।
১৪. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮।
১৫. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত: ০৩।

তাহারাত/পবিত্রতা

প্রশ্ন: ০৮। রোগের কারণে জনৈক ব্যক্তি পেশাবের রাস্তার সাথে ক্যাথেটার বা এক প্রকার নলের সাহায্যে পেশাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা দিয়ে সর্বক্ষণ পেশাব ঝরছে, ওই ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের উপায় কী?

উত্তর: এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আল্লাহ তাআলা দীন দিয়েছেন তো আমাদের জন্য। এখানে এমন কিছু নেই যা আমাদের জন্য অসম্ভব। কাজেই পবিত্রতা সাধ্যের ভেতরে।

اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

তোমাদের সাধ্যের ভেতরে আল্লাহর প্রতি সচেতন হও।[১] এই ব্যক্তি সালাতের জন্য পবিত্র হবেন। প্রত্যেক সালাতের জন্য পৃথক পবিত্র হবেন। বাকি সকল ইবাদত তিনি এই অবস্থায় করতে পারবেন। আর প্রত্যেক সালাতের জন্য তিনি নতুন করে অযু করবেন। পেশাব পড়তে থাকবে, এজন্য সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। আর অন্যান্য ইবাদাতের জন্য তার আর আলাদা করে ওযু করা লাগবে না। দীনটা আমাদের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন। বান্দার পবিত্রতা কেন? যেন সে ইবাদতে মনোযোগ পায়। সে তার হাত ধোবে, মুখ ধোবে, যেন ইবাদতে আন্তরিকতা এবং ফ্রেশনেস আসে। ইবাদতে মনোযোগ

১. সূরা [৬৪] তাগাবুন, আয়াত: ১৬।

বসে, এটার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে তাহারাত অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এটা তো আল্লাহ আমাদের জন্য দিয়েছেন, কাজেই আল্লাহ আমাদের সাধ্যের বাইরে কিছুই দেন নি।

প্রশ্নঃ ০৯। বডি স্প্রে বা পারফিউম ইউস করার পরে গোসল করে নিলে বা কাপড় ধুয়ে নিলে নামায হবে? নাকি বডি স্প্রে বা পারফিউম ব্যবহার করাটাই হারাম?

এখানে বোন একটা মূল ভিত্তিতে বলেছেন যে, পারফিউম বা বডি স্প্রে হারাম। বিষয়টা নিয়ে কিছু কথা আছে। প্রথম কথা, যদি আমরা মনে করি, পারফিউম ব্যবহার করলে কাপড় নাপাক হবে, সেক্ষেত্রে কাপড় ধুলে পাক হয়ে যাবে। এখানে পারফিউম ব্যবহারের দুটো ব্যাপার আছে। দূরে যায় এরকম খোশবু হারাম। মেয়েরা বাড়ির ভেতরে অবশ্যই যে কোনো রকমের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন। পুরুষদের নাকে খোশবু যায়, এরকম খোশবু ব্যবহার করে মেয়েদের বাইরে যাওয়া হারাম। সেটা স্প্রে হোক আর আতর হোক। আর হালালভাবে ব্যবহারের জন্য পারফিউম অর্থাৎ বডি স্প্রে ব্যবহার করা যাবে কি না, এই ব্যাপারে উলামাদের কিছু মতভেদ আছে। সাধারণত ট্রেডিশনাল উলামারা বলেন, যেহেতু এর ভেতর অ্যালকোহল আছে, কাজেই কাপড়ে পড়লে ওটা নাপাক হয়ে যাবে, কাজেই ওটা পরে নামায হবে না। আর আধুনিক উলামাদের মধ্যে বর্তমানে সব মাযহাবের সব দেশের উলামারা অনেকেই বলছেন, অ্যালকোহল শব্দটার অর্থ কিন্ত মদ নয়। আরবি পরিভাষায় ওটাকে বলা হয়, যা পান করলে মানুষ মাতাল হয়। যেটা অনেক পান করলে হারাম হয়, সেটা অল্প পান করাও হারাম। কিন্তু অ্যালকোহল যে কেমিক্যাল টার্ম অনেক আছে মানুষ মাতাল হয় না, মারা যায়, বিষাক্ত। কাজেই, অ্যালকোহল হলেই মদ হবে, এটা নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয় বিষয় হল, মদের ক্ষেত্রে আঙুর বা খেজুরের তৈরি মদ সর্বাবস্থায় নাপাক। আর অন্যান্য মদের নাপাক হিশেবে গণ্য করার

ক্ষেত্রে ফকীহদের মতভেদ আছে। এজন্য স্বাভাবিকভাবে স্প্রে বডি স্প্রে বর্জন করতে পারলে ভালো। তবে আধুনিক অনেক আলিমই বলেন, বডি স্প্রের ভেতরে যে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, এগুলো মদ নয়। এটা মাদক নয়। এটা কেমিক্যাল অ্যালকোহল, যেটা পান করলে অনেক সময় মানুষ মারা যায়, কিন্তু মাতাল হয় না। এজন্য এটা নাপাক বলে গণ্য হবে না। এসব বডিতে ব্যবহার করা বৈধ। এটা অনেক আলিমই বলছেন, তবে এটা পরিহার করতে পারলে ভালো। যদি আপনারা ব্যবহার করেন, হালালভাবে, স্বামীর জন্য, পরিবারের জন্য, তাহলে সম্ভব হলে কাপড় পাল্টে নেবেন, ধুয়ে নেবেন। আর বাইরে যেতে আশা করি, দীনদার মহিলারা কেউ খোশবু স্প্রে করে বাইরে যাবেন না।

সালাত/নামায

প্রশ্ন: ১০। আমি নামায পড়তে গেলে অনেক সময় ভুলে যাই, কয় রাকআত নামায পড়েছি। হিসাব করতে পারি না। এই বিষয়ে সমাধান কী?

উত্তর: আসলে এটা আমাদের সকলেরই হয়। বিশেষত, আমরা যারা নামাযি মুসলিম, অর্থাৎ প্র্যাক্টিসিং মুসলিম, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করেন, তাদের এই অনুভূতিটা প্রায়ই হয়। এটার বিভিন্ন দিক রয়েছে। এটার মূল কারণটাকে আমাদের সরাতে হবে। আমরা এমনভাবে সালাত আদায় করি, যেন এটা ঠোটস্থ সালাত, অনেকটা কম্পিউটারের স্টার্ট বা বুটের মতো। চালু করলে কম্পিউটারে অনেকগুলো প্রোগ্রাম একের পর এক চলতে চলতে উইন্ডোজ তার সামনে এসে যায়। আমরা সালাত মুখস্থ করে ফেলেছি, একটা দুআ, একটা পদ্ধতি, আল্লাহু আকবার বলার পর অটোমেটিক আমাদের 'সুবহানাকা' থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত চলে যাই। সালাম ফেরানোর পর মনে হয়, কী বলেছি কিছুই মনে নেই! এটার মূল কারণ আমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য সালাত আদায় করার চেতনা ভুলে গেছি। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমার স্মরণের জন্য তুমি সালাত আদায় করো।[১] সালাতটা হল আমার কলবের ভেতর আল্লাহর স্মরণটা রিপিট হবে, আমার ক্বলবে প্রশান্তি

১. সূরা [২০] তহা, আয়াত: ১৪।

আসবে আমার মন শক্তিশালী হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাতে যেতে হবে। আমাদের সালাতের দুআ এবং আযকারগুলো পরিবর্তন করতে হবে। আমরা সালাত শুরু করি শুধু একটা সানা দিয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সানা পড়তেন। কখনো সুবহানাকাল্লাহুম্মা..., কখনো আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনি..., কখন কখনও ওয়াজ্জাহাতু... বিভিন্ন সানা পড়তেন। আমাদের এইগুলো মুখস্ত রাখতে হবে। অন্তত দুটো তিনটে মুখস্থ রাখতে হবে এবং চিন্তা থাকবে যে এই নামাযের এই রাকআতে এই সানা পড়ব। অন্য নামাযের ওই রাকআতে অমুক সানা পড়বো। অল্টারনেট করতে হবে। তাহলে সচেতনতা বেড়ে যাবে। ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এবং সূরাগুলোর অর্থ বুঝতে হবে। চেষ্টা করতে হবে অর্থের দিকে খেয়াল রেখে পড়ার। যথা সম্ভব নিয়ত করতে হবে, আমি এই চারটা রাকআতে এই চারটা সূরা পড়ব। রুকুতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম এর পরে অনেক তাসবীহ শিখিয়েছেন। এগুলো নিয়মিত পরিবর্তন করে করে পড়তে হবে। সিজদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করতে বলেছেন। আমাদের চিন্তা থাকবে এই চার রাকআত সালাতের আটটা সিজদাহ আটরকম দুআ করব। সালাতটা যখন আমার আর আল্লাহ তাআলার মধ্যে চাওয়া পাওয়ার সম্পর্কে হয়ে যাবে। আমার হিসাব থাকবে, কোন চাওয়াটা বাকি থাকল, তখন সালাত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ৯০ ভাগ চলে যাবে। এভাবে যদি আমরা সালাতটাকে মন দিয়ে পড়তে পারি, তাহলে প্রথম উপকার হবে, আমার মনের থেকে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মনে শান্তি বেড়ে যাবে। আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলার কারণে আমার মনে প্রফুল্লতা আসবে। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সাজদা অবস্থায় দুআ কবুল হয়। কেউ যদি সালাতের সাজদায় এবং সালামের আগে দুআ করতে শেখে, তাহলে সারাদিন আর কোনো দুআ তার লাগে না। তার জীবনের সকল দুআ কবুল হয়ে যায়। এটা হল প্রথম ধাপ। যে যিকিরগুলো আমরা পড়ি এগুলো বেশি বেশি শিখতে হবে, অর্থাৎ প্রতিটা জায়গায় একটা দুইটা তিনটা অল্টারনেটিভ দুআ শিখতে হবে। অর্থগুলো বুঝে নিতে হবে এবং যথাসম্ভব অর্থের দিকে

খেয়াল রেখে পড়তে হবে।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এক সাহাবি এসে বলছেন, আমার সালাতের ভেতরে মন অন্যদিকে চলে যায়, কী করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এটা একটা শয়তান, যে সালাতের মধ্যে মানুষের মনকে এদিক সেদিক নিয়ে যায়। তোমার যখন এমন হবে, তখন তুমি সালাতরত অবস্থায় 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' বলে বাম দিকে থুক দেবে। এটা আমরা সালাত এর ভেতরেই করব। এটা কিন্তু মনোযোগিতা নিশ্চিত করে। যখন মুমিন অমনোযোগিতায় বিরক্ত হয়ে এভাবে থুক দেবেন, তখন তারা অমনোযোগিতা কমতে থাকবে। মনোযোগিতা বাড়তে থাকবে। সুন্নাতপদ্ধতি হিসেবে মূলত এ দুটোই আমাদের জন্য করণীয় আমল।

প্রশ্ন: ১১। 'নূরানী নামাজ শিক্ষা' বইতে মহিলাদের নামাযের পার্থক্য লেখা হয়েছে। এগুলোর দলীল কী? হানাফি মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী মহিলারা নামায পড়লে সেই নামায কি হবে?

উত্তর: মহিলা এবং পুরুষের নামাযের ক্ষেত্রে তিনটা পার্থক্যের কথা কিছু যয়ীফ হাদীসে এসেছে। এক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। এই ছোটখাটো বিষয়ে নামায কবুল না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পুরুষের জন্য সুন্নত হল পিঠটা সোজা করা। মহিলারা সোজা না হলেও চলবে। সিজদার ক্ষেত্রে পুরুষেরা ফাঁক হবে, মহিলারা গোটাসোটা হয়ে করবে। আর বসার ক্ষেত্রে পুরুষেরা পা ভাঁজ করে বসবে, মেয়েরা আসন গেড়ে চারজানু হয়ে বসবে। এটা হাদীসের দৃষ্টিতে দুর্বল। মজা হল, সাহাবি তাবিয়িদের যুগে প্রায় সকল ফকীহ এই ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন, মেয়েরা গোটাসোটা হবে, রুকু একটু নরম করে দেবে। এজন্য আমরা এটাকে সরাসরি ইনকার করি না। আমরা দীন পেয়েছি, সাহাবি তাবিয়িন তাবি-তাবিয়িনের মাধ্যমে। অনেকগুলো সাহাবি থেকেই বর্ণনা আছে, যে গোটাসোটা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে স্পষ্ট হাদীস নেই। যদি কেউ পুরুষের মতো নামায পড়ে, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

তোমরা আমার মতো নামাজ পড়ো। নারী পুরুষের পার্থক্য তিনি স্পষ্ট বলেন নি। আবার যেহেতু অনেক সাহাবি বলেছেন, তাবিয়িন বলেছেন, ফুকাহাগণ বলেছেন। যদি কেউ এই তিনটি বিষয়ে পার্থক্য করে, এটা কে নাজায়িয বলব না। নামায হবে না, বলব না। আমি এই রকমই বুঝি এবং আমি সৌদি আরবের যেসব বড় আলিমদের যাদের কাছে পড়েছি, তারাও এভাবে বলেন।

প্রশ্ন: ১২। জামাআতবদ্ধ সালাতে পা মেলানোর সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর: আমাদের সমাজে যে সকল মুসলিম, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮০-৮৫ জন মুসলিম, যারা সালাত আদায় করেন না তারা বর্তমানে খুব নিরাপদে আছেন। ঝগড়াঝাটি থেকে মুক্ত আছেন। সালাত আদায় করেন এই দশ পনেরো পার্সেন্ট মানুষ। এরা এখন বহুমুখী ঝগড়ার ভেতরে পড়ে গেছেন। এই ঝগড়াগুলোর একটা হল, সালাতে কীভাবে দাঁড়াব। সালাতে কাতারে ঘন হয়ে দাঁড়ানো, গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো এইগুলো বিভিন্ন সহীহ হাদীসে আছে। কাতারের জন্য একটা বিষয় হল, সোজা হওয়া আর একটা বিষয় হল ফাঁক বন্ধ করা।

وَسِّطُوا الْإِمَامَ وسُدُّوا الثَّلَمَ لَا يَتَخَلَّلُهَا الشَّيْطَانُ وضَعُوْا نِعَالِكُمْ بيْنَ أَقْدَامِكُمْ.

কাঁধ এবং পায়ে মিলিয়ে নাও এবং ফাঁক গুলো পূর্ণ করো।[২] এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বা ওয়াজিব দায়িত্ব। এখন এই মেলানোর ক্ষেত্রে কীভাবে মেলাব। অনেকেই আমরা ভুল করে দূরত্ব রাখি। অথচ তিনজন মুসল্লিকে ঠেলে দিলে আরো একজন দাঁড়াতে পারে। এটা সত্যিই দুঃখজনক। আবার অনেকেই এই মেলাতে গিয়ে কিছুটা সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। একজনের পায়ের উপরে আরেকজন পা তুলে দেয়। এক্ষেত্রে হাদীসের আলোকে যেটা বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবি উবাই ইবনে কাব ﵁, তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কাতার সোজা

---

২. তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৪৪৫৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৬৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১০৯৯৪।

করতেন তখন আমরা এমনভাবে দাঁড়াতাম, আমাদের পায়ের যে টাখনু, গোড়ালি, উঁচু হাড়টা, টাখনুর সাথে টাখনু, হাঁটুর সাথে হাঁটু, কাধের সাথে কাধ মিলে যেত। এতে বোঝা যায় যে পায়ের টাখনু অর্থাৎ উঁচু হাড়টা হাঁটু এবং কাধ মেলানো। বাস্তবে এটা মিলিয়ে রাখা এবং এটা নামাযে পুরো অবস্থায় মিলিয়ে রাখা অসম্ভব। কারণ টাখনুর সাথে টাখনু মেলাতে গেলে আপনার গোড়ালিটা একটু বাঁকা করতে হবে। তা না হলে মিলবে না। টাখনুর সাথে হাঁটু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মেলাতে গেলে অনেকের জন্যই এটা কঠিন হয়ে যাবে। বিশেষ করে হাঁটু মেলানো। আপনি কাঁধ মেলাতে গেলে যদি হাত বাঁধেন একটু দুরত্ব হয়ে যায়। হাঁটু আর মিলতে চায় না। আবার হাঁটু মেলালে গায়ের ভেতর গা চলে যায় অনেক সময়। এজন্য এটা কি শাব্দিক অর্থ বলেছেন, পুরো সালাতের জন্য বলেছেন, না খুব কাছাকাছি একেবারে মেলার মতো হয়ে যাওয়ার অর্থে বলেছেন, এই বিষয়ে ফুকাহারা এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম ইবন হাজার আসকালানি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সৌদি আরবের খুব বড় আলিম একজন, জায়েদ আবু বকর, উনি এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন, এটার অর্থ, যত সম্ভব কাছে দাঁড়ানো।

যদি প্র্যাকটিক্যালি এটা মেলাতে হয় তবে এটা অসম্ভব। সালাতের দিকে কোনো মন থাকবে না। পা বাঁকা করে দাঁড়াতে হবে। কনুই থাকলে হাঁটু মেলানো যাবে না। বেশি পা ফাঁক করার ভেতরে দুটো জিনিস আসে। আমরা যদি পায়ের পাতা মেলায় বাঁকা করে তাহলে পাটা কিবলামুখী থাকে না। অথচ ইমাম বুখারি এনেছেন যে পাকে কিবলামুখী করতে হবে। আবার যদি আমি পায়ের গোড়ালি মেলায়... অনেক ফাঁক করলে গোড়ালি মেলে না। গোড়ালিটা না, টাখনুটা মেলাতে হয়। এক্ষেত্রে আবার হাঁটুকে মেলাতে কষ্ট হয়। আপনি অনেক ফাঁক করে দিলে দেখবেন হাঁটুতে মিলবে না। এই জন্য এটার ব্যাপারে সবচেয়ে সহজ যে কথাটা, যত সম্ভব ঘন হয়ে দাঁড়াবেন কাঁধে কাঁধ, দেহে-দেহে মিলে যাবে। হাত এবং পায়ের টাখনু একেবারে মেলানোটা অসম্ভব। যতটা সম্ভব কাছে থাকবে। এটা হলে ইনশাআল্লাহ এই সহীহ সুন্নতটা পালন

হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ১৩। অনেকে বলেন, সালাতে পা চার আঙ্গুল ফাঁক করে দাঁড়াতে হবে। এই বিষয়টা কেমন?

উত্তর: আমাদের দেশে মাযহাবের নামে এই কথাটা চালু আছে যে, চার আঙ্গুল ফাঁক করে দাঁড়াতে হবে। এটা মাযহাবের নামে একটা ভুল তথ্য। ইমামগণ, ফকীহগণ, চার মাযহাবের ইমাম, হানাফি মাযহাবের ফকীহগণ– কেউ এই কথাটা বলেন নি। পরবর্তী যামানার দুই একজন ফকীহ লেখেছেন, নিজেদের ইজতিহাদ অনুযায়ী। একজন মোটা মানুষ চার আঙ্গুল ফাঁক করে নামাযে দাঁড়াতে পারবে না। তার দেহই এরচে বেশি জায়গা চাচ্ছে। আল্লাহ কুরআনে কারীমে বলেছেন:

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ.

তোমরা বিনম্রতার সাথে আল্লাহর কাছে দাঁড়াও।[৩] একজন মানুষের স্বাভাবিক বিনম্রতা যতটুকু, ততটুকু দাঁড়াবে। একটা শিশুর জন্য চার আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল হতে পারে। একজন মোটা মানুষের জন্য আট আঙ্গুলও হতে পারে। এটা ইচ্ছা করে বেশি ফাঁক করে অশোভনভাবে দাঁড়ানো, এটাও وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ এর সাথে মেলে না। আবার চার আঙ্গুল ফাঁক করাটাকে দীন মনে করা– এটা ইসলামের সাথে মেলে না। বিশেষ করে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ﷺ, সাহাবিগণ, ফকীহগণ এটার কোনো সীমা দেন নি। কাজেই প্রাকৃতিকভাবে, স্বাভাবিকভাবে যেটুকু দাঁড়ালে আদব ভদ্রতা রক্ষা হয়,ওইভাবে দাঁড়াবেন।

প্রশ্ন: ১৪। আমরা সালাত শেষ করার সময় ডান এবং বাম দিকে সালাম দিই, তখন আমরা মূলত কাকে সালাম দিই?

উত্তর: এখানে প্রথম বিষয় হল, যেটা আমরা বারবার দর্শকদেরকে বলি, সেটা হল ইবাদতটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে শিখতে হয়। তিনি

---

৩. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮।

যেভাবে যেটা বলেছেন এটাই চূড়ান্ত। এখানে তিনি কোন কারণ না বললে, আমাদের কারণ বলাটা সুনিশ্চিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা তাকবীর দিয়ে শুরু করবে সালাম দিয়ে শেষ করে দেবে। সালাম কাকে দিচ্ছি, এটা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নি। তবে স্বভাবতই সালাম আমার ডানপাশে বামপাশে যে মুসলিমরা রয়েছেন, ফেরেশতারা রয়েছেন, আমরা তাদেরকে দিচ্ছি। আমরা 'আল্লাহু আকবার' তাকবীরের মাধ্যমে সালাত শুরু করেছিলাম। আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছি। দুআ করেছি। আল্লাহর প্রশংসা করেছি। আল্লাহর কাছে মনের সকল কথা বলা হয়ে গেছে। এবার আশেপাশে যারা আছেন, সেটা মানুষ হোক অথবা ফেরেশতা হোক, তাদেরকে সালাম জানিয়ে আমরা আমাদের সালাত শেষ করছি।

প্রশ্ন: ১৫। সালাতরত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যদি কেউ পড়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে মুসুল্লিরা কী করতে পারে?

উত্তর: সালাতের ব্যাপারে আমাদের অনেকেরই ধারণা, সালাত শুরু করলে ভাঙা যায় না। (আমাদের দেশে গল্প আছে, এক জায়গায় কয়েকজন সালাত আদায় করছেন। অমুসলিম দেশে। একজন এসে বলল এই তোমরা কে? কেউ কিছু বলে নি। তখন কতল করে ফেলেছে। আর বাকিরা দাঁড়ায় সালাত পড়ছে। পরের জনকে কতল করেছে, এর পরের জনকে কতল করেছে... এরকম কিছু গল্প আমাদের দেশে শোনা যায়। অমুক জায়গায় নাকি তাদের কবর আছে। এর থেকে আজগুবি মিথ্যা বানোয়াট গল্প আর হতে পারে না।) সালাতরত অবস্থায় কথা বলা যাবে, হাঁটা যাবে, চলা যাবে, সালাত ভেঙে দেওয়া যাবে। বুখারি শরীফের হাদীসে রয়েছে, একজন সাহাবি, নামটা ভুলে যাচ্ছি, তিনি উটের রশি হাতে করে নফল সালাত আদায় করছেন। পাশে দ্বিতীয় প্রজন্মের নতুন মুসলিমরা আছে। তারা একটু মশকরা করছেন। দেখো, হুজুর আবার উটের রশি হাতে করে সালাত আদায় করছে। উট তো শক্তিশালী প্রাণি! একটু খাইতে খাইতে হেঁটে গেলে উনিও হেঁটে যাচ্ছেন। কারণ

উঠে টান দিলে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। একটু লুজ দিয়ে দাঁড়াতে হয়। উনি সালাম ফিরিয়ে বলছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাহাবি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাথে এত বছর ছিলাম, এত যুদ্ধ করেছি। রাসূল ﷺ আমাদের এই সালাতই শিখিয়েছেন। আমি যদি উটটা ছেড়ে দিয়ে সালাতে দাঁড়াই, আমার মন পড়ে থাকবে উটের পেছনে। আর যদি আমি উট ধরে বসে থাকি, সালাত আদায় না করি, সময়টা বেকার নষ্ট হবে। সালাতের ভেতর এইটুক হাঁটাতে কোনো সমস্যা নেই।

এই ক্ষেত্রেও বিষয়টা তাই। যদি কেউ সালাতরত অবস্থায় অজ্ঞান হয়, পাশে কেউ পানিতে ডুবে যায়, কোথাও আগুন ধরে যায়, সালাত ভেঙে দেবেন। কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে আশেপাশে যে কজন প্রয়োজন সালাত ভেঙে তাকে নিয়ে চলে যাবেন। বাকিরা সালাতে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কাতার পূরণ করে নেবেন। ইবাদতটা কিসের জন্য? আমার এবং মানুষের জন্যই তো! মানুষের কল্যাণের জন্যই। আমি খেতে বসছি একজন লোক পানিতে ডুবে গেছেন, আমি কি খাওয়া বন্ধ করব না? সালাত তো আমার রুহের খাদ্য। আমি প্রয়োজনে ভেঙে দিয়ে পরে এসে খাব, সালাত আদায় করব। এই জন্য, এমনকি আমাদের মাসআলার কিতাবে, ফিকহের কিতাবেও আছে কারো যদি ১০ টাকার জিনিসও চুরি হতে যায়, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন পাশে একজন দশটাকার ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে আপনি ধরবেন। নামাজ ভেঙে দেবেন প্রয়োজনে। এটাই হল শরীআতের বিধান।

প্রশ্নঃ ১৬। কিছু লোক জুমুআর নামাযের দিন মসজিদের মধ্যে আগেই নামাযের মুসল্লা বিছায়ে রাখেন। এভাবে জায়গা দখল করে রাখা কতটুকু ইসলামসম্মত?

উত্তরঃ এটা সুন্নাহসম্মত নয়। যদি কেউ আগে গিয়ে বসেন, বসে থেকে উঠে এসেছেন ওযু করতে বা একটু কাজে, এজন্য যদি জায়নামায রাখেন, এটা বৈধ। কিন্তু উনি যান নি, এমনি আগে থেকে জায়নামায রেখে দিয়েছেন, নিজে বসবেন, অন্য কাউকে বসতে দেওয়া হচ্ছে না।

এটা সুন্নাহবিরোধী। উলামায়ে কিরাম কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন: ১৭। তারাবীহর সালাতের কুরআন কারীম দেখে দেখে পড়ার কোনো বিধান আছে কি না?

উত্তর: তারাবীহর নামায কিংবা অন্য নামাযে দেখে কুরআন পড়া নিয়ে ফুকাহারা মতভেদ করেছেন। তবে কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবিগণের আমলের আলোকে এটা একটা অনুচিত কাজ। কুরআন কারীম রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখস্থ করে পড়েছেন এবং কুরআন নাযিল হয়েছে মূলত মুখস্থ রাখার জন্য। এটা কিতাবে লেখে রাখার জন্য নয়। প্রতিটি মুমিনই কুরআন মুখস্থ করবে এটাই কুরআনের দাবি। আর যিনি ইমাম হবেন, তিনি হাফেযে কুরআন হবেন। এটাও ঈমানের দাবি, কুরআনের দাবি। সাহাবায়ে কেরাম কখনো কুরআন দেখে পড়েন নি। এরকম পাওয়া যায় না। শুধু একটা ঘটনা পাওয়া যায়। আয়িশা ؓ এর একজন খাদেম ছিলেন, মাওলা ছিলেন, আযাদ করা দাস ছিলেন, যাকুআন। আয়িশা ؓ অনেক সময় তারাবীহর জামাআত নিজে ব্যবস্থা করতেন। যাকুআন ইমাম হতেন। তিনি সামনে কুরআন দেখে পড়তেন। এটা একটা ব্যক্তিগত ঘটনা। আমরা যদি ইসলামের ভেতরে বেশি এবং কমের সমন্বয় না করি তাহলে ইসলামের মূল সুন্নাতগুলো মারা যাবে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িদের ঘটনাগুলো দেখছি– তারা সবাই কুরআন মুখস্থ করে পড়েছেন। একটা ঘটনা পাওয়া যায়, তিনি দেখে পড়েছেন। শতশত ঘটনার ভেতরে একটা ঘটনা এবং সেটা খুলাফায়ে রাশিদীন করেন নি, মশহুর সাহাবিরা করেন নি। একজন তাবিয়ি করেছেন। একজন সাহাবি অনুমোদন করেছেন। আয়িশা ؓ অনুমোদন করেছেন। একজন তাবিয়ি, যাকুআন সেটা করেছেন।

এই ঘটনাটাকে আমরা রীতি বানাতে পারি না। এরকম ছোট ছোট ঘটনাকে রীতি বানালে সমাজে বিদআত তৈরি হয়। এজন্য এই রেয়ার (অপ্রচলিত) ঘটনাটার বিধান কী? সর্বোচ্চ বিধান হতে পারে, এটা একটা জায়িয কর্ম। প্রয়োজনে জায়িয হতে পারে। তবে সুন্নাতের

খেলাফ, অনুত্তম কর্ম। এটা অনেক ফকীহ বলেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন এটা নাজায়িয। এটা আয়িশা ﵂ এর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। আমরা তাঁর ইজতিহাদকে সম্মান করি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবিগণ, তাবিয়িগণের সাধারণ কর্মের বিপরীতে এটা আমরা অনুমোদন করি না। এজন্য আমরা অনেক সময় দেখি ইমাম সাহেব কুরআন পড়ছেন এবং তিনি তাকিয়ে দেখছেন। এটা সত্যই আপত্তিকর কাজ। কারণ কুরআন শুনতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম এমনটা করেন নি যে কুরআন বের করে করে দেখেছেন। তাবিয়িরা এরকম করেন নি। কাজেই এটা আপত্তিকর কাজ। এটা সালাতের আদবের বিপরীত। ইযা কুরিয়াল কুরআন, মন দিয়ে শোনো। এটা আবার শোনার সাথে দেখতেও হবে- এটা না কুরআনের নির্দেশ, না সুন্নাহর নির্দেশ, না সাহাবি তাবিয়িদের কর্ম। কাদীম (আগের) ফুকাহারা ভালো কথা বলেছেন। এটা আহলে কিতাবদের অনুকরণ। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর সাথে অন্যান্য উম্মাহর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। মুসলিম উম্মাহর কুরআন একটা মু'জিযা, এটা মুখস্‌থ করতে হয়। আহলে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর বা অন্যান্য কিতাব যাদের ছিল, তারা কখনো মুখস্ত করতে পারেন নি! এটা করার মতোও কিছু না। এজন্য তারা সব সময় তাদের প্রার্থনা দেখে দেখে পড়ে। আর মুসলিম সবসময় কুরআন হিফয করে। প্রতিটি কিশোর হাফিয হয়ে উঠবে। অন্তত এরা আলিম হবেন, হাফিয হয়ে উঠবেন। কাজেই দেখে পড়াটা কুরআনের শানের বিপরীত হয়ে গেল।

প্রশ্ন: ১৮। তারাবীহর সালাতে আমাদের বোনেরা (মেয়েরা) অংশগ্রহণ করতে পারবেন কি না?

উত্তর: এখানে প্রথমেই যে মূলনীতিটা আমাদের বোঝা দরকার, ইসলামে নারী এবং পুরুষের ধর্মীয়, জাগতিক, সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকারগুলো সমান। ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত করা হয় নি। তবে দায়িত্ব কম দেওয়া হয়েছে। যেমন জামাআতে সালাত আদায় করা মেয়েদের অধিকার, কিন্তু দায়িত্ব নয়। পুরুষদের জন্য ফরয বা ওয়াজিব

দায়িত্ব। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবেই মেয়েদের অনেক সময় জামাআতে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনুমতি দিয়েছেন, তোমাদের অধিকার আছে জামাআতে যাওয়ার, তবে না গেলে তোমরা গোনাহগার হবে না।

তারাবীহর জামাআতও একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিন জামাআতে তারাবীহ আদায় করেছেন। অর্থাৎ প্রথম রাত্রে এশার পরে যে কিয়ামুল লাইল আমরা করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা জামাআতে করতেন না। একবার মাঝরাত্রিতে উনি মসজিদে ই'তিকাফের সময়ে তার যে ছোট্ট চাটাইয়ের ঘরের ভেতরে যখন তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন, তখন পেছনে সাহাবিরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন জামাআতবদ্ধ হয়ে। তিন-চার রাকআত পড়ে তিনি এটা আর কন্টিনিউ করেন নি। অন্য ঘটনায়, তিনি রমাদানের ২৩, ২৫ এবং ২৭ রাত্রিতে সাহাবিদের নিয়ে জামাআতে কিয়ামুল লাইল আদায় করছেন। প্রথম রাত্রিতে প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত, পরের রাত্রিতে বারোটা পর্যন্ত, পরের রাত্রিতে প্রায় তিনটা পর্যন্ত, সাহারি পর্যন্ত। এ রাত্রিগুলোতে কিয়ামুল লাইলের সময় তিনি তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েদেরকে জামাআতে আসতে বলেছেন– এরকমটা হাদীস শরীফে এসেছে। অর্থাৎ এই তিন রাতের কিয়ামুল লাইলের জামাআতে তিনি... وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ এরকম শব্দ হাদীসে এসেছে।[৪] তাঁর স্ত্রী কন্যাদেরকে শরিক হতে বলেছেন। এরপর আরেকটা ঘটনা, উবাই ইবন কাব ؓ তাঁর বাড়িতে কিয়ামুল লাইলের জামাআত করেন এবং সেটা মূলত মেয়েদের জন্য।

কাজেই মেয়েরা জামাআতে কিয়ামুল লাইলে হাজির হবে, পুরুষদের সাথেই। মেয়েদের যে জামাআতে থাকার ব্যবস্থা, পৃথক কাতার, পৃথক এলাকায়– যাতে সালাতের গাম্ভীর্য ঠিক থাকে, সেটা ইবাদত হয়। কিন্তু নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে মানসিক কোনো অধৈর্য বা অশান্তির পরিবেশ যেন তৈরি না হয়, সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে তারা

৪. সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬০৫; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-২২০৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২৫৪৭।

তারাবীহর জামাআতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় উপস্থিত হয়েছেন। এরপরে সাহাবিদের যুগে এসেও উমার ؓ মেয়েদের জন্য ভিন্ন একজন ইমাম ঠিক করে দেন, তিনি তাদের জামাআতে কিয়ামুল লাইল পড়াতেন। পরবর্তীতে আলী ؓ এর সময়ে পুরুষদের মূল জামাআতেই পেছনে মেয়েদের জামাআতে কিয়ামুল লাইল পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য ইসলামের মূল নির্দেশনা হল, মেয়েরা সমাজের অন্য সব বিষয়ের মতোই সালাতের জামাআতেও পুরুষদের সাথেই থাকবেন। এমনটা নয় তারা স্যাগ্রিগ্রেটেড বা ভিন্ন হবেন।

অনেক সময় আমাকে প্রশ্ন করেন যে, মেয়েরা আলাদা ঈদের নামায করবে, মেয়েরা আলাদা তারাবীহর জামাআত করবে, এটা কিন্তু ইসলামের সুন্নাহ না। ইসলামের সুন্নাহ হল সমাজটা একীভূত থাকবে। পুরুষদের বড় জামাআতেই মেয়েরা থাকবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়েই পুরুষদের দরসেই মেয়েরা পেছনে থাকতেন। পুরুষদের জামাআতেই মেয়েরা শরিক হতেন। এজন্য সবচেয়ে উত্তম হল, যদি সম্ভব হয় মেয়েরা বড় জামাআতেই মসজিদে অথবা বাসায়... যে জামাআতগুলো আমরা করি, ছেলেদের সাথে– ভিন্ন পর্দার সাথে ইসলামি আদবের সাথে মেয়েদের ব্যবস্থা করা। এটা হল সবচেয়ে সুন্দর এবং সুন্নাহসম্মত। কারণ অনেক সময় আমরা বলি যে, মেয়েদের জামাআত বন্ধ হয়ে গিয়েছে । রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে সাহাবিরা বন্ধ করে দিয়েছেন, কথাগুলো ঠিক নয়। কোনো কোনো সাহাবি মেয়েদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয জামাআতে যাওয়ার আপত্তি করেছে। এটা নিঃন্দেহে তাদের ব্যক্তিগত মতামত ছিল। উমার ؓ সাহাবিদের ভেতরে একজন ছিলেন। তিনি মেয়েদের জামাআতে যাওয়াকে একটু আপত্তি করতেন। তাঁর স্ত্রী আতিকা নিয়মিত জামাআতে যেতেন। সহীহ বুখারি ও অন্যান্য কিতাবের হাদীস, উমার ؓ আতিকাকে বলেন যে, তুমি তো জান, আমি জামাআতে মেয়েদের যাওয়া অপছন্দ করি। আমি এটাকে মাকরুহ মনে করি। আনা আকরাহুহু, তুমি কেন যাও? আতিকা বললেন, আপনি আমাকে নিষেধ করলে আমি আর যাব না। কারণ আমাদের জন্য জামামভতে যাওয়া মুবাহ (বৈধ কাজ), ফরজ

ওয়াজিব নয়। আর স্বামী যদি এ ধরনের ক্ষেত্রে কোন নির্দেশ দেন নির্দেশ পালন করা জরুরি। কাজেই আপনি যদি আমাকে আজকে বলেন যেয়ো না, আমি আর যাব না। উমার বলেন আমি কীভাবে তোমাকে নিষেধ করব! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

মেয়েরা মসজিদে যেতে চাইলে তোমরা নিষেধ করবে না।৫ তো আমি উমার কীভাবে তোমাকে নিষেধ করব? কিন্তু আমি অপছন্দ করি। আতিকা বললেন, আপনার অপছন্দ নিয়ে আপনি থাকেন, আপনি নিষেধ না করলে আমি যেতেই থাকব এবং উমার ؓ যেদিন শহীদ হন ওই দিনের ফজরের জামাআতেও আতিকা শরিক ছিলেন।[৬] কাজেই সাহাবায়ে কেরাম কখনোই মেয়েদের জামাআতে যাওয়া বন্ধ করেন নি।

মদীনার মসজিদে নববিতে সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এখন পর্যন্ত জামাআতে যাওয়া হয়। এবং এই যে, দেড়হাজার বছর হজ্জ উমরাহ চলছে, প্রতি বছরে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ মহিলা জামাআতে গেছেন। সবাই মসজিদে নামায পড়েছেন। কাজেই মসজিদে মেয়েদের নামায কখনো বন্ধ হয় নি। বিশেষ করে তারাবীহর নামাযে মেয়েদের যাওয়াটা, এটাতো রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন এবং উমার ؓ নিজে ব্যবস্থা করেছেন। কারণ তারাবীহর জামাআতের উদ্দেশ্য হল কুরআন শোনা। এক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকারটা বেশি! মেয়েরা হাফেয হন কম। [তাই সম্ভব হয় না] যে, নিজে পড়ে নেবেন। তাদের অধিকারটা বেশি। তাদের মনের আবেগ বেশি। এজন্য মেয়েদের মসজিদে বা যে সমস্ত সেন্টারে তারাবীহর ব্যবস্থা আছে মেয়েদের পর্দার সাথে ব্যবস্থা করা আমাদের খুবই দরকার। এটা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার একটা অংশ।

---

৫. সহীহ বুখারি, হাদীস-৯০০।

৬. عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهَا: وَاللهِ إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ هَذَا فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ: إِنِّي لَا أَنْهَاكِ قَالَتْ: فَلَقَدْ طُعِنَ عُمَرُ يَوْمَ طُعِنَ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫১১১।

এখানে মেয়েরা আসবেন, সবার সাথে দেখা হবে সালাত আদায় করবেন, দীন শেখার অনেক বড় একটা সুযোগ হয়।

প্রশ্ন: ১৯। মহিলারা মহিলাদের জন্য তারাবীহরর পৃথক জামাআত করতে পারবেন কি? ইমামও মহিলা হবে মুক্তাদিও মহিলা হবে। এটা বৈধ কি না?

উত্তর: বর্তমান সময়ে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। অনেক জায়গায় মহিলা কমপ্লেক্স হচ্ছে। সেখানে সবাই মহিলা থাকেন। এটা একটা জরুরি প্রশ্ন।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, মেয়েরা ছেলেদের থেকে পৃথক হবে সালাতে, সিয়ামে– ইসলাম এটা বলছে না। সালাত হল ইসলামের মূল স্তম্ভ। যেটা সমাজের ঐক্য নির্দেশ করে। এখানে মেয়ে এবং ছেলে সেগ্রিগ্রেট বা বিচ্ছিন্ন জামাআত করা রাসূলুল্লাহ ﷺ শেখান নি। মেয়েদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় পৃথক জামাআতের অনুমতি দেন নি। মসজিদের মূল জামআতে আসার অনুমতি দিয়েছেন। এজন্য সাহাবিদের যুগে, তাবিয়িদের যুগে– সকল যুগেই মেয়েরা মুসলিম উম্মাহর মূল জামাআতে হাজির হয়েছেন। মদীনার মসজিদে নববিতে যখন হাজিরা হজ্জ করতে গিয়েছেন, মসজিদে হারামে হাজিরা হজ্জ করতে গিয়েছেন– হাজার হাজার বছর ধরে– তাদের জন্য পৃথক নামাযের ব্যবস্থা করা হয় নি। পৃথক তাওয়াফের ব্যবস্থা করা হয় নি । পুরুষদের সাথেই করেছেন, পর্দার সাথে।

সহীহ বুখারির একটা হাদীসের কথা মনে পড়ল। উমাইয়া যুগে একজন শাসক বলেছেন, মেয়েরা যে ছেলেদের সাথে পাড়াপাড়ি করে তাওয়াফ করে, সুতরাং আমরা মেয়েদের তাওয়াফটা বন্ধ করে দিই। বিশেষ করে নফল তাওয়াফ। তখন আতা ইবন রাবাহ বলেছেন, আপনি কী করে বন্ধ করবেন? আমি তো উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা পুরুষদের পাশাপাশি তাওয়াফ করছেন। নফল

তাওয়াফ করছেন। তখন ওই শাসক প্রশ্ন করেছেন– যেটা আমরা সবাই করি। আমরা যখনই মেয়েদেরকে জামাআতের কথা, জিহাদে শরীক হওয়ার কথা হাদীসে শুনি; তখন একটা ধারণা করে নিই, এটা মানসুখ হওয়ার আগে ছিল। এটা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে ছিল। ওই শাসক প্রশ্ন করেছেন যে– আপনি যে উম্মুল মুমিনীনদের দেখেছেন, এটা কি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে না পরে? তখন আতা ইবন রাবাহ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পরে দেখেছি। উনি বলেছেন, আমি তো জন্মেছি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরে! তখন ওই শাসক বলেছেন, আপনি কীভাবে দেখেছেন? তখন আতা বললেন, আমি দেখেছি আয়িশা رضي الله عنها একটা তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। তিনি তাওয়াফ করতে যেতেন পুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে। পাড়াপাড়ি করে নয়, একটু দূর থেকে তাওয়াফ করতেন। একজন মেয়ে তাঁকে বলল, উম্মুল মুমিনীন! চলেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে আসি? পুরুষদের ভেতর দিয়ে চলে যাই। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও। আমি যাব না।[৭] তার মানেটা কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় থেকে এ পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষদের সাথেই তাওয়াফ করেছেন। পুরুষদের সাথেই হজ্জ আদায় করেছেন। উমরাহ আদায় করেছেন। নফল তাওয়াফ করেছেন। নফল হজ্জ করেছেন। সালাত আদায় করছেন। তারাবীহ আদায় করেছেন। এজন্য পর্দার গভীর চেতনায় তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে, এরকম চিন্তা মুসলিম উম্মাহ করে নি। এটার ভেতরেই পর্দা রাখার চেষ্টা করছেন। এ জন্য উত্তম হল, মেয়েদের সাথে ছেলেদের পর্দাসহ জামাআতে তারাবীহর ব্যবস্থা করা। তবে আমরা মনে করি, বর্তমানে মেয়েদের জন্য অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। যেখানে শুধুই মেয়েরা থাকেন। শিক্ষা, আবাসন ইত্যাদি কারণে সেখানে যদি মেয়েরা মেয়েদেরকে নিয়ে এভাবে জামাআত করেন পুরুষ ইমাম জোগাড় করা বা পুরুষদেরকে জামাআতে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, আশা করি, এটা বৈধতার ভেতরে থাকবে। অবৈধ হবে না। যেহেতু আয়িশা رضي الله عنها এর একটা ইজতিহাদ

৭. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৬১৮।

রয়েছে। এটা হয়তো আমল করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: ২০। সম্প্রতি আমেরিকাতে আমেনা ওয়াদুদ নামে একজন মহিলা নামাযের ইমামতি করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সারা পৃথিবীতে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল। আপনি কি মনে করেন, তারাবীহর সালাতের বাইরে পাঁচওয়াক্ত সালাতে মহিলাদের ইমামতি শরীআতে অনুমোদন দেয়?

উত্তর: গবেষকরা আজকাল– লিবারাল ধর্ম, কনজারভেটিভ ধর্ম, প্রাচীন ধর্ম, আধুনিক ধর্ম, এরকম ভাগ করেন। যেমন ট্রেডিশনাল, ইয়াহুদি ধর্মে এটা আছে। কিন্তু আধুনিক লিবারাল ইয়াহুদি ধর্মে এটা নেই। এক্ষেত্রে তাদের ভিত্তি হল যে, ধর্মের যারা পোপ, যাজক– এরা মোটামুটি ধর্মের কিছু পরিবর্তন করতে পারেন। ইসলামে এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। অনেক সময় সাধারণ মুসলিম গবেষকরা এটা বোঝেন না। তারা হয়তো বলেন, কিছুদিন আগে আলিমরা মাইক ব্যবহার নাজায়িয বলতেন, টিভি ব্যবহার নাজায়িয বলতেন। এখন আবার জায়িয বলেন। কাজেই ইসলামেরও তো বিবর্তন আছে। এখানে মূল বিষয়টা হল, অনেক সময় সাধারণ মানুষ বা গবেষকও বোঝেন না যে, ইসলামে যেটা টেক্সটচুয়াল– কুরআন বা হাদীসে যে বিষয়গুলো আছে– এটা কেউ কখনো পাল্টাতে পারবে না। আর ইসলামের বাইরে যে গবেষণা, ইজতিহাদ এটা যুগে যুগে পাল্টাবে। এটা খুবই স্বাভাবিক।

ইমামতির ব্যাপারে ইসলামের যেটা মূল নির্দেশনা, জামাআতে মুসলিম পুরুষ ও নারীকে বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয় নি। জামাআত একটা হবে যেটাতে নারী-পুরুষ সবাই থাকবে। এটা মুসলিম সমাজের ঐক্য ও শৃঙ্খলার নিদর্শন। এখন প্রশ্ন হল, এই জামাআতে ইমামতি করবে কে? পুরুষ না নারী? এখন একজন বলতে পারেন, সবসময় পুরুষ করবে কেন? এতে তো পুরুষের প্রাধান্য হয়ে গেল। সমান অধিকার হল না। এটা বলতে পারেন তিনি। এটা বলার সুযোগ তার আছে। বিষয়টা হল, ইসলাম যেটা দিয়েছে, একজন নারীর জন্য শরীআতের আলোকে অনেক সময় নামায পড়তে হয় না। আর এটা বিজ্ঞানও প্রমাণ করে, নারীর কণ্ঠ

অনেক সময় বিভিন্ন পুরুষের মনের ভেতরে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে, ইমোশন তৈরি করতে পারে। আমরা সাধু সাজলে হবে না। এটা মানবীয় প্রকৃতি। এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর সালাত হল ইবাদত। যে ইবাদতের ভেতরে পুরো আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহমুখিতা, চোখের পানি আমাদের দরকার। অন্য কোনো চিন্তা না আসুক।

এজন্য ইসলামের নির্দেশনা যে, ইমাম পুরুষ হবে। কারণ পুরুষ সবসময় ইমামতি করতে পারেন। একজন মহিলা ইমাম, হঠাৎ ঘোষণা দিলেন তিনি এ কারণে, ব্যক্তিগত অসুস্থতার কারণে একসপ্তাহ আসতে পারবেন না। তার ব্যক্তিগত বিষয়টা এক্সপোজ করা হল সবার সামনে। এটা তার জন্য অপমানজনক আর-কি! এজন্য পুরুষের শারীরিক এবং সামাজিক বিভিন্ন কারণে তার জন্য ইমাম হওয়া সহজ এবং ইমাম হলে তার অন্য কোনো সমস্যা তৈরি হয় না। একজন নারী, মহিলা, মুসলিমাহ মা হন। তিনি অনেক সময় দীর্ঘদিন ইমামতি করতে পারবেন না। তার বিভিন্ন সমস্যা থাকে। এজন্য ইসলাম পুরুষদের ইমামতিতেই পুরো সমাজ একসাথে সালাত আদায় করার ব্যবস্থা করেছে। একটা হাদীস এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মহিলাকে তার পরিবারের সদস্যদের ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এখানে সদস্য বলতে স্বামী পুরুষ হতে পারে। এই অনুমোদনকে ফুকাহারা ব্যক্তিগত একটা ঘটনা হিসেবে গণ্য করেছেন। সাধারণভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু অনুমতি দেন নি– এটা তারা নিতে চান না। যেহেতু এটা ইসলামের টেক্সটচুয়াল বিষয়, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে স্পষ্ট দিয়েছেন, এজন্য এক্ষেত্রে ইজতিহাদেরও কোনো সুযোগ আছে বলে মুসলিম উম্মাহ মনে করে না।

একথা থেকে হয়তো কেউ বলবেন, তাহলে ইসলাম নারীদের অধিকার কমিয়ে দিল কি না! আসলে অধিকার মানেটা কী? অর্থাৎ রিকশা চালানোর কাজটা নারী-পুরুষ উভয়ে করতে হবে, এটাই কি সমান অধিকার? নারীর প্রকৃতি, নারীর দৈহিক শক্তি বিবেচনা করতে হবে।

আমরা যখন সৌদি আরবে পড়াশোনা করতাম, কুয়েতের সাথে ইরাকের যুদ্ধ হল। তখন আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর একটা মহিলা ব্রিগেডকে সামনে (ফ্রন্টে) দেয়া হল। কারণ মেয়েরা কেন পেছনে থাকবে?! তারা সামনে আসুক। কিন্তু ওই মহিলা ব্রিগেডকে সংরক্ষণের জন্য আবার একটা পুরুষ ব্রিগেডকে নিয়োগ দেয়া হল। এই মহিলা ব্রিগেডের একজন মহিলা সৈন্য কুয়েতের মরুভুমিতে হারিয়ে যায়। তাকে খোঁজার জন্য ব্যাপক সৈন্য লাগানো হল। মেয়েদেরকে সামনে দিতে হবে এবং তারা সম্মুখ সমরে যাবে, তাদের এটাই অধিকার। এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য একটা পুরুষ ব্রিগেড নিয়োগ দিতে হবে। এটা কি সমান অধিকার? নাকি জাতীয় অর্থনীতি নিয়ে আমাদের ট্যাক্সের টাকা নিয়ে কিছু উপহাস করা হল, আল্লাহই ভালো জানেন!

অর্থাৎ ইসলাম যেটা বলছে, অধিকার সমান, কিন্তু দায়িত্ব সমান না। দায়িত্ব হবে তার শারীরিক কাঠামো, শক্তি-সামর্থ্য, তার মানবীয় প্রয়োজন অনুযায়ী। ইসলাম মানুষকে শুধু ব্যক্তি হিসেবে দেখে নি। মানুষ শুধু চাকরি করবে, খাবে, পাইলট হবে– এমনটা নয়। পরবর্তী প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার জন্য, পরবর্তী প্রজন্মদের মানুষ করে একটা সুন্দর মানবসমাজ রেখে যাওয়াও দায়িত্ব। পুরুষ যা পারেন না, নারী তা পারেন, আবার নারী যা পারেন পুরুষ তা পারেন না। কাজেই ইসলাম অধিকার দিয়েছে, দায়িত্বটা দেয় নি। এটা আমাদের বুঝতে হবে...। এবং অধিকার ও দায়িত্ব সমন্বয় হয়েছে তার নারী প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে। নারী কে পুরুষ ভেবে তার দাযিত্ব অধিকার দেওয়া হয় নি। নারীকে নারী রেখে, অর্থাৎ নারী যেন তার সকল অধিকার পাওয়ার পাশাপাশি নারী হিসেবে দায়িত্ব– যা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, পরবর্তী প্রজন্মকে সুন্দর করে রেখে যাওয়ার জন্য, এখানে যেন কোনো অবহেলা না হয়, এটা ইসলাম লক্ষ্য করেছে।

প্রশ্ন: ২১। আমরা রমাদান মাসে রোযা রাখি। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে নামায পড়তে পারি না। বিষয়টি আসলে ঠিক কি না?

উত্তর: এটা বাস্তব! রোযার মহব্বত, আবেগ, উদ্দীপনা মুসলিমদের এত বেশি– অনেক মুসলিম বারোমাস সালাত আদায় করেন না, রমাদানেও সালাত আদায় করেন না– কিন্তু রোযা রাখেন। সিয়াম পালন করেন। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মুমিন পাঁচ মিনিটের ইবাদতকে কষ্ট মনে করেন। কিন্তু পনেরো ঘণ্টা, ষোলো ঘণ্টা না খেয়ে থাকেন। এটা ঈমানের কারণেই হয়। যিনি এই কাজটা করছেন, তাকে আমরা মন্দ না বলি। তার ভেতরে ঈমান আছে বলেই তো তিনি পনেরো-ষোলো ঘণ্টা না খেয়ে থাকার আগ্রহ করছেন। কিন্তু তিনি দীনকে বুঝতে পারেন নি। এই যে পনেরো ঘণ্টা না খেয়ে থাকি– এটার মজা কোথায়? এই পনেরো ঘণ্টা সবসময় আল্লাহর কথা আমাদের মনে থাকে। আর আল্লাহর কথা মনে করাটা কত বড় আনন্দের– এটা না করলে বোঝা যায় না। যেমন মায়ের কথা যখন মনে করি– মা কাছে থাক আর দূরে থাক, বেঁচে থাক আর ওপারে থাক– আমাদের কিন্তু মন ভালো লাগে। মনটা আলাদা একটা তৃপ্তি পায়। সেটা চোখের পানিতেই পাক আর আনন্দেই পাক। এটা একটা তৃপ্তি।

সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের স্মরণ, আমাদের মানব হৃদয়ের জন্য বড় নিআমত– এটা রমাদানের রোযায় আমরা অনুভব করি; যে কারণে সবাই এটার কষ্টকে ভুলে যায়। তবে এখানে বুঝতে হবে, সালাত সিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এবং আমার জন্য বেশি উপকারী। প্রথমত ইসলামের আরকান দেখেন? প্রথম ঈমান, ঈমানের পরেই সালাত। সালাত এর পর কিন্তু সিয়াম নয়, রয়েছে যাকাত। তারপরে সিয়াম। দ্বিতীয়ত, সালাত তরককারীকে কুরআন এবং হাদীসে কাফির বলা হয়েছে। مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كفر 'যে সালাত ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল'।[৮] এই কাফির হওয়ার অর্থ দুইটা হতে পারে। সত্যিই সে কাফির হয়ে গেল অথবা কাফিরের মতোই কঠিনতম মহাপাপ করল। সিয়াম তরককারীকে কুরআন বা হাদীসে কোথাও কাফির বলা হয় নি। মহাপাপ বা গুনাহের কাজ বলা হয়েছে।

৮. সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৪৬৩; মুনযিরি, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২১৬।

আর পাপের চেতনাটা কী? পাপ মানে আল্লাহর ক্ষতি হয়ে গেল, এজন্য আল্লাহ অখুশি হলেন– এমনটা নয়। আমার ব্যক্তিগত জীবনের মহাক্ষতি করলাম। যেমন পরীক্ষক বা শিক্ষক কিছুকিছু নিয়ম দেন। এত কামাই করলে পরীক্ষা দিতেই দেওয়া হবে না। এত পারসেন্ট হাজিরা থাকলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে ইত্যাদি। সব কিছুই ছাত্রের কল্যাণে। তাহলে সালাত নষ্ট করলে মুমিনের যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, সিয়াম নষ্ট করার ক্ষতি কিন্তু ওই পরিমাণ নয়। এজন্য সালাত তরক করাকে কুফুরি বলা হয়েছে। তৃতীয়ত, সালাত কত সহজ ইবাদত। সালাত এর চেয়ে সহজ ইবাদত আর নেই। আমরা অনেক সময় কঠিন মনে করি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে একজন নতুন সাহাবি ঈমান এনেছেন। তিনি বললেন তুমি সালাত আদায় করবে, যদি সূরা ফাতিহাও না জান সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার– এই গুলো দিয়ে হলেও সালাত আদায় করো। অর্থাৎ সালাত কত সহজ। দাঁড়াতে পারলে দাঁড়িয়ে, নইলে বসে, নইলে শুয়ে। অযু করতে পারলে অযু করে, নইলে তায়াম্মুম করে। কাপড় থাকলে কাপড় পরে, নইলে নাপাক কাপড় পরে। এমনকি কাপড় না থাকলে উলঙ্গ হয়েও সালাত আদায় করারও বৈধতা রয়েছে। এতেও বান্দা কিন্তু পূর্ণ সাওয়াব পাবে। অর্থাৎ তার সাধ্যে কাপড় জোগাড় করতে পারে নি। কাজেই এই সালাত আমার জন্য এত সহজ। কিন্তু ফায়দাটা কী? সালাতে আমি যখন তাকাই, আল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি যে দুআ করি, আল্লাহ কবুল করেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

...وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

সালাতে যখন বান্দা সিজদায় যায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সে জন্য দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কাজেই তোমরা সিজদায়

দুআ করো।[৯] তাহলে আমি সিজদায় দুআ করে আল্লাহর কাছে আমার মনের কথাগুলো বলে কবুল পেয়ে যাচ্ছি। আমার নিজের এবং অনেক মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সালাতের সিজদায় যে দুআ করতে পারে তার কোনো কিছু না-পাওয়ার থাকে না। আমি অনেকের কাছে শুনেছি এবং নিজের অভিজ্ঞতাও বলে। এজন্য সালাত সাওয়াবের দিক থেকে বেশি, কর্মের দিক থেকে সহজ। আর আমার উপকারের দিক থেকে বেশি। সালাত আদায় না করে সিয়াম পালন করলে আমাদের ভয় আছে ঈমানটা যদি সত্যি চলে যায়! সিয়াম তো কবুলই হবে না। এজন্য যিনি এই কর্মটা করছেন, তাকে সালাতের গুরুত্বটা বুঝতে হবে।

আরো মজা আছে, সালাত সহজ, উপকারী এবং আমাদের জন্য কল্যাণকর। সালাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর থেকে সবই পাচ্ছি এবং সালাত আমাদেরকে সিয়ামে উদ্বুদ্ধ করছে। সালাতের মাধ্যমে আমাদের গুনাহগুলো মাফ হচ্ছে। আমরা বারো মাস সালাত আদায় করব, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য পাব। আর একটা বিষয়, আমরা অনেক সময় মনে করি সালাত আদায় করা কষ্টকর। সিয়াম তো সকাল থেকে না খেয়ে আছি। নতুন কাপড়-চোপড় পরা– (এ জাতীয়) কিছু করতে হচ্ছে না। এটা হয়ে গেল। আবার অযু করে গিয়ে সালাত আদায় করা, এটা একটা বিরক্তিকর, কষ্টকর মনে হয়।

আমরা মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে গল্প করি, আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্টকর কাজ হল খাদ্য গ্রহণ করা। কারণ খাওয়ার জন্য টাকা আয় করতে হয়। কষ্টের ব্যাপার। রান্না করতে হয়, অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার। খাওয়ার সময়ও গা ঘেমে যায়, ঝাল লাগে, বিভিন্ন কষ্ট হয়। খাওয়ার মজাটা যদি একআনা হয়, কষ্ট পনেরোআনা। খাওয়ার ভেতরে আমরা কিছু মজা পাই বটে, কিন্তু সেটা একআনা। খাওয়ার একটু উনিশ-বিশ হলে ঢেকুর ওঠে, পেটের ভেতর কষ্ট হয়, এসিডিটি হয়। আমরা যদি এটাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করি তাহলে দেখব, খাওয়ার ভেতর একআনা

৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৭৯, ৪৮২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৭৫, ৮৭৬।

আনন্দ আর পনেরোআনা কষ্ট। কিন্তু আমরা কেউ খাওয়া বাদ দিতে রাজি না। খাওয়ার জন্য জীবনে এত কষ্ট করছি– একআনা আনন্দের জন্য। সালাতের কষ্টটা কিন্তু একআনা, কিন্তু আনন্দ পনেরোআনা। আমরা যদি এটা অনুভব করি, সালাতটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। আমরা সমাজে যখন দেখি, একটা লোক রোযা রাখছে কিন্তু সালাত আদায় করছে না, আমরা হয়তো তাকে রাগ করি, বকা দিই, খারাপ মন্তব্য করি। এটা কিন্তু মুমিনের দায়িত্ব না। আপনাদের কাছে অনুরোধ হল, আমাদের দায়িত্ব কিন্তু মানুষের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করা নয়। বরং যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করছেন, তাকে কীভাবে আমরা ভালোর পথে আনব। রমাদানে যিনি সিয়াম পালন করেন সালাত আদায় করেন না তিনি আমার মুমিন ভাই। তার ঈমানের কারণে তিনি সিয়াম পালন করছেন। তাকে যদি অনুরোধ করে আমরা সালাত আদায়কারী বানাতে পারি, এটা আমাদের সফলতা। প্রত্যেকে চেষ্টা করব কিছু নতুন ভাইকে নামাযি বানাতে। আমরা সমালোচনা না করে দাওয়াত দিই। দাওয়াত হবে আদর করে, গালি দিয়ে নয়। যেটা আল্লাহ কুরআন কারীমে বারবার বলেছেন।

প্রশ্নঃ ২২। আমরা অনেকেই এমন আছি যারা রমাদান মাসে রোযা রাখি। কিন্তু কর্মব্যস্ততার কারণে চাকরি-বাকরি, অফিস-আদালতের কারণে তারাবীহর সালাতে শামিল হতে পারি না, সেক্ষেত্রে আমাদের রোযার কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তরঃ জ্বি, এটা আমাদের অনেকেরই প্রশ্ন। আমাদের সমাজে এমনও দেখা যায় যে, তারাবীহর দুআ জানেন না এজন্য তারাবীহ পড়েন না। আর তারাবীহ যেহেতু পড়েন না সে জন্য রোযা রাখেন না বা সিয়াম পালন করেন না। এটা আমাদের সমাজের একটা ভুল ধারণা। রমাদান মাসে সিয়াম বা রোযা একটা ভিন্ন ইবাদত। তারাবীহ-কিয়ামুল লাইল একটা ভিন্ন ইবাদত। সিয়াম ফরয। তারাবীহ বা কিয়ামুল লাইল সুন্নাহ।

তারাবীহ নামক ইবাদতটা পালন না করতে পারলে এটার জন্য আমাদের

কম বা বেশি গুনাহ হতে পারে। কিন্তু এজন্য সিয়ামের কোনোই ক্ষতি হবে না। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় দর্শকদের সচেতন হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, তারাবীহর নামায জামাআতে আদায় করতে না পারলে বোধহয় আর হল না। কর্মব্যস্ততা থাকতে পারে, সফর থাকতে পারে... আমরা ঘুমানোর আগে কিয়ামুল লাইল পড়ে নিলাম; আট-দশ রাকআত যা পারি।

এখানে আরেকটা জরুরি বিষয়, আমরা বাংলাদেশের মানুষ বা বাংলাদেশীরা যারা, যে যেখানে থাকি ভুল করি। তারাবীহর জামাআত যেহেতু পড়তে পারব না, (এ জন্য) ইশার নামাযেও গেলাম না। ইশার সালাত জামাআতে আদায় করা ফরয বা ওয়াজিব দায়িত্ব। কেউ যদি শরীআতের ওযর অর্থাৎ অসুস্থতা বা কোনো ভয়ের কারণ ছাড়া ফরয নামাজ একা পড়েন তাহলে গুনাহ হবে। নামায আদায় হবে, কিন্তু গুনাহ হবে। কাজেই ইশার সালাত রমাদান মাসে একাকি আদায় করে গুনাহগার কেন হব?! ইশার সালাত আদায় করব। যদি মসজিদে পারি ভালো, নইলে দুই-পাঁচজন বন্ধু মিলে অন্তত জামাআতটা আদায় করব। আর তারাবীহ বা কিয়ামুল লাইল আমরা কর্মশেষে বাড়িতে গিয়ে আদায় করে নেব। কাজেই এটা বাদ দেয়ার দরকার নেই। বেশি না পারি, যতটুকু পারি পড়ে নেব। তারাবীহর নামায পড়তে পারলাম না, তাই ইশার নামাযও পড়লাম না, এটা আসলে খুবই মারাত্মক। আর কিয়ামুল লাইল– বিশ রাকআত, না পারলে দশ রাকআত, আট রাকআত– যা পারি ঘুমানোর আগে পড়ে নেব। অন্তত রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইলের যে আদেশটা দিয়েছেন এটা পালন করা জরুরি।

প্রশ্নঃ ২৩। পান, জর্দা খাওয়া ইমামের পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর: এখানে কয়েকটা বিষয়। একটা হল, নামায জামাআতে পড়তেই হবে। এটা আমার দায়িত্ব। আর ভালো ইমাম নেওয়া সমাজের দায়িত্ব। সমাজের দায়িত্ব অবহেলার কারণে আমার দায়িত্বে অবহেলা করার

কোনো সুযোগ নেই। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ

[তোমরা প্রত্যেক মুসলিমের ইমামতিতে সালাত আদায় করবে, সে নেককার হোক বদকার হোক][১০]

মদখোর ইমামের পেছনে সাহাবিরা নামায পড়েছেন। উমাইয়া শাসনামলে এক মদ্যপ খলীফার পেছনে সাহাবিরা নামায পড়েছেন। এটা সহীহ হাদীস, শিয়াদের বানানো নয়। সে ফজরের নামায চার রাকআত পড়েছে। সালাম ফিরিয়ে বলছে, কম পড়ল নাকি আরেকটু পড়ব? সম্ভবত পেছনে হুযায়ফা ছিলেন। বললেন, তুমি তো শুরু থেকেই বাড়িয়েই চলেছ, আর বাড়ানোর দরকার নেই। বিষয় হল এটা হাদীসে এসেছে। জামাআতে নামায পড়া মুমিনের দায়িত্ব। আর ভালো ইমাম সমাজের দায়িত্ব। কাজেই জামাআতে নামায মিস করা যাবে না। সর্বোচ্চ এক মসজিদে না হলে আরেক মসজিদে পড়তে হবে।

তামাকের বিষয়টা হারাম, এটা নিশ্চিত। তবে যেহেতু কিছু মতভেদ আছে, কোনো কোনো আলিম এটাকে জায়িয বলেছেন, কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের সফট হতে হবে। আমরা বারবারই বলব এটা নাজায়িয, হারাম। এই কারণে শিরক কুফর কিংবা 'মানসুস আলাইহি' হারাম, যেটা কুরআন হাদীসে স্পষ্ট হারাম, এর বাইরে যেখানে মুজতাহিদদের মতভেদ আছে, এসকল ক্ষেত্রে আমাদের একটু সফট হতে হবে। আমি নিজে হারাম জানব, কিন্তু এ কারণে তাকে গীবত, মিথ্যা, হত্যা এরকম হারামে পাপীর মতো মনে করব না।

প্রশ্ন: ২৪। টুপি ছাড়া নামায পড়লে নামায হবে কি না?

উত্তর: আমরা ইবাদত বন্দেগির স্পিরিচুয়ালিটি কিংবা আত্মিক বিষয় না দেখে আনুষ্ঠানিকতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিই। অথচ কুরআন

১০. সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৭৬৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৯৪, ২৫৩৩।

কারীমে আনুষ্ঠানিকতার অনেক কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে আনুষ্ঠানিকতা এসেছে, সেখানে অনেক ঢিল দেয়া হয়েছে, আন্তরিকতা মনোযোগটাই বেশি বলা হয়েছে। টুপি মুসলিমদের একটা পোশাক, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরেছেন। কিন্তু সালাতের জন্য টুপি পরতেই হবে এমন কোনো নির্দেশ নেই। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

তোমরা মসজিদে যেতে সৌন্দর্য ধারণ করো।[১১] কাজেই আমরা টুপি পরব, পাগড়ি পরব, সুন্দর জামা পরব– এটা ভালো। কিন্তু টুপি না পরলে সালাত হবে না, সালাতের কোনো দোষ হবে– এটা সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ করা কঠিন। কেউ কেউ বলেছেন এটা মাকরুহ হবে। এটা অনেক পরবর্তী প্রজন্মের ফকীহদের কথা।

তবে এরচেয়ে বড় গুরুত্বের কথা, আমরা যেটা অন্যায় করি, সেটা হল কেউ সালাত আদায় না করলে, আমরা তাকে কিছু বলি না। একটা যুবক সালাতে যায় না, আমি দেখছি মসজিদের সামনে এসে বসে বসে গল্প করছে, কোনো বিরক্তি প্রকাশ করি না। আর একজন যুবক মসজিদে ঢুকে সালাত আদায় করেছে, হয়তো টুপি নেই, তার প্রতি আমরা বিরক্তি প্রকাশ করি। এর অর্থ আমরা মুখে অথবা কার্যত প্রমাণ করছি, সালাত একটা নফল কাজ। করলে করো, না করলে কোন সমস্যা নেই। আর এটা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। তার জন্য ফরয সালাত আদায় করা, মসজিদে যাওয়া জরুরি। টুপিটা দরকার না হলে তার ক্ষতি হচ্ছে না। আমরা তাকে বলতে পারি, তুমি যুবক, নামাযে এসেছ, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি একটা টুপি কেনো, অথবা তোমাকে আমি একটা টুপি হাদিয়া দেব। এটা বলতে পারতাম।

প্রশ্ন: ২৫। নয় জিলহজ্জে আরাফাতের ময়দানে যারা অবস্থান করেন, তারা যুহরের সালাত ও আসরের সালাত কীভাবে পড়বেন?

---

১১. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত: ৩১।

উত্তর: ফিকহি কারণে, এটা নিয়ে বেশ ঝগড়া হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, হজের ইহরাম করলে ঝগড়া কোরো না।[১২] আর হজ্জে গিয়ে যে ঝগড়া হয়, একজন হাজি ৪০ বছরের জীবনে যে ঝগড়া করে নি, আজ হজ্জে গিয়ে তার চেয়ে বেশি ঝগড়া করে। তার একটা হল আরাফার ময়দান। আরাফার ময়দানের আর একটা বিষয় হল, কীভাবে পড়া হবে। এখানে দুটো সমস্যা হয়, আমরা কসর করব? না পুরো পড়ব? একসাথে পড়ব নাকি আলাদা করব? এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ একসাথে পড়েছেন এবং কসর করেছেন। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। বিষয়টা ফুকাহারা বলেছেন, কোন কারণে করেছেন। এই কারণ খুঁজতে গিয়ে ফুকাহাদের মতভেদ হয়েছে। প্রথমত, ইমাম আবু হানীফা রাহ বলেছেন, যদি বড় জামাআতে শরিক হওয়া যায় তাহলে একসাথে পড়তে হবে। আর যদি তাদের ছোট জামাআতে পড়া হয় তাহলে আলাদা করে যুহরের ওয়াক্তে যুহর, এবং আসরের ওয়াক্ত আসর পড়তে হবে। তার এই বক্তব্যের পক্ষে মূলত কোনো সুন্নাত, হাদীস নেই। তবে একটি মৌলিক যুক্তি আছে, সেটা হল এই যুহর-আসর একসাথে পড়া, সেটা ইমাম এবং রাষ্ট্রপ্রধানের, হজ্জের যিনি লিড দিচ্ছেন তার অধিকার। কাজেই তার জামাআতে শরিক না হলে তুমি এটা করতে পার না। এটা তার যুক্তি। এর বিপরীতে হানাফি মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য সকল ফকীহ আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি, তাঁরা বলছেন, ছোট জামাআত বা বড় জামাআত উভয় ক্ষেত্রে জমা (একত্র) করতে হবে। তাদের দলীল হল, আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵁, তিনি বড় জামাআত পেলে অথবা তাঁবুতে ছোট জামাআত করলে, উভয় অবস্থায় সালাত জমা করে পড়তেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ একসঙ্গে পড়তেন। আলাদা করার অনুমতি দেন নি। সাহাবিরাও একসঙ্গে পড়েছেন বলে প্রমাণিত। সেক্ষেত্রে অন্যযুক্তি দিয়ে এটাকে আলাদা পড়ার রেওয়ায চালু করাকে তাঁরা আপত্তি করেছেন। এজন্য উত্তম হল, আমরা তাঁবুতেই পড়ি আর বড় জামাআতেই পড়ি, যুহর-আসর একসঙ্গে পড়ব।

---

১২. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭।

তবে এখানে মনে রাখতে হবে, যদি আলাদা পড়া হয়, তবে তার নামায হবে না, এমনটা ঠিক নয়। আমরা যেটা করি, যারা একসঙ্গে পড়ার পক্ষে তারা বলেন যে, ওই দেখো, ওরা নবীজির সুন্নাত ইনকার করেছেন। ওরা আরাফার মাঠে কাফির হয়ে গেছে। আবার যারা আলাদা পড়ি, তারা বলি, ওই দেখো, মাযহাব পালন করে নি, ওহাবি হয়ে গেছে। বুঝতে হবে, মাযহাবে পালন করে নি, ইমাম আবু ইউসুফ মুহাম্মাদও করেন নি। তাঁরা যেহেতু না করার পরেও হানাফি আছেন আমাদের সমস্যা নেই। আবার ওয়াক্তিয় নামায ওয়াক্তে পড়লে হবে না, এটা বলার সুযোগ নেই। কাজে কেউ যদি, জমা না করেন আর কসর না করেন, তার সালাত হবে না, এমনটা বলা ঠিক নয়। আমরা ঝগড়া না করে যার যেটাকে জোরালো মনে হয়, আমরা আমল করি। অন্য সকল মুসলিমের জন্য দুআ করি।

প্রশ্ন: ২৬। আমাকে বিভিন্ন কাজে ৭০ কিলোমিটার দূরে যেতে হয়। এক্ষেত্রে কি আমাকে সালাত কসর করতে হবে?

উত্তর: কসরের দূরত্ব নিয়ে অনেক কথা আছে। অধিকাংশের মতে অন্তত ৮০ কিলোমিটার দূরে কোথাও না গেলে সালাত কসর হয় না। এ জন্য যেহেতু ৭০ কিলো দূরে যাচ্ছেন, কসর না করলেই ভালো হয়। এটা অধিকাংশ ফকীহের মতেই কসরের দূরত্ব নয়। যদিও এ বিষয় নিয়ে অনেক কথা আছে। হাদীসে সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করে দেয়া হয় নি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সাবধানতামূলক মতটা গ্রহণ করাই উত্তম।

প্রশ্ন: ২৭। যারা বিমান বা জাহাজের সফরে থাকেন, চাকরি করেন তাদের ক্ষেত্রে কী মাসআলা?

উত্তর: তারা মুসাফির থাকবেন যতদিন না তারা কোন স্টপেজে বন্দর অথবা বাড়িতে ইকামতের নিয়ত না করবেন, ততদিন তিনি নিজেকে মুসাফির গণ্য করবেন, কসর করবেন। সফরের অন্যান্য বিধান থাকবে।

প্রশ্ন: ২৮। আমেরিকাতে বিভিন্ন জায়গায় মর্টগেজ নিয়ে মসজিদ করা হয়। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু সুদ থাকে। ওই মসজিদে নামায পড়া কতটুকু বৈধ হবে এবং যারা এভাবে মর্টগেজ নিয়ে মসজিদ করে ফেলেছেন তাদের ক্ষেত্রে কী হবে?

উত্তর: প্রথম কথা হল, সালাত বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে এটাতে কোনো সমস্যা নেই। সালাত জীবনের সাথে জড়িত একটা কর্ম। কাজেই আমি যেকোনো জমিনের উপরে সালাত আদায় করতে পারি। সালাত বৈধ হবে। মসজিদ ওয়াকফ হবে কি না, এটা ভিন্ন কথা। জমিনের যেকোনো জায়গায় সালাত আদায় করলেই সেটা বৈধ হবে।

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا

কারণ সকল জমিনই মসজিদ।[১৩] কাজেই এই ধরনের মসজিদে সালাতের বৈধতার বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তবে যারা করবেন, তারা সুদভিত্তিক লেনদেনমুক্ত হয়ে মসজিদ করার চেষ্টা করবেন। আর যারা করে ফেলেছেন তাদের ব্যাংকের টাকাটা দ্রুত পরিশোধ করে সুদমুক্ত হতে হবে। এজন্য সুদভিত্তিক লেনদেন না করে কীভাবে মসজিদ করা যায়...! প্রয়োজন একটা ঘর ভাড়া করে আমরা মসজিদ করব, কিংবা সবাই মিলে টাকা জোগাড় করার পরে কিনব। আপাতত ভাড়া বাড়িতে ইবাদত করতে থাকি। এটার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে সাধ্যের ভেতর। আল্লাহকে ভয় করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন: ২৯। সালাতুল তাসবীহ নামে একটা নামাযের কথা শুনেছি। এটা পড়ার নিয়ম কী?

সালাতুর তাসবীহর ব্যাপারে যতগুলো হাদীস আছে, প্রায় সব হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল। একটা হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ সনদগতভাবে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এটা হল সনদের ব্যাপারে। অর্থের দিক থেকে যেটা সমস্যা সেটা হল সালাতুত তাসবীহ, যে ভাষায় বলা হয়েছে এবং

১৩. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩১৭।

যে পদ্ধতি, সেটার একটাও ইসলামের সুন্নাতের অন্যকোনো বিষয় দ্বারা প্রমাণিত নয়। চাচা আপনাকে আমি এমন একটা বিষয় শিক্ষা দেব– এই ধরনের ভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যকোনো হাদীসে তাঁর চাচার সাথে কথা বলেন নি। জীবনে প্রতিদিন করবেন নইলে মাসে নইলে সপ্তাহে নইলে জীবনে একবার...। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, ইবাদত শিক্ষা দেওয়ার ভঙ্গি– এটার সাথে মেলে না। এরপরে গুণেগুণে তাসবীহ পড়ার কর্ম মেলে না। এজন্য অনেক ফকীহ মুহাদ্দিস বলেছেন, এ হাদীসের অধিকাংশ যয়ীফ। একটা হাদীসের সনদ কিছুটা গ্রহণযোগ্য হলেও মতন বা অর্থের দিক থেকে এটা মুনকার অর্থাৎ আপত্তিকর। এরপর একটা গ্রহণযোগ্য আছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, এটার উপরে আমল করা যাবে।

এটার পদ্ধতি হল, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার– এই চারটি মূল যিকির তাসবীহ এক এক রাকআতে ৭৫ বার করে পড়ে, চার রাকআতে ৩০০ বার করা হয়। প্রথমে দাঁড়িয়ে পনেরবার এরপর তিলাওয়াত শেষ করে... এরপর রুকুতে, রুকু থেকে উঠে, সিজদায়, সিজদা থেকে উঠে, সিজদায় গিয়ে। সাতবারে ৭০, প্রথম রাকআতে ৫ বেশি করে। এভাবে প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ হলে চার রাকআত ৩০০ বার।

আমাদের সমস্যা হয়েছে, সবকিছুতেই কম পরিশ্রম করে বেশি পাওয়ার একটি অতিআগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই অতিআগ্রহ ইসলাম দূর করেছে। নিয়মিত আমল অল্প হলেও এটা আমাদের স্পিরিচুয়ালি যত লাভ হয়, আল্লাহর কাছে তত বেশি সাওয়াব হয়। আর বেশি আমলের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু দিয়েছেন, যেমন একজন মানুষ যদি কোনো রোগীকে দেখতে যায়:

مَنْ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ

যদি কেউ সকালবেলায় একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, সন্ধ্যা

পর্যন্ত আল্লাহর ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে।[১৪] এরকম সামাজিক কর্মের ভেতরে ব্যাপক সাওয়াব আছে। অথচ আমরা এগুলোকে দুনিয়াবি কাজ মনে করি। তাসবীহ তাহলীল নিয়মিত করাটা হল নফল ইবাদত। নিয়মিত করাটাই হল সবচেয়ে সাওয়াবের কাজ, যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। আমরা এগুলোর দিকে মন দেব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো স্বামী বা স্ত্রীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়, সে উঠে অযু করে তার স্বামী বা স্ত্রীকে ডাকে, না উঠতে চাইলে একটু পানি ছিটিয়ে যদি ডেকে দেয়। দুইজনে মিলে যদি দুই রাকআত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে...

كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

তাদেরকে শ্রেষ্ঠ যাকির হিসেবে আল্লাহ তাআলার দরবারে গণ্য করা হবে।[১৫] দুজনে মিলে গভীর রাতে একসাথে সালাত আদায় করার মাধ্যমে যে বরকত পাওয়া যায় এটা অতুলনীয়। এগুলো নিয়মিত করার চেষ্টা করতে হবে।

---

১৪. তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৩২৪।
১৫. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৫১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৩৫।

জানাযা/দাফন-কাফন

প্রশ্ন: ৩০। কোনো বড় ব্যক্তি মারা গেলে তার গায়েবানা জানাযা পড়া হয়ে থাকে। আমাদের এলাকার কয়েকজন আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা এ পদ্ধতিকে সঠিক বলেন। তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাবশার বাদশা নাজ্জাশির জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। এখন জানার বিষয় হল, গায়েবানা জানাযার নামায বৈধ কি না? আর নাজ্জাশির ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় কি না? দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন?

উত্তর: আমাদের বর্তমানে অন্যান্য সালাত না পড়লেও গায়েবানা জানাযা হয়, কখনো রাজনৈতিকভাবে, কখনো ধর্মীয়ভাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবি দূরে মৃত্যুবরণ করেছেন, শহীদ হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কারো জন্য গায়েবানা জানাযা করেন নি। কখনোই কারো জন্য নয়। একমাত্র ব্যাতিক্রম ঘটনা হল নাজ্জাশি। এই ব্যতিক্রমী ঘটনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, এই নিয়ে ফুকাহারা মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, এটা তার জন্য ব্যতিক্রম ঘটনা ছিল। এটার উপরে আমরা শরীআতের বিধান আনব না। এটা শরীআতের একটা মূলনীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো কাজ নিয়মিত করেন এবং সর্বদা করেন, আগেও করেছেন পরেও করেছেন, মাঝে একটা ব্যতিক্রম করেন, তখন উলামায়ে কেরাম অনেক ক্ষেত্রেই এটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করেন। বাকি কর্মকে

সুন্নাত হিসেবে গণ্য করেন।

দ্বিতীয় আরেকটা মত হল, এই ব্যতিক্রমকে বিধান করা, সর্বাবস্থায় গায়েবানা জানাযা বৈধ। এটা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দুর্বল মত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় অনেক সাহাবি মৃত্যুবরণ করেছেন। কারো ক্ষেত্রে এটা করেন নি। কাজেই, এই একটা ক্ষেত্রে করেছেন, সুতরাং এটা হয় ব্যতিক্রম হবে, নইলে কোনো কারণবশত হবে।

এক্ষেত্রে তৃতীয় মত হল, যেটা আমার কাছে সবচেয়ে জোরালো মনে হয়, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রাহ বলেছেন, যদি কোনো মুসলিম এমন কোথাও মারা যায়, যে দেশে তার জন্য কোনো জানাযার ব্যবস্থা নেই, মুসলিম কেউ সেখানে নেই, তাকে জানাযা ছাড়া দাফন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলিমগণ বা মুসলিম উম্মাহর প্রধান তার জন্য গায়েবানা জানাযা করতে পারবেন। যেটা নাজ্জাশির ক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার দেশে আর কেউ গ্রহণ করে নি। সেটা খ্রিস্টান প্রধান দেশ ছিল। সেই সময় ইথিউপিয়ায় কিছু ইউনিটেরিয়ান খ্রিস্টান ছিলেন যারা, তাদের মধ্যে ছিল নাজ্জাশি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ খবর পেয়ে মুসলিম হন। এ ক্ষেত্রে যেহেতু তাকে জানাযা করানো হয় নি, অন্য পদ্ধতিতে দাফন করা হচ্ছে। ওহির মাধ্যমে খবর পেয়ে তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। এরকম কোনো ক্ষেত্র যদি ঘটে, কোনো মুসলিম মৃত্যুবরণ করছেন, শহীদ হয়েছেন, মারা গিয়েছেন, কিন্তু তার জানাযা কোনোভাবে হয় নি, তার জানাযা হতে পারে। কারণ জানাযা হল মৃত ব্যক্তির উপর সাধারণ মানুষের ফরযে কিফায়া দায়িত্ব। এটা ফরযে আইন নয় যে, প্রথম জামাআত শেষ হলে আবার জানাযা আদায় করব। এ জন্য গায়েবানা জানাযার ক্ষেত্রে তিনটা মতই আছে। কিন্তু সবচেয়ে জোরালো মত, যদি কোনো মুসলিম এমন জায়গায় মারা যায় যার কোনো জানাযা হয় নি, তার জন্য গায়েবানা জানাযা করা

যেতে পারে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এটা সুন্নাহসম্মত নয়। এ মতটাই জোরালো।

প্রশ্ন: ৩১। যদি কারো হৃদয়ে এরকম মহব্বত থাকে, আমি তার জানাযায় যেতে পারলাম না! সে ক্ষেত্রে গায়েবানা জানাযা না পড়ে অন্য কী আমল করা যায়?

উত্তর: জানাযা তো দুআর জন্য। আমি অবশ্যই তার জন্য প্রাণ খুলে দুআ করব। আমি সর্বদা তার জন্য দুআ করব। আল্লাহ কুরআনে দুআর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যারা আগে মারা যায়, তাদের জন্য পরবর্তীরা দুআ করবে:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

আল্লাহ আমাদের মাফ করেন, আমাদের আগে যারা চলে গেছে তাদের মাফ করবেন।[১] আমরা তাদের জন্য হৃদয় ভরে দুআ করব। একটা পদ্ধতি হল সালাতুল জানাযা। যারা মৃতকে পাবেন একবার করলেই মুসলিম উম্মাহর সবার জন্য আদায় হয়ে যাবে। আমরা তার জন্য দুআ করতে থাকব।

প্রশ্ন: ৩২। আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বা বিভিন্ন ধনী ব্যক্তির একাধিকবার জানাযা হয়ে থাকে এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর: এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই করেন নি। জানাযা হল মাইয়্যেতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব, একবারেই শেষ। এটা ফরযে কেফায়া। মনে করেন সালামের উত্তর দেয়া, ওয়াজিবে কেফায়া। আমরা পাঁচজন আছি, একবার সালাম দিয়ে দিলাম। আর একজন আগুন্তুক সালাম দিয়ে দিল, আমরা উত্তর দিয়ে দিলাম। আবার একটু

---

১. সূরা [৫৯] হাশর, আয়াত: ১০।

পরে আরো একজন, আবার একটু পরে আরেকজন– এরকম তো না। সালাতুল জানাযায় উপস্থিত যারা আছেন, যারা সুযোগ পেয়েছেন সালাত আদায় করে দাফন করেছেন দায়িত্ব শেষ। ব্যক্তিকে বারবার জানাযা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো করেন নি। করার সুযোগ দেন নি, নেন নি। শুধু একটা ব্যতিক্রম আছে। একজন মহিলা যিনি মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। মহিলা সাহাবি। তিনি রাত্রিবেলা মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবিরা রাতেই তাঁকে জানাযা করে দাফন করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরদিন জিজ্ঞেস করলেন, ওই মেয়েটা কই দেখছি না তো! তিনি কিন্তু অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। গরীব ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল সাহাবির খবর রাখতেন তিনি। এবং সবাই মনে করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করেন। এত আন্তরিকতার সাথে তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন। তো সাহাবিরা বললেন, উনি তো রাতে মারা গেছেন। আমরা দাফন করে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে বললে না কেন? সাহাবিরা বলল রাত হয়ে গেছে, আপনি কষ্ট পাবেন কি না...।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের পাশে দাড়িয়ে চার তাকবীর দিয়ে জানাযা আদায় করলেন। এই থেকে ফুকাহারা দলীল দিয়েছেন, যদি কোনো মাইয়েতের অভিভাবক, রাষ্ট্রপ্রধানরা, সকল মাইয়েতের অভিভাবক– রাসূলুল্লাহ ﷺ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর অভিভাবক ছিলেন– কোন মাইয়েতের অভিভাবকের অনুমতির বাইরে যদি জানাযা হয়, তবে ওই অভিভাবক আবার জানাযা করতে পারে। এটা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে বা তার নিকটতম আত্মীয় হতে পারে।

যাকাত/মানত

প্রশ্ন: ৩৩। আমাদের একভাই প্রশ্ন করেছেন, যাকাত কি রমাদানের সাথে রিলেটেড? নাকি রমাদানের বাইরেও যাকাত দেওয়া যায়?

উত্তর: জি না। যাকাত মূলত একটি পৃথক ইবাদত। বরং সিয়ামের আগে, ঈমানের পরে, দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাত। তৃতীয় হচ্ছে যাকাত। চতুর্থ সিয়াম। রমাদান মাসের সাথে ফরয সিয়াম জড়িত। যাকাত মূলত জড়িত নয়। তবে সাহাবিদের যুগ থেকেই রমাদান মাসেই যাকাত দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। উসমান ﵁ এর একটা বক্তব্য আছে যে, রমাদান মাস আসলে তিনি বলতেন, এই মাসে তোমরা যাকাত দাও। কাজেই যাদের ঋণ আছে, হিসাব বাদ দিয়ে তোমরা যাকাতগুলো আদায় করে দাও।[১] রমাদান মাসে যাকাত দেওয়ার একটা প্রবণতা সাহাবিদের যুগ থেকেই ছিল, আছেও। যাকাত যে কোনো মাসে দিলেই হবে।

যাকাতের মূল বিধান হল, একটা নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ সম্পদ একবছর যদি কোনো মুমিনের কাছে থাকে, তিনি এই সম্পদের যাকাত দেবেন। বছর যেদিন পূরণ হল ওই দিনই তার উপর ফরয হয়ে গেল। তবে রমাদানে যাকাত দেওয়ার অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। তার একটা হল, এটা মুসলিম সভ্যতার একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য যে,

১. মুআত্তা মালিক, হাদীস-৬৬৮; মুসনাদ শাফিয়ি, হাদীস-৬২০; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৭০৮৬; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১০৫৫৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৭৬০৬।

মুসলিমরা যে কোনো আনন্দের জন্য আগে ত্যাগ করে তারপরে ভোগ করে। বর্তমান বিশ্বের যত আনন্দ আছে, যত উৎসব আছে, সব উৎসব ভোগমুখী। ত্যাগের কোনো নমুনা নেই। আনন্দ করতে হবে– এটুকুই। ইসলাম দুটো বড় ঈদ দিয়েছে। এসময় আনন্দ করতে হবে। তুমি খাবে আনন্দ করবে– এটা মূলত আনন্দ নয়। তোমার আশপাশে গরীব মানুষেরা সবাই আনন্দ করবে এটা নিশ্চিত করার পরে তুমি আনন্দে শরীক হও। এজন্য যাকাত দেওয়াটা রমাদানে দেওয়ার কারণে যেটা হয়, মানুষেরা সবাই কিছু না কিছু সম্পদ পেয়ে যায়। যারা একটু দুর্বল রয়েছেন, অসহায় রয়েছেন, চিকিৎসা হচ্ছিল না তারাও ঈদের আনন্দের জন্য পারিবারিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। দ্বিতীয়ত এই মাসে দান করলে আল্লাহ সাওয়াব বেশি দেন। এরকম বিভিন্ন হাদীসের আলোকে বোঝা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমাদানে উমরাহ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে একটা হজ্জ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। এসকল কারণে সাহাবিদের যুগ থেকেই মুসলিম সমাজে রমাদান মাসে যাকাত দেওয়ার একটা প্রচলন রয়েছে। এটা ভালো। সাওয়াব বেশি আছে। মুসলিমরা একসাথে অনেক সহযোগিতা পান। তবে এটা জরুরি নয়। যেদিনই আপনার সম্পদ একবছর পূর্ণ হবে, আরবি চান্দ্র অর্থাৎ লুনার ক্যালেন্ডার হিসাবে ৩৫৪ দিন পূর্ণ হবে, ওই দিনই যাকাত দেওয়া ফরয।

প্রশ্ন: ৩৪। রমাদানে যাকাত দেওয়ার ফযীলতের কথা আমরা শুনলাম। কিন্তু এমন যদি হয়, কোনো একজন অভাবী ব্যক্তি আমার কাছে রমাদানের আগে অথবা অন্য কোনো সময় চলে এসেছে। কিন্তু আমি তখন সম্পদের কাউন্টটা করছি না। আরো পরে করব হয়তো বা। আমি কি তাকে ওই সময় যাকাত দিতে পারব? বা যাকাত দেওয়ার সুরতটা কী?

উত্তর: জ্বি! অবশ্যই পারব। যাকাত অগ্রিম দেওয়া যায়, বাকিও দেয়া যায়। অর্থাৎ আমি গত রমাদানে যাকাত দিয়েছি, আগামী রমাদানে

হিসাব করে যাকাত দেব। সারা বছরই আমি বিভিন্ন সময় যাকাত যখন দেব, আমার মনের নিয়তই হবে যাকাত দিচ্ছি। আমার এই বছরের যাকাতে যা আসবে, সেখান থেকে আমি আজকে দুইলাখ দিলাম, আমি আজকে পাঁচহাজার দিলাম, আজকে দুইশত দিলাম। আমরা ওটা লিখে রাখব। আমি রমাদানের সময় যখন যাকাতের টোটাল হিসাব করব, আমি যদি দেখি, আমার একলাখ টাকা যাকাত এসেছে, আমার ইতিমধ্যে পঁচিশহাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, বাকি পঞ্চাশহাজার এখন দিয়ে দেব। আবার বাকিও দেয়া যায়। গত রমাদানে আমার যাকাত ফরয হয়েছিল বিশহাজার, আমি পাঁচহাজার দিয়েছিলাম, পনেরোহাজার দিয়েছিলাম, দুইহাজার বাকি রয়ে গেছে ওটা আস্তে আস্তে দিতে পারি। তবে আল্লাহর ফরয পাওনাটা বাকি রাখার চেয়ে শোধ করে দিয়ে আগামী বছরের যাকাত আস্তে আস্তে দিয়ে দিতে থাকা...। রমাদান আসলে পুরো হিসাব করে নেওয়া, এটাই উত্তম।

প্রশ্ন: ৩৫। আমি কিছু যন্ত্রাংশ কিনেছি এবং একটা ফ্যাক্টরি করছি। এখানে পোশাক উৎপাদন হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমার মেশিনারিজ এবং উৎপাদিত পোশাকের যাকাতটা আমি কীভাবে নির্ণয় করব?

উত্তর: অনেক সময় মানুষ মনে করে লাভের উপর যাকাত দিতে হয়। যাকাত কিন্তু লাভের উপরে নয় বরং মূলধনের উপর দিতে হয়। তবে মূলধনের দুটো অংশ আছে, একজন এককোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা শুরু করছেন। তার দশলাখ টাকা জমিতে গিয়েছে, বিশলাখ টাকার মেশিনারিজ ক্রয় করেছেন। যেটা পণ্য নয়। পন্য উৎপাদনের অংশ। এটার কোনো যাকাত নেই। আর হয়তো সত্তরলক্ষ বা পঞ্চাশলক্ষ টাকা বিভিন্ন কাঁচামাল হয়ে, পণ্য হিসেবে রয়েছে যেটা বিক্রয় করার জন্য রেডি করা হয়েছে, সেটার উপরে যাকাত হবে। যে টাকাটা পণ্য হিসেবে ঘোরাঘুরি করছে, এটা, পুরো পণ্যের উপরেই তাকে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যেটা স্থায়ী

সম্পদে পরিণত হয়েছে, বিক্রয়ের জন্য নয় এটার যাকাত দিতে হবে না। যেমন কারখানা করেছেন, বিল্ডিং বানিয়েছেন, জমি কিনেছেন, মেশিনারিজ কিনেছেন। আবার একটা কোম্পানিতে বিশটা ট্রাক আছে পণ্য সরবরাহের জন্য এর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু একটা শো-রুমে বিক্রয়ের জন্য বিশটা ট্রাক আছে। এই বিশটা ট্রাকের মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে। মূল বিষয় হল বিক্রয় যোগ্য, বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত সকল পণ্যের যাকাত দিতে হবে। আর অবিক্রয়যোগ্য যেটা ব্যবসার বিভিন্ন কাজে লাগছে, যেমন পঞ্চাশটা কম্পিউটার আছে, কাজ করা হচ্ছে। এর যাকাত নেই। কিন্তু বিশটা কম্পিউটার দোকানে রাখা আছে বিক্রয়ের জন্য, এটার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন: ৩৬। আমি একটা নিয়ত করেছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে একটা মেয়ে দেন তাহলে আমি একটা লোককে হজ্জ করাব। আল্লাহ আমাকে একটা মেয়ে দিয়েছেন। আমি এখন কী করতে পারি?

উত্তর: যদি আল্লাহ তাআলা আপনার নিয়ত পূরণ করে থাকেন, মেয়ে সুস্থ থাকে, আপনারা দ্রুত একজন দীনদার মানুষকে, অর্থাৎ যার নামায, রোযা, ঈমান, আকীদা বিশ্বাস, আমল ভালো এমন একজন মানুষকে হজ্জে পাঠিয়ে দেবেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আল্লাহর সাথে এই চুক্তি বা ওয়াদাটা আপনি পূরণ করবেন, ইনশা আল্লাহ।

সিয়াম/রোযা

প্রশ্ন: ৩৭। রমাদানের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি?

উত্তর: রমাদান মুমিনের জীবনে– এমনকি যারা practising নন, নামায-কালাম পড়েন না, দীন পালন করেন না– তাদের ভেতরেও একটা উৎসব নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে আমাদের মডেল হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। সনদগতভাবে দুর্বল একটা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাস থেকেই দুআ করতেন:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'আল্লাহ আমাদের রজব ও শাবান মাসের বরকত দান করুন এবং রমাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন'।[১] হাদীসটা সনদগতভাবে দুর্বল। এটা সাধারণভাবে আমাদের বোঝায় যে, রমাদান অনেক আগে থেকেই মুসলিমদের মনে একটা আবেগ তৈরি করে। সাজসাজ রব পড়ে যায়। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবান মাসে দীর্ঘ রোযা রাখতেন। শাবান মাসের ন্যূনতম এক থেকে পনের তারিখ। আয়িশা ؓ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবানের প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন।[২] এটাও রমাদানের প্রস্তুতি হিসেবে। যেমন, আমরা ফরয

---

১. মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৬৪৯৬; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৩৯৩৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৪৬।

২. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১১৫৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৪৩৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২১৭৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৭৩৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৬৪৯, ১৭১০।

নামায পড়ার আগে ও পরে সুন্নাত নামায পড়ে আমাদের মনটা তৈরি করি। রমাদান আত্মার একটা অনুশীলন। এই অনুশীলনের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। কেউ ঘুম থেকে উঠেই যদি খেলতে যায়, তাহলে তার শরীর সাড়া দেয় না। খেলার আগে কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করতে হয়। আমাদের আত্মারও এরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন। এজন্যই আমরা ফরয নামাযের আগে কিছু সুন্নাত নফল নামায পড়ি। ফরয নামাযের পরে কিছু সুন্নাত-নফল নামায পড়ি। আল্লাহর রাসূল ﷺ রমাদানের প্রস্তুতি হিসেবে শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রেখে এটাকে ইস্তিকবাল করার জন্য আত্মাকে প্রস্তুতি করতেন। পাশাপাশি রমাদানের ফযীলত গুরুত্ব এবং রমাদানের যে ইবাদাতগুলো কুরআন সুন্নাহ নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলো যদি মুমিন অধ্যয়ন করেন তাহলে তার প্রস্তুতি বাড়ে। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবাদতের মান সম্পর্কে বলেছেন, যেটা হাদীসে জিবরাঈল, জিবরাঈল عليه السلام প্রশ্ন করছেন:

يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْإِحْسَانُ؟

ইবাদাতের পরিপূর্ণতা বা সৌন্দর্য কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত এমনভাবে করো, যেন তুমি তাকে দেখছ। কারণ তুমি তাকে না দেখলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন। কাজেই, তুমি এমন হয়ে যাও যেন তুমিই তাকে দেখছো।[৩] এই প্রস্তুতি কখন আসে? একজন মানুষ প্রতিদিন ওযু করে। সালাত আদায় করে। গতানুগতিক বাথরুমে যায়, ওযু করে। কিন্তু সকালে যদি সে ওযুর ফযীলতের দুইটা হাদীস পড়ে যে, ওযু করলে এভাবে গোনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে ওযু করতেন। তখন যখন ওযুর সামনে বসে রাসূলের ওই হাদীসের কথা মনে পড়ে। তখন সে যেন ইবাদত করছে যেন আল্লাহ তার হাত ধোয়াটা দেখছেন। হাত

৩. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৯৯১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৩।

থেকে গোনাহটা পড়ে যাচ্ছে। এভাবে সচেতন হয়ে পড়ে। আর এই সচেতনতায় হল ইহসান। কাজেই মুমিন বান্দা যদি রমাদানের আগে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে রমাদান পালন করতেন, তিনি কোন কোন ইবাদত করতে উৎসাহ দিয়েছেন, এর ফযীলত কী, এটা তিনি যদি একটু অধ্যয়ন করেন তাহলে রমাদানের বরকত পাওয়া সহজ হবে।

প্রশ্ন: ৩৮। রোযা রাখা এবং রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতেই একটা বিতর্ক আছে। রোযা কি আমরা চাঁদ দেখে রাখব, নাকি কোনো দেশের অনুসরণ করব?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ...

তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করো, দলাদলি কোরো না।[৪] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা মারামারি দলাদলিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছি। রমাদান আমাদের সামনে বড় আবেগ নিয়ে আসে। কিন্তু রমাদান আসলে যেন ঝগড়াও বেড়ে যায়। তার কয়েকটা হল, এই নিয়ে। এরপর আছে তারাবীহর ঝগড়া, এরপর আছে ঝগড়ার পর ঝগড়া। পাঠকদের অনুরোধ করব, আমরা যেন এই সঙ্কীর্ণতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করি। সারাবিশ্বে একদিনে রোযা একদিনে ঈদ করতে হবে, (আপাতদৃষ্টিতে) এগুলো শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে যেটা ঘটে সেটা হল, সারা বিশ্বে একদিনে রোযা একদিনে ঈদের কথার আড়াল দিয়ে একই দেশে দুইদিনে তিনদিনে রোযা, দুইদিনে তিনদিনে ঈদ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে বিভক্ত করে ফেলছি। এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা একটা হাদীস শুনি এবং এই হাদীসকেই চূড়ান্ত মনে করি। অন্যান্য হাদীসের দিকে

৪. সূরা [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১০৩।

লক্ষ্য করি না।

যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে রোযা ভেঙে ঈদুল ফিতর করো।[৫]

আমরা মনে করি, দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তে চাঁদ দেখলে আমরা যদি সংবাদ পাই আমাদের রোযা রাখা ফরজ হয়ে যাবে। অনেক মানুষকে দেখেছি, তারা অস্থিরতায় ভোগেন যে, আর্জেন্টিনায় চাঁদ দেখা গিয়েছে, সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গিয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ 'চাঁদ দেখে রোজা রাখো'। আমি এখন রোজা না রাখলে গুনাহ হবে না তো? কিন্তু আসলে ইসলামের নির্দেশনা এই হাদীসটাকে এইভাবে নয়... ইসলামের অনেক নির্দেশনা আছে। যেমন ইসলাম বলছে, যদি কেউ এমন ব্যবহার করে থাকে, একশো ঘাঁ বেত মারো। এখন আমি একজন ব্যভিচারীকে দেখেই বেত মারতে পারি না। কারণ অন্যান্য হাদীস ও কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এটার বিচার কোর্ট করবে।

উমার رضي الله عنه রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতেন। সহীহ বুখারিতে আছে, তিনি বলছেন, আমি নিজে আমীরুল মুমিনীন, প্রধান বিচারপতি, যদি নিজে রাতের বেলায় কাউকে পাপে, অপরাধে, ক্রাইমে রত দেখি তাহলে আমি শাস্তি এক্সিকিউট করতে পারব কি না?! আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, না। আগে তাকে কোর্টে দেবেন। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। আপনি একজন সাক্ষী। আপনি প্রধান বিচারপতি, আমীরুল মুমিনীন হওয়ার কারণে আপনার সাক্ষ্য দুইজনের না। কাজেই আপনার সাক্ষীর সাথে অন্য জনের

৫. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৮১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২১১৭।

সাক্ষী না হলে সে বেঁচে যাবে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কেসের জন্য আপনি দায়ি হয়ে পড়বেন। কাজেই একটা হাদীস দেখেই ওই একটা হাদীসের উপর আমল করলে তো হবে না। অন্যান্য শিক্ষার আলোকে করতে হবে। তে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদীসের পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব কর্মপদ্ধতি অন্য হাদীসে রয়েছে।

কর্মপদ্ধতি হল, রোযা বা ঈদ, চাঁদ দেখলেই করা যায় না। চাঁদ দেখে রাষ্ট্রপ্রধান বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাক্ষ্য দিতে হবে। তিনি যদি হণ করেন, তাহলে রোযা হবে। অর্থাৎ ইসলাম সামাজিক ইবাদতগুলোকে ব্যক্তির উপর রাখে নি। রাষ্ট্রের উপর দিয়েছে। যেন রাষ্ট্র মুসলিম সমাজের ঐক্য সংরক্ষণ করতে পারে। কাজেই অনেক সময় আমরা মনে করি, আমাদের ইসলামি দেশ নয়... আমেরিকা অথবা ইউরোপ– যেকোনো রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র যা-ই হোক না কেন, ইয়াজিদের রাষ্ট্র হোক, আর আকবরের রাষ্ট্র, আর যে রাষ্ট্রই হোক– দ্বীনের ইবাদতগুলো রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হবে। রাষ্ট্র এগুলোর ব্যবস্থাপনা করবে অথবা রাষ্ট্র কাউকে এগুলোর দায়িত্ব দেবে। যেমন অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিমদের কোনো কমিটি, কোনো সমিতি অথবা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত কোনো বোর্ড এটা নিয়ন্ত্রণ করবে। চাঁদ দেখার পরে তাদের প্রতিনিধির কাছে সাক্ষ্য দিতে হবে। তারা যদি সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, ঘোষণা দেন, তাহলেই তখন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি নিজে চাঁদ দেখেছেন। নিজে এই দুচোখ দিয়ে দেখেছেন। সে সাক্ষ্য দিয়েছে, সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নি। কারণ আর কেউ সাক্ষ্য দেয় নি। সে ঈদ করতে পারবে না, রোযা রাখতে পারবে না। সে দেখেছে কিন্তু। এর পাশাপাশি অন্য একটা হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন:

الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ.

عَرَفَة يَوْم يعرف الإِمَام والأضحى يَوْم يُضحي الإِمَام و (الْفطر) يَوْم يفْطر الإِمَام.

যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান এবং জনগণ ঈদ করবে সেদিনই ঈদ। যেদিন রোজা রাখবে সেদিনই রোজা। যেদিন কুরবানি করবে সেদিনই কুরবানি। যেদিন হজ্জের আরাফাতে থাকবে সেদিনই আরাফাত।[৬] অতএব তুমি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। রাষ্ট্র এবং সমাজকে নিয়ে করতে হবে। এখানে আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে, গ্রুপ গ্রুপ করে, ভিন্ন ভিন্ন দিনে, এটা হারাম!

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করা, সমাজের ঐক্য রক্ষা করা ফরজ। আর এটাকে বিভক্ত করা হারাম। আর সবচেয়ে বড়কথা রাষ্ট্রের ঘোষণার বাইরে ঈদ পালন করাই বৈধ নয়। রোযা পালন করা বৈধ নয়। এরপর আরো কথা আছে, আমরা হয়তো মনে করি রাষ্ট্র হয়তো ঠিক করে ঘোষণা দেবে না। ভুল করে দিলে আমার কী হবে! তিরমিযি শরীফের হাদীস, আয়িশা ﷺ এর কাছে একজন এসেছেন। মাসরুক নামে একজন তাবিয়ি। সময়টা উমাইয়া যুগ। মানে ইয়াজিদের বংশের যুগ। রাষ্ট্র পরিচালনায় ফাসিক মানুষেরা রয়েছেন। মাসরুক এসেছে ৯ই জিলহজ্জ। অর্থাৎ আরাফাতের দিন। তিনি রোযায় ছিলেন না। আয়িশা ﷺ বললেন তাকে ছাতু দাও, সে ছাতু খাক। তাকে মেহমানদারি করো। মাসহুর আরাফাতের দিন রোযা না রাখার কারণে লজ্জা পেলেন! তিনি নিজের ওযর পেশ করলেন যে, আজকে আরাফাতের দিন রোযা রাখার দরকার ছিল! কিন্তু এই ফাসিক সরকার চাঁদ দেখার ঘোষণা ঠিকমতো দিয়েছেন কি না বুঝতে পারছি না। আজকে হয়তো দশতারিখ। অর্থাৎ ঈদের দিন। আর ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। এ সন্দেহের কারণে আমি আজকে রোযাটা রাখি নি। আয়িশা ﷺ তাঁকে বকা দিলেন, তোমাকে এই চিন্তা করতে হবে না। وَالْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ الْإِمَامُ যেদিন আরাফাতে রাষ্ট্রপ্রধান হজ্জে নিয়ে গিয়েছেন ওই দিনই হজ্জ। কোন দিন চাঁদ দেখা গিয়েছে, ভুল হয়েছে না ঠিক হয়েছে এটা তোমার দরকার নেই।[৭] ইমাম শাফিয়ি

৬. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮০২; ইবনুল মুলাক্কিন, আল বাদরুল মুনীর ৬/২৪৬।
৭. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৭৩১০।

রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বইতে লেখেছেন, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি ইচ্ছা করে ভুল করে, ভুল তারিখ ঘোষণা দেয়, তাহলে রাষ্ট্র দায়ি হবে। জনগণের রোযা, ঈদ, কুরবানি, হজ্জের কোনো ক্ষতি হবে না। এজন্য এর পাশাপাশি একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল, একদিনে সারাবিশ্বে ঈদ করার ব্যাপারটা। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো করেন নি। ইসলাম জীবনঘনিষ্ঠ ধর্ম যা জঙ্গলের মানুষ, নিউইয়র্ক সিটির মানুষ– সবাই সহজভাবে পালন করতে পারবে। সকলেই যেন সহজভাবে পালন করতে পারে এভাবেই বিধান দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে রমাদানের চাঁদ দেখে সারা মুসলিম বিশ্বে, অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে মদীনা থেকে মক্কা, নাজরান, বাহরাইন তাবুকে লোক পাঠিয়েছেন যে, এই দিনে চাঁদ দেখা গেছে, সুতরাং তোমরা এই দিনে ঈদুল ফিতর করবে...! এরকম কোনো ঘোষণা দেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছা করলে মদীনায় চাঁদ দেখে এই দশদিনের মধ্যে (কুরবানির ঈদে) বাহরাইন থেকে ইয়ামান থেকে তাবুক, তাবুক থেকে খাইবার পর্যন্ত জানিয়ে দিতে পারতেন। তিনি কখনোই এ চেষ্টা করেন নি। সাহাবিদের যুগে একাধিক দিনে ঈদ হয়েছে। সাহাবিদের যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের ৩০-৪০ বছর পরে– মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে– মুআবিয়া رضي الله عنه সিরিয়ায় যে দিন ঈদ করেন মদীনায় তার পরদিন ঈদ হয়। সাহাবিরা এটা জানতেন, এটাকে খারাপ মনে করেন নি। বরং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেছেন:

هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এভাবেই বলেছেন।[৮] কাজেই যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিরা গ্রহণ করেছেন সেটা নিয়ে আমাদের এত সমস্যা কেন?

---

৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৮৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৩৩২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬৯৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২১১১।

আমরা কি তাদের চেয়েও মুত্তাকি হয়ে গেলাম যে, আমরা বলছি আমাদের শবে কদর নষ্ট হচ্ছে, শবে বরাত নষ্ট হচ্ছে। সারা বিশ্বের মুসলিম এক হলে ভালো হত, আমরা এক হব তো মনে-চেতনায়। এক হওয়ার নামে কি একই দেশের মুসলিম মারামারি করব? এজন্য পাঠকদের বলব যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন যেদিন ঘোষণা দিবেন সেই দিনই আমরা পালন করব। আল্লাহ তাআলা বোঝার তাওফীক দান করুক, আমীন।

প্রশ্ন: ৩৯। রমাদান মাসেও দেখা যায় অনেক মুসলিম রোযা পালন করেন না। এই গাফিলতি অনেকের মধ্যেই আছে। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কী পরিণাম রয়েছে বা কী বিপদের সংবাদ রয়েছে?

উত্তর: মজার ব্যাপার হল, রোযা নামাযের চেয়ে অনেক কঠিন হলেও রোযা পালনকারীর সংখ্যা নামাযির চেয়ে বেশি। রোযার ভেতরে যে মজা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এটা রোযা না রাখলে বোঝা যায় না। আমাদের অমুসলিম বন্ধুরা অনেক সময় কল্পনাই করতে পারেন না যে একজন মানুষ ১৫ ঘণ্টা বা ১৮ ঘণ্টা পানাহার না করে থাকতে পারে! আর মজার ব্যাপার হল, পানাহার না করে কিন্তু তিনি অকর্মণ্য হয়ে পড়েন নি। তিনি স্বাভাবিক কাজ করে যাচ্ছেন। এটা একটা জীবন্ত অলৌকিকতা! আমরা ইচ্ছে করলেও কিন্তু পারি না। কিন্তু রোযা রাখলে পারি এবং ভালোই লাগে। একটু হয়তো পিপাসা লাগে। কিন্তু আমাদের আত্মা যে প্রশান্তি পায়, যে মজা পায়, মনের ভেতরে যে শান্তি ঘোরাঘুরি করে এটা অতুলনীয়। কাজেই যারা রোযা রাখেন না, তারা অনেক সময় এটাকে কষ্ট মনে করে। আসলে কষ্ট না। আপনি সাহারি খান। আল্লাহর দিকে মন রেখে যে, আপনার সারাদিন রোযা থাকাটা আল্লাহ জিকির, আল্লাহর স্মরণ। মুমিন যখন মায়ের কথা মনে করে– মা দূরে থাকে, বেঁচে থাক আর মরে যাক– মজা লাগে কিন্তু। ঠিক রোযাটা এমন একটা জিনিস, রোযা শুরু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো না কোনভাবে আল্লাহর কথা মনে হচ্ছে,

মুমিনের হৃদয় আলাদা একটা উজ্জীবন, একটা আলাদা মজা পাচ্ছে। এজন্য রোযা মুমিনদের জন্য আনন্দের বিষয়। রোযা না রাখা একটা ভয়ঙ্কর মহাপাপ।

পাপ বলতে আমরা কী বুঝলাম? অনেকে মনে করেন আল্লাহর হুকুম মানলাম না, আল্লাহ গুনাহ দেবেন কেন?! আসলে আল্লাহর হুকুম না মানলে আমার ক্ষতি, পাপ মানে আল্লাহর ক্ষতি নয়। আমি আমার ক্ষতি করলাম এজন্য আমার পাপ হল। যেমন ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন দিলেন। ওষুধ না খেলে ডাক্তার সাহেবের কোনো সমস্যা নেই। আমার ক্ষতি। রোযা না রাখার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি বা গোনাহ আমাদের জীবনে আসবে। তাকওয়া থেকে দূরে চলে যাব। আমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হব এবং রমাদানের মধ্যে থেকে আমরা যে বরকতটা পেতাম এটা থেকে বঞ্চিত হব। এজন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, আমরা রোযা রাখি। পাঠকদের যারা রোযা রাখেন তাদেরকে অনুরোধ করব, যারা রোযা রাখেন না তাদেরকে ঘৃণা না করে, সুন্দর করে আবেগ দিয়ে রোযার গুরুত্ব বুঝিয়ে আমরা রোযাদার বানানোর চেষ্টা করব। আমাদের একটা দোষ আছে, আমরা বলি যারা নামায পড়ে না, তারা খুব খারাপ মানুষ। আরো বলি, ও রোযা রাখে না, ও বেয়াদব মুসলমান। আল্লাহ তো আমাদের পরের সমালোচনার জন্য বানান নি। ও রোযা রাখে নি, এটা আমার জন্য সুযোগ। এজন্য আমাদের উচিত, তাকে রোযাদার বানানোর জন্য চেষ্টা করা।

প্রশ্ন: ৪০। মাহে রমাদানে আমরা সার্বক্ষণিক ইবাদত বন্দেগি করতে পারি। রমাদানে আমাদের সময়টা কাটানোর জন্য কী করতে পারি?

উত্তর: রোযাকে অনেকে নেতিবাচকভাবে নেন। পানাহার থেকে বেঁচে, চুপ করে ঘুমিয়ে থেকে অথবা চুপ করে শুয়ে শুয়ে টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে থেকে রোযা করে ফেলেন। আসলে রোযা দুটো-একটা জিনিস বর্জন করা নয়। এটা অর্জন করার জিনিস। শুধু পানাহার বা

স্ত্রীর সম্পর্ক বর্জন নয়। অন্যান্য সকল হারামের পাশাপাশি এগুলো বর্জন। আর অর্জন বলতে, সকল প্রকার নেক আমল আমাদের করা দরকার। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু নেক আমল বিশেষভাবে করতেন, তার একটা হল, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দান সদকা।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। রমাদানে তাঁর দানশীলতার সীমা থাকত না, বাতাসের মতো সবার ঘরে ঢুকে যেত।[৯] কাজেই আমরা মুসলিমরাও রমাদানে চেষ্টা করব। আমরা রমাদানকে অনেক সময় খাওয়ার মাস বানিয়ে ফেলি। বেশি খাই। আমরা কিছু খাব, পাশাপাশি আশেপাশে পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু, দরিদ্র সবার কাছে যেন আমাদের দান, সদাকা, হাদিয়া পৌঁছে যায়..., এটা একটা ইবাদত। আরেকটা ইবাদত যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাদানের জন্য বিশেষ করেছেন, সেটা হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত। এটা আমরা সবসময় চেষ্টা করব। না হলে শুনব কিংবা তরজমা পড়ব। কুরআন দিয়ে হৃদয়কে উজ্জীবিত করব।

প্রশ্ন: ৪১। রোযার মাসে কোনো ব্যক্তি রোযা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করলে অথবা কানে ওষুধ, চোখে ড্রপ দিলে উনার রোযার কোনো ক্ষতি হবে কী না?

উত্তর: কানে ওষুধ দিলে, ড্রপ দিলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। এমনকি ওষুধের স্বাদ যদি গলায় যায় তাতেও রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। এখন কথা হল, ইনহেলার। দুটো বিষয়। রোযা ভাঙে কিসে? খাদ্য এবং পানিও দেহের স্টোমাকে গেলে, পাকস্থলীতে খাদ্য গেলে

৯. সহীহ বুখারি, হাদীস-৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২০৯৫।

রোযা ভাঙে। অনেকে মনে করেন ব্রেনে চলে যায়। দেহের ভেতরে যায়। আমরা যখন গোসল করি। পানি ব্রেনে যায়। পানির কণাগুলো দেহের ভেতরে যায়। রোযা রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবিগণ– অনেকে গায়ে পানি ঢেলেছেন। পানিতে ডুবে থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে রোযা থেকে শরীরে ফুঁটো করে রক্ত বের করেছেন। যখন কেউ ফুটো করে ওষুধ দেয়, রক্তের ভেতরে চলে যায়। কাজেই যেটাতে রোযা ভাঙবে না, আমরা জোর করে কেন ভাঙাব? এখানেই তো ইসলামের সীমালঙ্ঘন, অতিরঞ্জন। পানাহারের বিধানে যেটা সেটাতে শুধু রোযা ভাঙবে। এইজন্য নাকে, কানের ড্রপে কোনো রোযা ভাঙবে না। কিন্তু গলা দিয়ে যেটা যাচ্ছে, সেটা যদি পাকস্থলীতে যায় অবশ্যই রোযা ভাঙবে। যদি ফুসফুসে যায় রোযা ভাঙবে না। ইনহেলার সাধারণত শ্বাসের সাথে নেওয়া হয়। ফুসফুসে যায়।

এজন্য আরব জগতের সকল ফকীহ বলছেন, ইনহেলারে রোযা ভাঙে না। কিন্তু আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশের কোনো কোনো আলিম গবেষণা করে দেখাচ্ছেন, কোনো কোনো ইনহেলারের ভেতরে লিকুইড থাকে, পানি থাকে। সেটা ফুসফুসে যায় না। পাকস্থলীতে যায়। এই ধরণের ইনহেলারে রোযা ভাঙবে বলে তারা বলছেন। এক্ষেত্রে আমাদের কথা হল, কারো যদি শ্বাসকষ্ট থাকে অবশ্যই রোযা রাখবেন। ইনহেলার সবসময় নেওয়া লাগে না। যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে অবশ্যই ইনহেলার নেবেন। না নিয়ে জীবন বিপন্ন করা যাবে না।

ইনহেলার নেওয়ার পরে এই রোযা কাযা করতে হবে কী না?! এটা নিয়ে উলামাদের কিছু মতভেদ আছে। আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশের অনেক আলিম বলেছেন, কোনো কোনো ইনহেলারে যেহেতু পানি আছে। পাকস্থলীতে যায়। কাজেই রোযা ভেঙে যাবে। ওটাকে কাযা করতে হবে। আরব দেশের উলামায়ে কেরাম বলছেন, নাহ। ইনহেলার মূলত ওষুধ, এটা ফুসফুসে যায়। তাই এটার আর

কাযা লাগবে না।

প্রশ্ন: ৪২। একভাই প্রশ্ন করেছেন। রোযা রেখে রক্ত দেওয়া রক্ত নেওয়া, কিডনি ডায়ালাইসিস করা। এই জাতীয় কাজ করা যায় কি না?

উত্তর: রোযা রেখে রক্ত দেওয়া নেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। বিগত প্রশ্নে বলেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই রোযা রেখে রক্ত বের করেছেন।

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ.[১০]

সিঙ্গা লাগানো বলতে... প্রাচীন যুগে এটাই ছিল বড় চিকিৎসা। আকুপাংচার বা বেদেদের যে সিঙ্গা লাগানো ওই ধরণের। শরীর ফুটো করে শরীরের নির্দিষ্ট শিরা থেকে রক্ত বের করা। চুমুক দিয়ে বিষাক্ত রক্তটা বের করা। যেটা শরীরের জন্য অসুবিধা তৈরি করে। তাহলে বোঝা গেল, শরীর কাটায় রোযা ভাঙে না। শরীর থেকে রক্ত বেরলে রোযা ভাঙে না। ঠিক তেমনিভাবে শরীরের ভেতর থেকে রক্ত বের করতে গিয়ে ওই শিঙ্গাটা গেল কিংবা কিছু ঔষধ গেল। তাহলে শরীরের ভেতরে রক্তের মাধ্যমে কিছু গেলে বা রক্তে গেলেও যে রোযা ভাঙে না। এ হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল। এজন্য রোযা অবস্থায় রক্ত দেওয়া, রক্ত নেওয়া, শরীরে ওষুধ লাগানো, ইনজেকশন দেওয়া। এগুলোর কোনো কিছুতেই রোযা ভাঙে না।

অনেকের ধারণা রক্ত দিতে গেলে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে যায়, একব্যাগ মানে অনেক বেশি রক্ত, সেক্ষেত্রে আবার ভেঙে যায় কি না?! এটা ভাঙবে না। তবে এমন রক্ত দেওয়া, যে কারণে রোযা ভেঙে ফেলতে হবে, এটা দেওয়া উচিত নয়। মাকরুহ হবে। এমন সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। রোযা রেখে যদি আমরা রক্তটা দিই তাহলে হয়তো

---

১০. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯৩৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৩৭২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৭৭৬।

আমি শেষপর্যন্ত রোযাটা রাখতে পারব না। সেক্ষেত্রে দেওয়া উচিত নয়। তবে, এমন হয় মরণাপন্ন রোগীর রক্ত দিতে হবে; আমি রক্ত দিয়ে রোযাটা পুরণের চেষ্টা করব। কিন্তু রোযার অযুহাতে রক্ত দেওয়া বন্ধ করব না। মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। এজন্য আমরা রক্ত দেব। যদি সম্ভব হয় রোযার পরে রক্ত দেওয়া, এটা ভালো। নইলে রক্ত দেব, এমন পরিমাণ দেব যাতে রোযাটা আমি রাখতে পারি। কিডনি ডায়ালাইসিসটারও একই ব্যাপার। কিডনি ডায়ালাইসিসের জন্য রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। এটা কোনো পানাহারও নয়। এটা কিডনির পানি বের করা বা দেওয়া। এটা কোনো পানাহার না।

হজ্জ

প্রশ্ন: ৪৩। কোন ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয?

উত্তর: এক্ষেত্রে আমাদের কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। অনেকেই হজ্জ এবং যাকাতকে এক করে ফেলেন। হজ্জ এবং যাকাত কিন্তু এক নয়। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের উপর দায়িত্ব হল হজ আদায় করা, যে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।[১] এখানে ক্ষমতা বলতে দৈহিক এবং আর্থিক। কাজেই দূরত্ব অনুসারে বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফে গিয়ে থাকতে তিন থেকে চারলাখ লাগে। কারো যদি নিত্য প্রয়োজনের বাইরে টাকা থাকে তাহলে তার জন্য হজ্জ ফরয। এটা কেমন? যেমন মনে করেন সরকার নতুন বেতন স্কেল দিয়েছে। একজন চার থেকে পাঁচলাখ টাকা পেয়ে গেল। এই টাকাটা তার জীবনযাত্রার জন্য দরকার নেই। সে জমি কিনে ফেলল অথবা ফ্ল্যাট কিনে ফেলল। তার কিন্তু হজ্জ ফরয হয়ে গেছে টাকা পাওয়ার সাথে সাথে। জমি কেনার কারণে তার হজ্জের ফরয কিন্তু কেটে যায় নি। কারণ মক্কা শরীফে যাওয়ার ক্ষমতা তার এসে গেছে। আসার পরে সেটা নষ্ট করে ফেলেছে। এ জন্য কিন্তু ফরযিয়্যাত চলে যায় নি। হয়তো আমি ব্যবসায় লাভ করেছি অথবা আমার ব্যাংকে

১. সূরা [৩] আল ইমরান, আয়াত: ৯৭।

তিনলাখ, পাঁচলাখ টাকা আছে, যেটা আমার জীবনযাত্রায় লাগছে না। আমার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে। অনেকে এরকম করে যে, শরীআতের ওই দায়িত্ব যেন আমার উপর না আসে, এজন্য আবার পরিকল্পিতভাবে এগুলোকে ব্যয় করে ফেলে। এরকম করলে যাকাত মাফ হবে, কিন্তু হজ্জ মাফ হবে না। এমনকি যদি কারো কিছু জমি আছে, যে জমির ফসল তার লাগে না। তার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন নেই, বা কয়েকটা এক্সট্রা বাড়ি আছে, যে বাড়িতে থাকার বা ভাড়া আছে তার জীবনযাত্রায় লাগে না, সেই অতিরিক্ত জমি বা বাড়ি বিক্রয় করে তার জন্য হজ্জে যাওয়া ফরয। একজন মানুষ দুইলাখ, দশলাখ, বিশলাখ টাকা পেয়েছে, সে সেটা দিয়ে এক জায়গায় জমি কিনে ফেলল, কিংবা বাড়ি করে ফেলল। তার যাকাত থাকে না। কিন্তু তার হজ্জ থেকে যায়। তার এই জমি কেনার প্রয়োজন ছিল না। তার বাড়ি বানাবার প্রয়োজন ছিল না। তার বাড়ি আছে। সে অন্যকোনো প্রয়োজনে বাড়িটা বানাল, তার কিন্তু হজ্জ ফরয আছে। কারণ সে এমন কিছু টাকার মালিক হয়েছে, যার মাধ্যমে বাসা থেকে মক্কা পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা তার এসে গেছে। আসার পরে টাকাটা সে নষ্ট করেছে। এজন্য দায়িত্ব কিন্তু চলে যায় নি।

এজন্য হজ্জ ফরয হবে ওই ব্যক্তির উপরে যার মক্কা শরীফ যাওয়ার টাকা আছে। এই টাকার মালিক হবার পরে সে যদি খরচ করেও ফেলে। তারপর থেকেই যাবে। সেটা অতিরিক্ত জমির টাকা হোক, ব্যবসায় লাভ হয়েছে কিংবা এমন ফসল হয়েছে যা সারাবছর চলেও পাঁচলাখ টাকায় বিক্রি করতে পেরেছে, সেটা দিয়ে আমি একটা জমি কিনে ফেলেছি কিন্তু হজ্জ করি নি। যদি কারোর আবার আর্থিক সঙ্গতি থাকে দৈহিক সুস্থতা এখন নেই, তাহলে তিনি বদলি হজ্জ করাবেন।

প্রশ্ন: ৪৪। একবোন প্রশ্ন করেছেন, মহিলাদের উপর হজ্জ কখন ফরয হয়। স্বামীর নিকট দুজনের খরচের সমপরিমাণ অর্থ থাকলে?

উত্তর: হজ্জ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের মূল নির্দেশনা হল:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.

বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার সাধ্য।[২] অর্থনৈতিক সাধ্য, পাশাপাশি শারীরিক সাধ্য। অর্থনৈতিকভাবে ইসলামের মূলনীতি হল যে, নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। যার যার সম্পদ তার। আয় ব্যায় হিসাব তার। কাজেই স্বামীর অর্থের কারণে স্ত্রীর উপরে হজ্জ ফরয হয় না। স্ত্রীর সম্পত্তি অর্থের কারণেই হজ্জ ফরয হয়। অনেক সময় স্ত্রী মোহর পাওয়া মাত্রই হজ্জ ফরয হয়ে যেতে পারে। কারণ সে মোহর পেয়েছে। তার কোনো ব্যয় নেই। আজকাল অনেকেই তিনলাখ, পাঁচলাখ [টাকা] পর্যন্ত মোহর পাচ্ছেন। মোহর পাচ্ছেন মানে, মোহর নির্ধারিত হয়েছে। হয়েছে অর্থ, তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গিয়েছে। এজন্য মূলত হজ্জ ফরয হয় ব্যক্তির। স্বামী বা স্ত্রী নয়। স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। ঠিক তেমনি স্বামীর সম্পত্তির কারণে স্ত্রী উপরে হজ্জ ফরয হয় না। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই। স্বামী স্ত্রীর সকল খরচ বহন করবে, যেগুলো স্বাভাবিক। কিন্তু হজ্জের দায়িত্ব স্বামীর নেওয়া ফরয নয়। স্বামী যদি নিজের টাকা দিয়ে স্ত্রীকে হজ্জ করায়, স্ত্রীর জন্য হজ্জ ফরযটা আদায় হবে। এবং এটা স্বামীর পক্ষ থেকে সুন্দর উপহার হবে। কাজেই স্বামীর কাছে যদি দুজনের হজ্জের টাকা হয় অবশ্যই স্বামীর উচিত দুজনের একসাথে হজ্জে যাওয়া।

বিশেষ করে আপনাদেরকে বলছি যারা হজ্জে যান নি; ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন পারিবারিক জীবনকে আর হজ্জ একটা পারিবারিক ইবাদত। একটা হজ্জে গেলে কখনোই পূর্ণতাবোধ করবেন না। ছোট্ট বাচ্চা, সন্তান, স্ত্রী, আব্বা-আম্মা সবাইকে নিয়ে হজ্জ করার যে আনন্দ, যে স্প্রিচুয়াল পূর্ণতা এটা একা হজ্জে কখনোই বোঝা যায় না। কেউ একা হজ্জ করলে হজ্জের ভেতরেই অনুভব করবেন আগামীবার ছেলে মেয়ে বা ওয়াইফকে নিয়ে আসব। শূন্যতা অনুভব হয়। ইসলামের

২. সূরা [৩] আল ইমরান, আয়াত: ৯৭।

সব ইবাদতই পরিবারকে নিয়ে। ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে পারিবারিক সম্প্রিতিকে। নফল ইবাদতের চেয়ে স্বামী-স্ত্রী সন্তানদের সাথে আনন্দ হাসির সম্পর্ক বড় ইবাদত। বিশেষ করে হজ্জটা কিন্তু পারিবারিক ইবাদত। হজ্জে একা গেলে হজ্জের পূর্ণতা আসে না।

অনেক বিত্তবান ভাইবোনদের দেখি পৃথিবীর অনেক দেশেই তারা ঘুরতে যান অনেক টাকা ব্যায় করে। এই ক্ষেত্রে আমাদের মুসলিম ভাইদের আমরা পরামর্শ দিতে পারি না যে, মক্কা মদীনা যাওয়ার জন্য।

প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত হল একা কোথাও না যাওয়া। স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া। আমরা অনেক সময় একা যায়। অথবা স্ত্রী এক ধরনের বিনোদন করে স্বামী আরেক ধরনের। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেকোনো সফরে গেলে স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন। দ্বিতীয়ত, সফর-বিনোদনের জন্য মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফের চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা একটা দেশেই পাহাড় দিয়েছেন, সমুদ্র দিয়েছেন, বাইতুল্লাহ দিয়েছেন, মসজিদে নববি দিয়েছেন। যেখানে আত্মার আনন্দ আছে, রুহের খোরাক আছে, চোখের আনন্দ আছে, বেড়ানো আছে। কাজেই আমাদের উচিত, বিত্তশালীদের সন্তানদেরকে নিয়ে, স্ত্রী-পরিবারকে নিয়ে বছরে অন্তত একবার হজ্জে না হলেও উমরাহ; কিছুদিনের জন্য মক্কা শরীফে কাটানো। মক্কা শরীফের চত্তরে খেলাধুলা করা, মসজিদে নববি চত্তরে খেলাধুলা করা। বাচ্চাদের জন্য অনেক অনেক বেশি আনন্দের।

প্রশ্ন: ৪৫। কেউ যদি নিজের হজ্জ না করে তাহলে কি সে বদলি হজ্জ করতে পারবে?

উত্তর: বদলি হজ্জ করার আগে নিজের হজ্জ করতে হবে, এটা হাদীস শরীফে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তালবিয়া পড়তে শোনেন, 'লাব্বাইকা আন শুবরুমা'। আমি শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, শুবরুমা

কে? সে বলল, আমার একভাই এবং আমি তার জন্য বদলি হজ্জ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? উনি বললেন, না, আমি তা করি নি। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজের হজ্জ আগে করো, এর পারে বদলি হজ্জ করো।৩ এই হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ফকীহ বলছেন, নিজের হজ্জ না করে বদলি হজ্জ করাটা বৈধ হবে না। এটা অন্যায় হবে। হজ্জ হবে না। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, হজ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরুহ হবে। গুনাহ হবে। অর্থাৎ যেটা গোনাহ হবে সেটা আমাদের দরকার কী? সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিচ্ছেন, নিজের হজ্জ করার পরে বদলি হজ করো। এজন্য যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করেন নি, তিনি বদলি হজ্জ করবেন না। এটা হাদীসের নির্দেশনা এবং এটা উল্টানোর আমাদের প্রয়োজন নেই। আর যারা বদলি হজ্জ করাবেন তাদেরও বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি নিজে করেন নি তাকে দিয়ে আমি কেন বদলি হজ্ব করাব? রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু আগে নিজের হজ্জ করতে বলেছেন...! আর যদি কেউ নিজের বাবা-দাদার বদলি হজ্জ করতে চান, আগে নিজের ফরযটা আদায় করি এরপর সুযোগ পেলে...! এখানে মূলত দুটো কারণ, নিজের হজ্জ আদায় করার দায়ভার নিজের সবচেয়ে বেশি। অনেকের উপর হজ্জ ফরয নয়, তারপরও তিনি নিজের হজ্জ না করে পরের হজ্জ করবেন না। কারণ তার নিজের হজ্জ আদায় করা না হলেও আগ্রহ-উদ্দীপনা বেশি থাকা উচিত। দ্বিতীয় বিষয় হল, যে ব্যক্তি একবার হজ্জ করেছেন তার জন্য আর দ্বিতীয়বার হজ্জ অধিকতর পূর্ণতার সাথে করা সহজ। যারা হজ্জ করেছেন তারা সবাই জানেন, হজ্জ একটা প্র্যাক্টিকাল ইবাদত। যতই বই পড়ে যাওয়া হোক, প্রথমবারের হজ্জে অনেক ভুল থেকে যায়। এজন্য দ্বিতীয়বার গেলে আরো সুন্দর করে আরো পূর্ণাঙ্গ করে হজ্জ করা সম্ভব।

প্রশ্ন: ৪৬। একজন মহিলা, যদি তার মাহারাম ছাড়া হজ্জ কাফেলার মধ্যে মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে মিশে হজ্জ করতে চান, তাহলে উনার

৩. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৮১১।

হজ্জ হবে কি না?

উত্তর: হাদীসের আলোকে এটা হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মহিলাকে এইভাবে অনুমতি দেন নি। একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গিয়ে বলেছেন, আমার স্ত্রী হজ্জে যাবে এবং আমি জিহাদে যাব আপনার সঙ্গে। (তিনি বলেছেন,) তুমি জিহাদ বাতিল করো, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে যাও। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুমিন নারীর জন্য বৈধ নয়, তিনি মাহরাম ছাড়া সফর করবেন একদিন রাত কিংবা তিনদিন তিনরাতের দূরত্বে। এই হাদীসগুলো খুবই স্পষ্ট। এখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই। সফর, কি হজ্জের সফর, মাহরাম ছাড়া বৈধ নয়। আমরা কেন যাব? আল্লাহ যেহেতু আমাকে বিধান দিলেন, তোমার মাহরাম নেই তোমার জন্য হজ্জের দায়িত্ব নেই। আমি কেন গায়ে পড়ে যাব? প্রাচীন ফকীহদের কেউ কেউ বলেছেন, যদি মহিলাদের কাফেলা থাকে তাহলে যেতে পারে। এটা ফকীহদের মত, সুন্নাহ বা হাদীস সমর্থিত নয়।

এখন প্রবলেম হয়েছে দুটো। একটা মানুষের আবেগ, আরেকটা হল হজ্জ এজেন্সিগুলোর স্বার্থ। এ দুটো মিলিয়ে... একজন মহিলার মক্কা যাবার আবেগ হয়ে গেছে। আমি বললাম অপেক্ষা করেন আপনার স্বামী অথবা ছেলের সাথে যাবেন। কিন্তু তিনি এত আবেগ রাখতে পারছেন না, দুবছর দেরি করতে পারছেন না। এটা কিন্তু দীন নয়। এটা আবেগ। আরেকটা হল, বিভিন্ন হজ্জ কোম্পানি যারা চায়, হাজি বাড়ুক। তাদের লাভ হোক। এজন্য তারা বিভিন্নভাবে এই ফতোয়াটা প্রচলনের চেষ্টা করেন। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মাহরাম ছাড়া যেয়ো না। না গেলে আমার গুনাহ হচ্ছে না। আর গেলে গুনাহ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আমি কেন যাব?

প্রশ্ন: ৪৭। ইহরাম বাধার সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি কী?

উত্তর: ইহরাম বাধার সুন্নাত পদ্ধতি হল, ইহরামের আগে গোসল

করা। কোনো মহিলার যদি গোসলের দরকার নাও হয়, তার সালাতই নেই তারও গোসল করা মুস্তাহাব, সুন্নত। পরিচ্ছন্নতার জন্য আর কি। নিজের অন্যান্য পরিচ্ছন্নতাগুলো অর্জন করা। এরপর ইহরামের কাপড়গুলো পরে নেয়া। ইহরামের কাপড়গুলো পরার পরে, ইহরামের নিয়ত করার আগে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আতর মাখতেন, যেহেতু দীর্ঘ সময় আতর মাখতে পারবেন না। আর উনি যেহেতু আতর পছন্দ করতেন এজন্য আগেই আতর মেখে নিতেন। এরপরে ইহরাম করা। আমাদের দেশসহ সারাবিশ্বে একটি প্রচলন আছে, ইহরামের জন্য দুইরাকআত সালাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ ইহরামের জন্য সালাত পড়েছেন, এরকম নেই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের নামায জামাআতে আদায় করার পরে ইহরাম বাঁধেন। এজন্য জামাআতের সালাতের পারে আমরা ইহরাম বাঁধতে পারি অথবা আমরা ওযুর কারণে তাহিয়্যাতুল ওযুর সালাত আদায় করে ইহরাম বাঁধতে পারি। কিন্তু ইহরামের জন্য খাস কোনো সালাত হাদীসে নেই। অর্থাৎ আমরা ইহরামের কাপড় পরে, এর আগে ওযু গোসল পরিচ্ছন্নতা পরিপূর্ণভাবে অর্জন করে সাধারণ পোশাক খুলে ইহরামের পোশাকগুলো পরে, এরপরে সুযোগ থাকলে আতর মাখব। আতর মারতে হবে দেহে, কাপড়ে আতর মাখা কিন্তু নিষেধ। কাপড়ে কোনো আতর লাগবে না। গায়ে, চুলে, মাথায় আতর মাখা যেতে পারে। এরপরে আমরা ইহরাম করব।

প্রশ্ন: ৪৮। ইহরাম অবস্থায় যদি কেউ কাপড়ে আতর ব্যবহার করে তাহলে কী হবে?

উত্তর: তাহলে কাফফারা দেবে। ইহরামের নিষিদ্ধকারী বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল সুগন্ধি ব্যবহার করা।

প্রশ্ন: ৪৯। হজ্জের সফরে আরাফার ময়দানে হাজি সাহেবদের অবস্থানরত সময়ে তারা কি মুসাফির থাকেন?

উত্তর: এক্ষেত্রে ফুকাহাদের নানাবিধ মত রয়েছে। বর্তমানে অনেকেই মনে করেন, আরাফা মুজদালিফা মক্কার অংশ। কাজেই মক্কায় যারা মুকীম তারা আরাফা মুজদালিফায় মুকীম। চিন্তাটা ঠিক নয়। মক্কায় মুকীম হলেই আরাফাতের যদি আমরা মুকীম হয়ে যাই... অনেক সময় হজ্জ ফ্লাইট আগে গিয়েছে, মক্কায় ১৫ দিন অবস্থান করে ফেলেছে, মক্কা আরাফা মুজদালিফাসহ ১৫ দিন হয়ে গেছে, অনেকেই মনে করেন আমরা মুকীম হয়ে গেছি। চিন্তাটা ঠিক নয়। মক্কার অবস্থান গুণতে হবে কিন্তু হজ্জের মুভমেন্ট এর সঙ্গেসঙ্গে আমরা মুসাফির হয়ে যাব। আমরা জুমআর নামায কিন্তু আরাফা মুজদালিফায় পড়ি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের মাঠে শুক্রবারে বিদায় হজ্জে ছিলেন যুহর আসর একসাথে পড়েছেন জুমুআ পড়েন নি। আরাফাত যদি মক্কার অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে তো সেখানে জুমুআ পড়া ফরয হত। কারণ মক্কাতে জুমুআ পড়া ফরয। আমরা আরাফাতের শুক্রবারে অবস্থান করলেও জুমুআ পড়ি না। আরাফাতে ঈদ করি না আমরা। হাজিরা হজ্জের মানাসেক শুরু করলে তাদের বিশেষ হুকুম হল, তিনি যেখানকারই হোন না কেন, যখন মক্কা থেকে হজ্জে রওয়ানা দিচ্ছেন, তিনি মুসাফির অবস্থায় থাকবেন। এটাই হল কুরআন এবং হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আমল, সাহাবিদের আমল। মিনা মুজদালিফা আরাফার অবস্থানকালটা সফর। আবার মক্কায় আসার পর আমরা দেখব, কতদিন থাকব? মুকীম হব কি না? নতুন করে আবার অবস্থান হিসেব করতে হবে।

প্রশ্ন: ৫০। কুরবানি করার পূর্বে যদি কোনো হাজি সাহেব মাথা মুণ্ডন করেন, তাহলে তার কী করতে হবে?

উত্তর: এটা অনেক প্রাচীন একটা মতভেদ। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে... মিনার দিনে ১০ তারিখে, আমাদেরকে কয়েকটি কাজ করতে হয়। প্রথম হল, জামারাতে বা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা, দ্বিতীয় হল কুরবানি করা, তৃতীয় হল মাথামুণ্ডন করা, চতুর্থ হল বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সাহাবিরা

অগণিত প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এটার আগে এটা করে ফেলেছি। আমার তো খেয়াল নেই, আমি মাথামুণ্ডন করে ফেলেছি জামারাতে পাথর মারার আগেই। আমি কুরবানি করেছি, পাথর মারি নি। যত কিছু প্রশ্ন করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবারই বলেছেন:

اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ

তুমি করো, কোনো সমস্যা নেই।৪ এটা অনেক হাদীসে এসেছে। এজন্য ফুকাহারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালিকসহ প্রায় সকল ফকীহ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তারতীব বা ক্রম রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো তাগিদ দেন নি, তিনি নিজে এটাকে ক্রম দিয়ে করেছেন। প্রথমে জামারাহ মেরেছেন, এরপরে কুরবানি করেছেন, এরপর মাথামুণ্ডন করেছেন এরপর তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু এটা উল্টে দিলে, যত লোকই প্রশ্ন করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সমস্যা নেই। সুতরাং এই তারতীব রক্ষা করা ফরয বা ওয়াজিব নয়। এটা সুন্নাত, মুস্তাহাব-সুন্নাত। এটা উল্টালে কোনো দম বা কাফফারা লাগবে না। ইচ্ছা করে উল্টানো উচিত নয়। আর যদি উল্টে যায়, তবে এজন্য করার দম বা কাফফারা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো তারতীব অনুসারে করেছেন, এখানে তারতীবটা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন নি, তবে করেছেন, কাজেই করাটা ওয়াজিব। তিনি এখানে বলেছেন সমস্যা নেই, গোনাহ হবে না, অর্থাৎ কাফফারা দিতে হবে, অর্থাৎ দম দিতে হবে। তবে সামগ্রিক বিচারে দম দিতে হবে না, এটাই জোরালো মত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু করেছেন, তাগিদ দেন নি। দ্বিতীয়ত, তারতীব লঙ্ঘন করলে সমস্যা নেই বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে আগেপিছে হয়ে যায়, তাহলে দম দিতে হবে না, এটাই জোরালো মত।

৪. মুআত্তা মালিক, হাদীস-১৪৫০; সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩০৬।

কুরবানি/আকীকা

প্রশ্ন: ৫১। কুরবানির সময় যে নাম দেওয়া হয়, অমুকের নামে, তমুকের নামে! সেখানে আবার আমরা আল্লাহর নামে জবাই করে থাকি। তাহলে পার্থক্যটা কোথায় রইল?

উত্তর: এটা আমাদের বাংলাদেশের অত্যন্ত বাজে রীতি। বিষয় হবে অমুকের পক্ষ থেকে। নাম দেওয়া নাজায়িয কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরবানি করতেন কখনো 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' বলেই কুরবানি করতেন; কারণ আল্লাহ তো জানেন, কার জন্য কুরবানি করছেন। আবার কখনো বলতেন, এটা মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার জন্য আপনারই দেওয়া। আপনি কবুল করে নেন। এজন্য আমরা কুরবানির জবাইয়ের আগে বলতে পারি, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এটা আপনার জন্য কুরবানি করলাম। আমাদের মনের বিষয়টা খুবই বিশুদ্ধ, এক্সপ্রেশনটা ভুল। কুরবানি হবে আল্লাহর নামে। আর কারোর নামে না। আর কারো নাম দিলে তো মুশরিক হয়ে যাবে। তবে অমুকের পক্ষ থেকে কুরবানি যাচ্ছে বলে মনে থাকা বা মুখে বলাতে দোষ নেই।

প্রশ্ন: ৫২। ছেলে সন্তানের জন্য আকীকাহ দেওয়ার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিটা কী?

উত্তর: সন্তানের জন্মে আমাদের আনন্দের একটা পূর্ণতা হল আকীকাহ। আকীকাহর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতদিনের দিন আকীকাহ দিতে বলেছেন। এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে প্রত্যেকের জন্য একটা ছাগল দেওয়ার হাদীসও আছে। আবার ছেলের জন্য দুটো, মেয়ের জন্য একটা দেওয়ার ব্যাপারেও হাদীসে এসেছে। কাজেই আমরা পারলে, পুত্র সন্তানের জন্য দুটো, মেয়ের জন্য একটা অথবা ছেলের জন্য একটা মেয়ের জন্য একটা দিতে পারি। আকীকাহ দেওয়ার আসল কনসেপ্টটা কী? কেন দেওয়া হয় এটা? আকীকাহ হল, আসলে ইসলামের আনন্দ। প্রতিটি আনন্দ অন্যকে নিয়ে। অর্থাৎ ইসলামি আনন্দ এবং অন্যান্য আনন্দের সাথে মৌলিক একটা পার্থক্য আছে। সেটা হল, ইসলাম সকল আনন্দে অন্যদেরকে শরীক করতে বলে। আকীকাহ দেয়ার প্রথম উদ্দেশ্য হল, আমার সন্তানের জন্মে আমি আল্লাহর জন্য একটা প্রাণি কুরবানি করলাম। কিন্তু কুরবানির Conception টা আবার ভিন্নভাবেও আছে। যেমন আপনি যদি বাইবেল পড়েন, দেখবেন, সেখানে কুরবানি– যেমন হোমবলি বা আগুনে পোড়ানো কুরবানি। কুরবানি বলতে আমরা যেটা বুঝি, জবাই করে খাওয়া, বাইবেল সেটা বলে না। কুরবানি করে পুরোটা আগুনে পুড়িয়ে দিতে হয় অথবা পাখি হলে গলা টেনে ছিড়ে সেটা কিছু পুড়িয়ে দিতে হয়, কিছু ফেলে দিতে হয়। এখানে কুরবানি বলতে আল্লাহকে খুশি করতে আমি একটা জিনিস মেরে ফেললাম এবং বাইবেলে বারবার বলা হয়েছে, এই আগুনে যখন পোড়ানো হয় এ ঘ্রাণটা ঈশ্বরকে খুশি করে। কিন্তু ইসলাম বলছে, এটাতো কুরবানি না। কুরবানি বলতে আল্লাহকে খুশি করতে জবাই করে এটা মানুষকে খাওয়াতে হবে। প্রথম হল আল্লাহর জন্য একটা প্রাণিকে জবাই করলাম। দ্বিতীয়ত এর গোশত আমরা বিভিন্নভাবে মানুষদেরকে খাইয়ে এই আনন্দে সবাইকে শরিক করলাম।

তৃতীয়ত সাতদিনের দিন কুরবানির পাশাপাশি সম্ভব হলে, যদি আবহাওয়া পারমিট করে তাহলে, সন্তানের মাথার চুল কেটে সেই পরিমাণ সোনা অথবা রুপা গরীবদের ভেতরে সাদাকা করা। এসব কিছুর উদ্দেশ্য আনন্দ, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে কিছু সাদাকা করা। অন্যদেরকে আনন্দে শরিক করা।

প্রশ্ন: ৫৩। কুরবানির ভাগের সাথে আকীকাহ দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: এখানে আরো একটি জরুরি বিষয় আছে। আকীকাহ কুরবানির সাথে কীভাবে দেব? আকীকাহ দিতে হবে ৭ দিনের দিন। অথচ জন্মের সাতদিনের দিন কুরবানি হবে এটা অত্যন্ত রেয়ার ব্যাপার। এখানে আমরা আকীকাহর সুন্নাতটা পালন না করে বড় ভুল করি। জন্মের সাতদিনের দিন আকীকাহ দিতে হবে। কারণ কী? জন্মের আনন্দ তো নগদ করতে হবে। আমার সন্তান যখন জন্মেছে, আমি তখন আনন্দ না করে দুইবছর পরে, একবছর পরে করব এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এতে সন্তানের হক নষ্ট করা হয়। জন্মের সাতদিনের দিন আকীকাহ দেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজে পালন করেছেন। সাহাবিরা এটা খুব গুরুত্বের সাথে পালন করতেন। আয়িশা ؓ থেকে একটা কথা আছে, যদি কেউ সাতদিনের দিন না পারে তাহলে চৌদ্দ বা একুশতম দিনে, এরপরে নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সাতের পরে আর (কোনো বর্ণনা) নেই। তাহলে আমরা সাত দিনই ধরে রাখি। আনন্দটা নগদ হোক। আর এই নগদ আনন্দ করলে কুরবানির সাথে ভাগ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সাতদিনের মধ্যে যদি কেউ দিতে না পারে তাহলে চৌদ্দদিনের দিন অথবা একুশদিনের দিন দেবে। এটাও না পারলে পরে দেওয়া বৈধ। এক্ষেত্রে আকীকাহর সুন্নাতটা আদায় হবে তবে সময়ের সুন্নাতটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটা হল প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয় হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আকীকাহর জন্য স্পষ্টভাবে একটা বা দুটো ছাগল দিতে বলেছেন। ছাগল, দুম্বা, ভেড়া এ জাতীয়। আমরা কুরবানির ভাগে অংশ নিতে যাব কেন? মোটামুটি একটা জানের বিনিময়ে একটা জান। এবং একটাই দিতে বলেছেন অথবা দুটো দিতে বলেছেন। একটার ভেতরে ভাগ করতে বলেন নি। তৃতীয় হল সাহাবায়ে কেরাম এমনটা ভাগ করতেন না। এমনকি আয়িশা ﷺ কে একজন বলেছেন, আপনার ভাতিজা হয়েছে, আপনি একটা উট দিয়ে দেন। তিনি বললেন, আমি উট দেব কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাগল দিতে বলেছেন। আমি উট দিব কেন![1] অনেক ফকীহ এটাকে জায়িয বলেছেন। তারা বলেন আকীকাহও কুরবানির মতোই আল্লাহ তাআলার জন্য একটা প্রাণি জবাই করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যেহেতু একই রকম কাজেই এটা কুরবানির সাথে একসাথে হতে পারে। হতে পারে, এটা একটা ইজতিহাদি মাসআলা। সুন্নাহ এবং সাহাবিদের কর্ম হল সাতদিনের দিন বা চৌদ্দ অথবা একুশের দিনে একটা বা দুটো ছাগল দেওয়া। বৈধ বা অবৈধ জায়িয-নাজায়িযের ভেতরে না গিয়ে আমরা সুন্নতের ভেতর থাকার চেষ্টা করব।

আমাদের সমাজে এই বিষয়টা প্রচলিত হয়ে গেল কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ যেটা সেটার চেয়ে বরং ওইটাই বেশি প্রচলিত হয়ে গেল! এটা হওয়ার কারণ, আকীকাহ সুন্নাত, এই ধারণা সমাজে ছিল না। (আমাদের) ছোটবেলায় মানুষ আকীকাহ দিত না। এখন কুরবানির সময় দিচ্ছেন অনেকেই। আর আলিমরা জায়িয বলতে..., জায়িয যে সুন্নাতের ব্যতিক্রম হতে পারে...। জায়িয মানে দ্বীন মনে করে ফেলেছে অনেকেই। যেমন কুরবানির সময় বিসমিল্লাহ অথবা বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার না বলে আল্লাহ বলা অথবা রহমান বলা দয়ালু করুণাময় বলা জায়িয। এটাতে কুরবানি জবাই হয়ে যাবে। এটা জায়িয। তার মানে এটা সুন্নাত না। অর্থাৎ কেউ যদি হঠাৎ এটা

১. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭৫৯৫।

করে ফেলে, হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের জায়িযটাকে আমরা দ্বীন মনে করি। জায়িয কাজ, ওইটাই করতে হবে। না! সুন্নাতটা করতে হবে। জায়িয বিপদে পড়লে করা যাবে।

প্রশ্ন: ৫৪। কুরবানির সঙ্গে আকীকা করা বৈধ কি না?

উত্তর: বৈধতা এবং সুন্নাত দুটো জিনিস। একটা হল জায়িয বা বৈধ। আরেকটা হল সুন্নাত, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম কী করেছেন। এখানে আমরা আকীকার সাথে কুরবানি মিলিয়ে কয়েকটা অন্যায় করি। সেটা হল কুরবানি একটা আনন্দ। আকীকা আরেকটা আনন্দ। আকীকা সন্তানের অধিকার। জন্মের সাত দিনের দিন আমি আনন্দ করব। যে পিতা সন্তানের জন্মের সাত দিনের দিন আনন্দ না করে, অথবা পৃথকভাবে তার জন্য আনন্দ না করে, কুরবানির সাথে জড়িয়ে দিলেন, তিনি তার সন্তানের জন্মের আনন্দ করলেন না, সন্তানের হক আদায় করলে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন জন্মের সাত দিনের দিন আকীকা দিয়ে দাও, যদি সাত দিনের দিন দেওয়া না যায়, সাহাবিদের থেকে কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, চৌদ্দ বা একুশে দিনে দাও। তাও যদি আমরা না পারি পরবর্তীতে যে কোনো সময় আমরা দেব। কিন্তু এটা একটা পৃথক ইবাদত। সাহাবায়ে কেরাম তাবিয়িগণ কখনও আকীকার সাথে কুরবানিকে জড়িয়ে নেন নি। দ্বিতীয় বিষয় হল, আকীকার ক্ষেত্রে একটা প্রাণি, বিশেষ করে ছাগল আকীকা দেওয়ার কথা এসেছে। গরুর অংশ নেওয়ার কথা হাদীসে আসে নি। কিন্তু অনেক ফকীহ বলেছেন, আকীকা এবং কুরবানি যেহেতু একই জাতীয় ইবাদত, কেউ যদি একসাথে দেয় তাহলে হয়ে যাবে। কারো সন্তান জন্ম নিয়েছে, সাত দিনের দিন তার কুরবানির দিন হয়ে গেছে। সে কুরবানির সাথে আকীকা দিয়ে দিল, এটা হয়ে যেতে পারে। এটা জায়িয বলেছেন।

কোনো প্রাণি জবাই বা কুরবানি করার সময় সুন্নাত হল, বিসমিল্লাহ অথবা বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর বলা। কেউ যদি শুধু আল্লাহ বা রহমান বা দয়াময় বলে জবাই করে, তবুও জবাই হয়ে যাবে, জায়িয বৈধ। কিন্তু তারা এটাকে কিন্তু উৎসাহ দেন নি। তারা এটাকে প্রচলিত করতে বলেন নি। কেউ যদি ভুলে বা হঠাৎ করে এটা করে ফেলে। এটা হয়ে যাবে। কিন্তু এই হয়ে যাওয়াটাকে রীতিতে পরিণত করলে সেটা বিদআতের চলে যায়। কেউ যদি এই মাসআলা ফিকহের কিতাবে পড়েন, তিনি যদি বলেন যে, আমি এখন থেকে আল্লাহ দয়াময় বলে গরু জবাই করব। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলব না। তাহলে এটা কিন্তু তার জন্য বৈধ হবে না। এজন্য আপনি সাত দিনের দিন আকীকা দেবেন। আর যদি না পারেন ১৪ কিংবা ২১ দিনের দিন। না হলে যখন ইচ্ছা তখন আপনার সন্তানের জন্মের আনন্দ এবং বিপদ থেকে মুক্তির জন্য, পৃথক একটা বা দুটো ছাগল দেন। গরু উট দিতেও অনেক সময় সাহাবিরা আপত্তি করতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাগল দেয়ার কথা বলেছেন। আপনি আরো বেশি আনন্দ করতে চান, আরো অনেক কিছু করেন। কিন্তু সুন্নাতটা সুন্নাতের মতো পালন করবেন। কোনো কোনো সাহাবি উট দিয়েছেন বলে জানা যায়, আবার অনেকে আপত্তিও করতেন। তবে এটা ভাগে করেছেন এমন কোনো নমুনা পাওয়া যায় না।
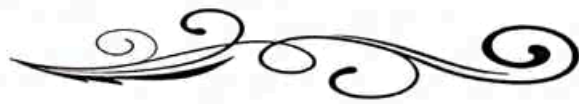
বিবাহ/তালাক

প্রশ্ন: ৫৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাই, তার আসলে বিয়ে করার বয়স হয়েছে এবং এই পরিবেশে বসবাস করতে হলে, ঈমান নিয়ে থাকতে হলে বিয়ে করার প্রয়োজন। কিন্তু বাবা-মা তাকে বিয়ে করাতে চাচ্ছেন না। যেহেতু ভালো কোনো চাকরি করছে না। বিষয়টির আসলে সমাধান কী?

উত্তর: খুবই গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং বর্তমানে আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে আমরা একটু পেছনে যেতে পারি, বোঝার জন্য। ইসলাম এবং সকল ধর্ম, ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেছে। আর বিশেষ করে ইসলাম বিবাহকে উৎসাহ দিয়েছে। কোনো ধর্ম ব্যাভিচারকে আপত্তি করলেও আবার বিবাহতেও আপত্তি করেছে। যেমন বাইবেলে যিশুখ্রিস্ট বিভিন্ন সময়ে গসপেলের জন্য, যিশুখ্রিস্টের জন্য, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রীর, ভাই-বোন, সন্তানদেরকে ঘৃণা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। পরিত্যাগ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এমনকি এক জায়গায় বলেছেন, সম্ভবত মথিতেই আছে। তাঁর সাথিরা প্রশ্ন করছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি এত কঠিন হয় তাহলে তো বিয়ে না করাই ভালো? তখন তিনি বলেন, সকলের জন্য এটা মানা সম্ভব নয়। অনেকে নপুংসক থাকে প্রাকৃতিক কারণে। অনেকে স্বর্গরাজ্যের জন্য খোজা থাকে, নপুংসক থাকে। যে পারে সে করুক। অতএব বিবাহ না করে থাকতে পারাকে ধর্মের জন্য ভালোই তিনি বলেছেন। সাধুপল বলেছেন, বিবাহ না করা ভালো, তবে যদি ব্যাভিচারের ভয় থাকে

করতে পার। যারা বিবাহিত তারা এমনভাবে থাকুক যেন বিবাহিত না। আর যারা বিধবা তারা বিবাহ না করুক। যারা অবিবাহিত তারা বিবাহ না করুক। তবে ব্যাভিচারের ভয় থাকলে করতে পারে। যদি কেউ তার মেয়েকে বিবাহ দেয়, তাহলে ভালো করল। যদি না দেয় তাহলে সে আরো ভালো করল। অর্থাৎ ব্যভিচারকে সবাই নিষেধ করেছেন। তবে অনেকেই কুমারী থাকা, কুমার থাকা, চিরকুমার থাকাকে ধর্মের জন্য উত্তম মনে করেছেন।

ইসলাম কিন্তু এভাবে কখনোই দেখে নি। ব্যভিচারকে বন্ধ করার পাশাপাশি বিবাহকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের কথা, বিবাহকে সহজ করো, ব্যভিচারকে কঠিন করো। এবং এটা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। বর্তমান বিশ্বে মানব সভ্যতায় বা আধুনিক মানবাধিকারে মাদককে খুব ঘৃণা করা হয়। একজন মাদক ব্যবসায়ী বা মাদকসেবককে আইনের আওতায় আনা হয়। কিন্তু মানবাধিকারের দাবি হল আইনে ধরা হবে না। আমি আমার দোকানে মাদক রেখেছি। আমি কাউকে উৎসাহ দিচ্ছি না, প্ররোচনাও দিচ্ছি না, জোর করে পকেটে ঢুকিয়ে দিচ্ছি না, খাইয়ে দিচ্ছি না। আমার তো এটা অধিকার আছে, আমার দোকানে যদি অনেক কিছু রাখতে পারি, মাদক রাখলে সমস্যা কী? যদি কেউ ইচ্ছা করে নিজে মাদক খায়, সমস্যা কী? এবসোলিউট মানবাধিকারের দাবি হল, মাদকের অধিকার দিতে হবে। তারপরেও আমাদের অধিকাংশ দেশেই মাদকাধিকার দিচ্ছি না। মানবাধিকার দিতে চাচ্ছি কিন্তু মাদকাধিকার দিচ্ছি না। কারণ মাদক মানুষের মহাক্ষতি করে। কিন্তু মাদক কতজনের ক্ষতি করে? যে মাদক খায় তার ক্ষতি করে। আর ব্যাভিচার পুরো মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে। ব্যভিচার থাকলে পরিবার থাকবে না। আর পরিবার না থাকলে পরবর্তী মানবপ্রজন্ম থাকবে না। এজন্য ইসলামে বিবাহকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে প্রচণ্ডভাবে। আল্লাহ কুরআনে বলছেন:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

তোমাদের ভেতর অবিবাহিত যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সবাইকে বিবাহ করিয়ে দাও।[১] যুবক-যুবতীদের যাদের বিয়ের বয়স হয়েছে তাদেরকে বিবাহ দাও। বিবাহের বয়স হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে, স্বামী বা স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে দাও। এটা অভিভাবকদের উপর ফরয। ছেলে-মেয়েদের বয়স কুরআন সুন্নাহর আলোকে আঠারো, উনিশ, বিশ, বাইশ, পঁচিশ থেকে তাদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া দরকার। এটাই তাদের বিবাহের, রোমান্সের বয়স। আমরা কী করছি? এই বয়সে তাদের ব্যভিচারে পথ খুলে দিচ্ছি। আর যখন পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বয়স হচ্ছে তখন বিবাহের দরজা খুলে দিচ্ছি। বিবাহটা একটা artificial ব্যাপার হয়ে গেছে। একটা বউ পাশে থাকা দরকার, ব্যাপারটা এরকম একটা বিষয় হয়ে গেছে। মুমিনদের জন্য এটি খুবই ধ্বংসাত্মক। এজন্য আমরা অনুরোধ করব...। আল্লাহ কুরআন কারীমে কী বলেছেন এই আয়াতে?

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

তোমাদের অবিবাহিত বয়স্কদের বিবাহ দিয়ে দাও। তার যদি অসচ্ছল হয়, আল্লাহ তাদের সচ্ছল করে দেবেন। এর পরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.

যদি একেবারেই দরিদ্র হয়, বিবাহ করার কোনো সামর্থ্য নেই, তারা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করবে যতদিন না সচ্ছল হয়।[২] কাজেই চাকরি পাওয়া শর্ত নয়, মোটামুটি স্ত্রী পালনের ন্যূনতম পর্যায়ে আছে, তাদের বিবাহ দিতে হবে। আর বিবাহতে অতিখরচ করে বিবাহটাকে

১. সূরা [২৪] নূর, আয়াত: ৩২।
২. সূরা [২৪] নূর, আয়াত: ৩৩।

কঠিন করা যাবে না। বিবাহকে সহজ করতে হবে।

প্রশ্ন: ৫৬। একভাই প্রশ্ন করেছেন, আমি একমেয়েকে পছন্দ করি, ভালোবাসি এবং তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমার ফ্যামিলি এটাকে মানছে না। সে ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি? তাকে কি বিয়ে করব? নাকি ফ্যামিলির সিদ্ধান্তকে মেনে নেব?

উত্তর: এটা আমাদের সারা বিশ্বে মুসলিম সমাজে একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছে যে, আমরা ছেলেমেয়েদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। তারা তাদের মতো চলছে। স্বভাবতই মেয়েদের সাথে ছেলেদের বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন তারা বিবাহ করতে চায়, তাদের চয়েসটাকে আমরা অনার করছি না। অনার না করার কারণ কিন্তু কোনো প্র্যাকটিক্যাল না। জাস্ট ইগো। আমাদের কাছে না শুনে তুমি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছ। কাজেই ওটা মানা যাবে না। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই অভিভাবকদেরকে বলব যে, আপনারা অবশ্যই সন্তানদের চয়েসকে সম্মান করবেন। ইসলামে বিবাহের জন্য দুটো জিনিস বলা হয়েছে। একটা, যে বিবাহ করবে, ছেলেমেয়েদের চয়েস। আরেকটা পিতামাতার মতামত। এটার কারণ হল, সন্তানদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ছেলে প্রশ্ন করেছে তার জন্যও এটা জরুরি– আমরা সাধারণত যখন বিশ, পঁচিশ, পনেরো এরকম বয়স হয়। এই সময় কিশোরেরা বা যুবকেরা যৌবনের শুরুতে যে চয়েসটা করে এটা অধিকাংশ সময় ভুল হয়।

দুবাইয়ের আমাদের একভাই, উনার অফিসের সিনিয়র বস, ফিলিপিনো। উনি উনার শালকের বিবাহের জন্য দেশে আসবেন। উনার শ্যালকও চাকরি করে দুবাইয়ে। উনি ছুটি চেয়েছেন যে, আমার শ্যালকের বিবাহ, আমি যাব। শ্যালকের বিবাহ কেমন? শ্বশুর-শাশুড়ি মেয়ে দেখে চয়েজ করে রেখেছেন, শ্যালক গিয়ে দেখে পছন্দ হলেই বিয়ে হয়ে যাবে। এখন ফিলিপিনো ভাই অবাক হয়েছেন। এটা কেমন কথা! যে মেয়েকে কোনোদিন দেখলাম না, দুয়েক বছর তার

সাথে চললাম না। তাকে তোমরা বিয়ে করে ফেল? এটা তোমাদের কেমন ধরণের অসভ্যতা? আমরা তো কখনো এটা করি না। যার সাথে সংসার করবা আগে থেকে তার সাথে মিশে দেখতে হবে না সে কেমন? এখন আমার ওই ভাই তাকে বলছেন দেখো, তোমরা তো সবাই দেখেশুনে পছন্দ করে বিয়ে কর। আর আমরা! পিতা-মাতা দেখে রাখে, আমরা একটু চোখের দেখা দেখেই বিয়ে করি। কিন্তু বিবাহের ভাঙন তোমাদের দেশে বেশি, আমাদের দেশে কম। এটার কারণ কী বল? তোমরা এত দেখার পরেও ভাঙ্গে কেন? স্বভাবতই ফিলিপিনো কোনো উত্তর দিতে পারেন নি। উনি তাকে উত্তর দিচ্ছেন, আমাদের চয়েস আছে, কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স নেই। আর পিতা-মাতার এক্সপেরিয়েন্স আছে। তারা জানেন কোন ধরনের পরিবারের মেয়েরা কেমন সংসার করতে পারে, কেমন ধরনের, ভালো/মন্দ!

যখন পিতা-মাতার এক্সপেরিয়েন্স আর সন্তানদের চয়েস দুটো এক জায়গায় হয়, তখন সেটা বেশি ভালো হয়। স্থায়ী হয়। এটার জন্য আমাদের যারা বিবাহ করতে যাচ্ছেন আমরা তাদেরকেও বলব যে, আমাদের চয়েসের সাথে পিতা মাতার পরামর্শও লাগবে। কাজেই যদি পিতা-মাতার এমন কিছু মত দেন যেটা তোমার জন্য ভালো হবে না, যদি যৌক্তিক হয় তাহলে আমাদের এই ইমোশনাল চয়েসটাকে বাদ দিতে পারলে ভালো। কারণ সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের চয়েসটা ভালো হয় না। এজন্য পিতা-মাতার দায়িত্ব হল যথাসম্ভব ছেলেমেয়েদের চয়েসকে অনার করা। যদি কোনো সমস্যা না থাকে, যদি উনিশ-বিশ হয়, মেনে নেওয়া। কাজই তারা চয়েস করেছে তাদের এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। আর যদি এইধরনের সুবিবেচক পিতামাতা কোনো সুবিবেচনাযোগ্য পরামর্শ দেন যে, এটা তোমার জন্য কোনোমতেই ভালো হবে না, এটা এই কারণে– এটা সন্তানদের মানা উচিত।

প্রশ্ন: ৫৭। আমি জানি, মোহরানা স্ত্রীর হক বা অধিকার। কিন্তু আমার

স্বামী আমার মোহরানা এখনও দেন নি। আসলে দেবেন কি দেবেন না, সে বিষটাও উনার সাথে আমার কমিটমেন্ট হয় নি। বিষয়টার ব্যাপারে আসলে শরীআতে কী বলে?

উত্তর: কমিটমেন্ট হয় নি মানে? কমিটমেন্টের পরেই তো বিবাহ হয়েছে! মোহর মেয়েদের মর্যাদা। একজন নারীকে স্ত্রী করে আনার জন্য তাকে– যেমন আমরা একজন সম্মানিত মানুষকে হাদিয়া দিয়ে নিয়ে যায়, তার জন্য উপহার দিই। স্ত্রীর জন্য এটা একটা নিরাপত্তা এবং মর্যাদা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয যে, তাকে মহর দিতে হবে। এই মোহরটা দেওয়ার জন্য। শোনানোর জন্য নয়। মোহর নির্ধারণের পরে দিয়ে দেওয়া ফরয। তবে মোহর না দিলে বিবাহের সম্পর্কে কোনো ক্ষতি হবে না। বিবাহ চলবে। মোহর তার ঘাড়ে ফরয। যেমন আপনি একটা চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটা জিনিস গ্রহণ করলেন। এই চুক্তির টাকা দিতে বাধ্য। কিন্তু দেরি করলে আপনি দায়ি হবেন। জিনিসটা আপনি নিয়ে নিয়েছেন এটা অবৈধ নয়। এজন্য স্বামী-স্ত্রী যখন একটা মোহরের চুক্তিতে বিবাহ করেন, মোহর বাকি রাখার কারণে বৈবাহিক সর্ম্পকের কোনো ত্রুটি হয় না। অনেকে মনে করেন, মোহর না দিলে, স্ত্রীর সাথে বিয়েই হয় না। এটা ঠিক কথা নয়। বিয়ের আগে যদি মোহরের কমিটমেন্ট না হয় তাহলে কি বিয়ে হবে না? হবে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, মোহর নির্ধারণ ছাড়াও বিয়ে হতে পারে। কিন্তু বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই মেয়ের বোন বা আপনজনেরা যে মানের মোহর পেয়েছে সেই মোহর দেওয়া স্বামীর জন্য ফরয হয়ে যাবে। অনির্ধারিত হওয়ার কারণে মোহর মাফ হবে না। মোহর নির্ধারিত হয়ে যাব।

মোহর বাকি রাখার কারণে গুনাহ হয় না। কিন্তু কেউ যদি মোহর নির্ধারণের সময় মোহর না দেয়ার নিয়ত রাখে, তাহলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তাকে গাদ্দার, প্রতারক হিসেবে ঝাণ্ডা ধরিয়ে দেওয়া হবে যে, সে প্রতারক, মহা প্রতারক। যে মোহর

নির্ধারণ করেছে ৫ লাখ টাকা। তখন থেকে তার মনে ছিল যে, এই মোহর সে দেবে না। খালি ঘোষণা দিয়ে দেব। এটা গাদ্দার। আর মোহর দেওয়ার নিয়তে মোহর ধার্য করা হয়েছে, দিতে দেরি হয়েছে, এটা গাদ্দার হবে না। তবে দ্রুত দিয়ে দিতে হবে। এটা বান্দার হক। যদি কোনো স্বামী না দেন তবে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত দায়ি থাকবেন। আর তিনি যদি ক্ষমা চেয়ে নেন তবে ক্ষমা হবে না। কারণ অনেক সময় মেয়েরা দুর্বলতার কারণে অসহায় হয়, ক্ষমার কথা, অথবা লজ্জার কারণে তারা ক্ষমা করে দেয়। এজন্য মোহর তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দেওয়ার পরে যদি তিনি ফেরত দিয়ে দেন...

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

তাদের মোহরটা খুশি মনে বুঝিয়ে দাও...

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

দেয়ার পরে যদি কিছু তারা তোমাদের দেয়– 'এটা আপনাকে হাদিয়া দিলাম'– তুমি সেটা ব্যবহার করতে পার।[৩]

প্রশ্ন: ৫৮। কোনো মহিলার স্বামী যদি তাকে প্রায়ই মারধর করেন, নির্যাতন করেন, সন্দেহ করেন। যদি এ কারণে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে খুবই অশান্তি বিরাজ করে তাহলে কোন আমল করলে বা কী করলে দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে?

উত্তর: বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি! আমাদের পরের প্রজন্মে আল্লাহ তাআলা অনেক সচ্ছলতা বা বৈষয়িক সুবিধা দিয়েছেন। আমাদের জীবনে অনেক সুবিধা, যেটা আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষরা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু পারিবারিক জীবনে অশান্তি। আমরা বৃদ্ধ। আমাদের পূর্বের প্রজন্মের যারা আশি বছর নব্বই বছর পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনে আনন্দ-ফূর্তি করত,

৩. সূরা [৪] নিসা, আয়াত: ০৪।

সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দুর্ভাগ্যবশত এটার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ, অধিকার চেতনা, দায়িত্ববোধহীনতা– যা আমাদের এই আধুনিক সভ্যতা শেখাচ্ছে। এটার কারণে পারিবারিক অশান্তি বেড়েছে। মূলত এটার অনেক দীর্ঘ আলোচনা দরকার। কিন্তু সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর হল যে, এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কথা হল, সন্দেহ করা হারাম। স্বামীর জন্য স্ত্রীকে সন্দেহ করা, স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সন্দেহ করা তেমনি হারাম, যেমন এক মুসলিম আরেক মুসলিমের জন্য সন্দেহ করা। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

হে ঈমানদারেরা তোমরা অধিকাংশ ধারণা, সন্দেহ পরিত্যাগ করো। অনেক সন্দেহ-ই পাপ, মহাপাপ।[৪]

কুরআনের ভাষায় 'ইসম' মানে মহাপাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

...فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ

সন্দেহ হল সবচেয়ে বড় মিথ্যা।[৫] পারিবারিক সমস্যার প্রথম, যেটা আপনি বলেছেন, সন্দেহ। সন্দেহ হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল সন্দেহ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। সন্দেহ মানবীয় দুর্বলতা। আমরা সবাই মানুষ। ভুল তো হতেই পারে। আমরা চাই আমার স্ত্রী পারফেক্ট হবে, কিন্তু আমার ভেতর অনেক দোষ আছে। আমার স্বামী পারফেক্ট হবে, আমার ভেতরে অনেক দোষ আছে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক জগতে, আমাদের কাছেও বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে মানুষ..., বোনেরা প্রশ্ন করেন আমার স্বামী খুবই ভালো। নামায পড়েন। কিন্তু আজকাল ফেসবুকে অন্য মেয়েদের সাথে চ্যাট করেন।

---

৪. সূরা [৪৯] হুজুরাত, আয়াত: ১২।

৫. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৬৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯১৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৯৮৮।

তা আপনার ফেসবুক দেখতে বলেছে কে? সে বাইরে গিয়েও গল্প করতে পারত। আপনি তার প্রতি ভালো ধারণা করুন। মনে করুন, এ গল্পটা একান্তই স্বাভাবিক। আপনাকে সন্দেহ করতে হবে কেন! ঠিক স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন, স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করছেন। এ সন্দেহ মূলতই হারাম। বরং অন্য মুসলিমের ক্ষেত্রে যেমন কোনো খারাপ কিছু দেখলে একটা ভালো ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে একই হুকুম। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবাঘরকে দেখে বলছেন:

مَرْحَبًا بِكِ مِنْ بَيْتٍ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا: دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

হে বাইতুল্লাহ, তুমি অনেক বড়, তোমার সম্মান অনেক বড় কিন্তু মুমিনের মর্যাদা আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আল্লাহ তোমার জন্য একটা জিনিস হারাম করেছেন। যে তোমার এরিয়ার ভিতরে এসে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। একটা মুমিনের ব্যাপারে তিনটা জিনিস হারাম করেছেন। কোনো মুমিনের সম্মানহানি করা যাবে না, তার সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়া যাবে না, তার ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করা যাবে না, সন্দেহ করা যাবে না।[৬] শায়খ আলবানি হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[৭]

উমার ﵁ বলতেন, কোনো মুসলিমের কোনো কথা কোনো কর্ম দ্বারা তুমি যদি কোনো ভালো ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাও, তাহলে খারাপ ধারণা করবে না। এটা অন্যদের ক্ষেত্রে যেমন, স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে আরো বেশি দরকার। সন্দেহ বর্জন করতে হবে। খারাপ কিছু দেখলেও সন্দেহ থেকে ভালো ব্যাখ্যার সৃষ্টি করতে হবে।

---

৬. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-৩৭২৫, ৬২৮০।
৭. আলবানি, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭/১২৪৮-১২৫০।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পারিবারিক সন্দেহ দূর করতে কী করতেন, সেটা আমাদের জানা দরকার। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিয়মিত আচরণ ছিল, তিনি যখন সফরে যেতেন, অর্থাৎ সাহাবিদের নিয়ে দীর্ঘ দিনের সফর করে ফিরতেন। মদীনায় যদি দুপুরে, বিকেলে পৌঁছতেন তবে, মদীনায় ঢুকে পড়তেন। আর যদি রাত হয়ে যেত, তবে রাতে কোনো মুমিনকে বাড়ি যেতে দিতেন না। মদীনার উপকণ্ঠে ক্যাম্প করতেন। সকাল হওয়ার পরে বাড়ি যাবার অনুমতি দিতেন। রাত্রি বেলায় যদি তুমি দশটা, এগারোটা, বারোটায় বাড়িতে ঢোক, তবে তোমার স্ত্রীকে এমন এমন ভাবে পেতে পার, যা দেখে তোমার ভেতরে সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে। তিনি পারিবারিক এ সন্দেহমুক্ত থাকাকে কত গুরুত্ব দিয়েছেন। যেন স্ত্রী তোমার ইস্তিকবাল করতে পারেন, রিসিভ করতে পারেন। রাত দুপুরে তুমি গিয়েছ, অন্ধকার ঘরে, কোথায় কী আছে, না আছে, কীভাবে আছে। তুমি সন্দেহ করবে। নাহ, তুমি এভাবে যাবে না। কাজেই সন্দেহের এই বিষবাষ্প থেকে হৃদয়টাকে মুক্ত করতে হবে। স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করবেন, স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করবেন । দ্বিতীয়ত, বোন যে প্রশ্নটা করছেন, যে স্বামী অত্যাচার করেন, খারাপ আচরণ করেন। এটা দুঃখজনক। এক্ষেত্রে অনেক ধরণের সমাধান আছে। তবে প্রথম যেটা বুঝতে হবে... এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি আপনি ওই স্বামীকে ছেড়ে দেন, তবে এটা সমাধান না। এরপরে আমি যে স্বামী নেব, সে যে ভালো হবে, সেটা আমি বলতে পারছি না। আবার একা থাকব, এটা মানবীয় প্রকৃতির বাইরে। মানুষের শেষ জীবনে আশেপাশে সন্তান না থাকা কিংবা সন্তানের সন্তানদের না থাকা, বরং একা থাকা এটা মানসিকভাবে অনেক কষ্টের ব্যাপার। এজন্য সম্পর্কটা টেকানো যায় কি না... যেটা আছে সেটা চেষ্টা করতে হবে। এজন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে... এবাদত এর অনুভূতি... আমি যদি বুঝি আমি আমার স্বামীর প্রতি– আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন, এটা পালন করব। তিনি যদি দায়িত্ব অবহেলা করেন আল্লাহর কাছে দায়ি থাকবেন।

ইসলাম শেখায় দায়িত্বের ব্যাপারে অধিক সচেতন হওয়া। অধিকার যতটুকু পার নাও, না পারলে অন্তত ত্যাগ স্বীকার করো। আর আধুনিক সভ্যতা শেখায় অধিকার। প্রত্যেকে তার অধিকার নিতে হবে, কিন্তু দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো কথা নেই। ইসলাম অন্যটা শেখাচ্ছে। আসলে সবকিছু আইন করে, ফতোয়া দিয়ে আদায় করা যায় না। আদায় মন থেকে না হলে ভেঙে যেতে দিতে হয়। আর কতবার ভাঙবেন আপনি ?! এজন্য আমরা যদি প্রত্যেকেই, স্বামী-স্ত্রী এবাদত এর চেতনায় কাজ করি যে, আমি আমারটা পালন করছি। স্বামী থেকে, স্ত্রী থেকে বেশি আশা না করি। কিছু হলে 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি। সরি... তুমি মনে করলে আমার কিছু করার নেই'। আর আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি যে, এমন তিনি চেয়েছেন। সর্বশেষ, আরো অনেক কথা ছিল। যেটা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, স্বামী বা স্ত্রী– স্বামীর কথাই তিনি বেশি বলেছেন, তার দাম্পত্য সঙ্গীকে ঘৃণা করবে না। তার একটা জিনিস খারাপ হলে অন্যটা ভালো হতে পারত। অনেক ভালো হতে পারত। কাজেই খারাপটাই শুধু দেখব না আর ভালোগুলো দেখে একটা ভালো ধারনা করব। ঠিক স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীদেরকে বেশি নসিহত করেছেন। কারণ সবচেয়ে বেশি অত্যাচার স্বামীরা করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই নির্দেশনার পাশাপাশি একটা দুআ করতে হবে। যে আমলটা বোন চেয়েছেন।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

আল্লাহ তাআলা বলছেন যারা ভালো মুমিন তাদের ব্যাসিক কুয়ালিটি গুলোর একটা হল তারা এই দুআটা করে। হে আল্লাহ, আমাদের দাম্পত্য সঙ্গী, 'আযওয়াজ' মানে স্বামীর জন্য স্ত্রী , স্ত্রীর জন্য স্বামী। আমার দাম্পত্য সঙ্গীকে আমার জন্য চোখের প্রশান্তি বানিয়ে দিন

এবং আমার সন্তানদেরকে এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।[৮] তার মানে মুত্তাকিদের ইমাম হওয়ার আগে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবার গঠন করতে হবে। মুত্তাকিদের ইমাম তারাই হতে পারবে যাদের স্বামী-স্ত্রীর, সন্তানের ভেতরে পরিপূর্ণ শান্তির সম্পর্ক। সিকুয়েন্সে প্রথমে কিন্তু পারিবারিক শান্তি। অর্থাৎ মুত্তাকিদের তাকওয়ার কামালত কখন আসবে? যখন তাদের পরিবার সুন্দর হবে। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ.

যার আচরণ সুন্দর সে সবচেয়ে পূর্ণ মুমিন। আর এদের ভিতরে সেই ভালো যে তার স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করে। পরিবারের, স্বামীর সাথে ভালো আচরণ করে।[৯] অর্থাৎ পারিবারিক সম্প্রীতি, এটা ঈমানের কামালাত, তাকওয়ার কামালাত প্রমাণ করে। আর আমাদের দুটোই লাগবে– এই পূর্ণতা আর মুত্তাকিদের ইমাম হওয়া।

প্রশ্ন: ৫৯। একবোন প্রশ্ন করেছেন, উনি উনার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে ভালো আচরণ পাচ্ছেন না। অনেক সময় তারা উনাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেন। হঠাৎ হঠাৎ মন্দ কথা বলেন, যেটা অনেক সময় সহ্য করা যায় না। উনি জানতে চেয়েছেন, উনি কীভাবে ওই ফ্যামিলিতে থাকবেন? উনার মন চায় বাপের বাড়িতে চলে যেতে। কী করবেন সেক্ষেত্রে?

উত্তর: এটাও অনেক পুরনো যামানা থেকে মানব সভ্যতার একটা অসভ্য দিক। এটা শুধু এখন নয়, প্রাচীন সাহিত্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানেও এটা পাওয়া যায়, সেটা হল শাশুড়ি এবং পুত্রবধুর অম্লমধুর সম্পর্ক। আরো সমস্যা হয়েছে, মিডিয়াতে সবসময় শাশুড়িকে জালিম এবং পুত্রবধূকে মজলুম হিসেবে চিত্রায়িত

---

৮. সূরা [২৫] ফুরকান, আয়াত: ৭৪।

৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৪০২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১১৬২।

করা হচ্ছে। যেটার কারণে বউদের মনটা যেন আগে থেকেই শ্বাশুড়ির প্রতি বিষিয়ে থাকে। এবং দুর্ভাগ্যবশত দুজনেই নারী। এজন্য আমাদের এক্ষেত্রে অনেকগুলো করণীয় রয়েছে। প্রথম হল, ইসলামিক পারিবারিক ধারণায় পুত্রবধূর জন্য শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সেবা কিন্তু দায়িত্ব না। নিজের পিতা-মাতার খেদমত আমার জন্য ফরয। তাদের সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত সেবা করা, অর্থাৎ পুত্রের ওপরে নিজের পিতা-মাতার খেদমত করা ফরয। কিন্তু পুত্রবধূ আত্নীয় হিসেবে, স্বামীর পিতা-মাতা হিসেবে তাদেরকে শ্রদ্ধা করবেন, ভালোবাসবেন, ভালো আচরণ করবেন। কিন্তু তাদের খেদমত করতে হবেই, এই চিন্তাটা কিন্তু ঠিক না। ইসলামি শরীআত অনুযামী নয়। সমস্যা শুরু হয় যখন শ্বশুর-শ্বাশুড়ি মনে করেন, আমার পুত্রবধূ আমার সেবা করতে বাধ্য। এটা শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে পরিহার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত অনেক সময় আমরা দেখি, মা-বাবা ছেলেকে বিয়ে দেন নিজেরা বাছাই করেই। কিন্তু বিয়ের পরে যখন ওই ছেলেটাই স্ত্রীর সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, তখন তারা মনে করেন, ওই বউ ছেলেটাকে পর করে নিল। অথচ পর করার জন্যই তো তুমি বিবাহ দিয়েছিল। এতে তোমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। তৃতীয়ত আমরা যেটা শুনি, 'আমার ছেলেটা মোটেও ভালো না, কারণ সে বউয়ের কথা শোনে। আমার জামাইটা খুব ভালো, মেয়েটা যা-ই বলে তা-ই শোনে'। আমাদের এই বিষয়টা বুঝতে হবে, শ্বাশুড়িদের যে এই সমস্যাটা আছে, এটা বুঝতে হবে। যেহেতু প্রশ্নটা করেছেন পুত্রবধূ, তাকেই বলছি, তাদেরকে পরিবর্তন করতে হলে ঈমানি চেতনা বাড়াতে হবে। পুত্রবধূর জন্য যেটা, আমাদের চেষ্টা করতে হবে স্বামীকে বুঝিয়ে, আমার দায়িত্ব কতটুকু তাদের দায়িত্ব কতটুকু। দ্বিতীয়ত আমাদেরকে বুঝতে হবে যে স্বামীর সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব। কাজেই স্বামীর জন্য শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে সম্মান করা, তাদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে হবে। এখানে মূল সমস্যা, আপনি যেটা শুরুতেই বলেছেন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি থেকে যে ব্যবহার

আশা করা দরকার তা পাচ্ছেন না। এই আশাটাই ভুল। আমাদের বুঝতে হবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ি সাধারণত এর থেকে ভালো ব্যবহার করতে পারবেন না।

আমাদের প্রধান যে ভুল হয়ে যায়, দুই পরিবার থেকে দুটো মানুষ আসে। কাজেই সমন্বয়টা কষ্টকর হবেই। শাশুড়িকে বুঝতে হবে, ওই মেয়েটা অন্যের পরিবার থেকে এসেছে। আমরা অনেক সময় পৃথক হওয়াকে ঘৃণা করি, খারাপ জানি। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ হল, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, তাদের পরিবার– ছেলে তাদেরকে টানবে। পুত্রবধূকে আমাকে রান্না করে দিতে হবে, আমার এই করতে হবে ওই করতে হবে এটা কিন্তু ইসলাম বলে না। স্বামীদেরও দায়িত্ব আছে স্ত্রীদেরকে সুযোগ দেওয়া, সময় দেওয়া। আর সকল ক্ষেত্রে ইবাদতের চেতনায় যদি আমরা শ্বাশুড়ি-শ্বশুরের দায়িত্ব পালন করি যে, স্বামীর জন্য একটু সহযোগিতা করছি, তাহলে আল্লাহ সাওয়াব দেবেন, তারা যা-ই করুক– তাহলে এই খারাপ আচরণটা আমাদের জন্য সহনীয় হয়ে যাবে। আমাদের জন্য এটা বহন করা সহজ হবে।

প্রশ্ন: ৬০। একজন নারী এবং পুরুষ লিভ টুগেদার করেছে এবং এর ফলে তাদের একটা সন্তান হয়েছে। এরপরে তারা বিয়ে করেছে। সন্তানের এখন কী হবে?

উত্তর: যদিও তারা লিভ টুগেদার করেছেন, আবার তারাই বিয়ে করেছেন। সন্তান তো পাপী নয়। সন্তানের কোনো পাপ নেই। পিতামাতা পাপী। তারা তাওবা করবেন এবং তাদের পরিচয়ে সন্তান পরিচিত হবে। কারণ তার ঘরে সন্তানটা হয়েছে। যদিও তাদের মিলনটা অবৈধ ছিল। আর পিতামাতা পাপের জন্য তাওবা করবে।
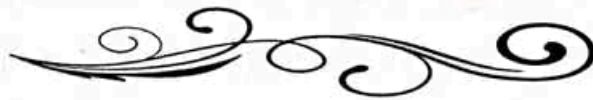
পোশাক/পর্দা

প্রশ্ন: ৬১। আমি ইউনিভার্সিটিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্টে পড়ি। আমি হিজাব পরিধান করতে পছন্দ করি। কিন্তু ইউনিভার্সিটির পরিবেশ এবং আমার আনুষঙ্গিক অবস্থা এরকম যে, হিজাব পরিধান করে গেলে অনেকে আমাকে টিজ করে, অনেকে আমাকে নিরুৎসাহিত করে, মন্দ কথা বলে। এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

উত্তর: বর্তমানে একদিকে অনেক অমুসলিম মহিলা ইসলামের হিজাব দেখেই মুসলিম হচ্ছেন। ইউরোপে, আমেরিকায় সব জায়গাতেই হচ্ছে। আরেকদিকে অনেক মানুষই হিজাব দেখে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এমনকি অনেক মুসলিমও হিজাবকে ঘৃণা করেন। অমুসলিমরা অনেকেই না বুঝে করেন। এক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় করণীয় রয়েছে। তার প্রথম হল, হিজাব বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া। আমি অনেক আগে একজন আমেরিকান মহিলা, নাওমি উলফ, তার একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। ভদ্রমহিলার আর্টিকেলের নাম হল দ্যা ভেইল্ড মডেস্টি (পর্দায় ঢাকা সতিত্ব)। তো উনি এ প্রবন্ধে লেখেছেন, 'আমরা পাশ্চাত্যের মানুষেরা হিজাবকে ঘৃণা করি এবং এটাকে স্যাগ্রিগেশনের একটা সিম্বল মনে করি। জুলুমের একটা প্রতীক মনে করি। আর আমরা বিশ্বাস করি, কোনো সচেতন নারী হিজাব করেন না। যারা করেন তারা সেকেলে। স্মার্ট না বলেই তারা এগুলো ঢেকে ঢুকে চলেন। তবে এই ব্যাপারে একটু ফিল্ড ওয়ার্ক করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনেশিয়া,

আলজেরিয়া, মিসরসহ বিভিন্ন দেশে সফর করলাম। সে সকল দেশের বাজারে হিজাব পরিহিত মেয়েদেরকে আমি টার্গেট করে তাদের সাথে পরিচয় করে সুযোগমত তাদের বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার উদ্দেশ্য হল, পর্দার বাইরে তারা কেমন, সেটা দেখা এবং তাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানা।' তিনি বললেন, 'আমি যখন এসকল মেয়েদের বাড়িতে গেলাম তখন দেখলাম, মেয়েগুলোর মোটেও স্মার্টনেসের ঘাটতি নেই। পোশাক-আশাকগুলো, পর্দার নিচে যেটা, এটা স্মার্ট, ম্যাচিং আছে। তাদের কসমেটিক এর সবই আধুনিক। আধুনিকতার মানে তারা পরিপূর্ণ। তবে এতে প্রমাণ হল যে, আধুনিকতার অভাবে তারা বোরকা পরছেন না। স্বভাবতই তারা বোরকা পরছেন।' তাদের ভেতরে, নাওমি উলফ লেখেছেন, 'আমি দুইটা জিনিস ব্যতিক্রম পেলাম। একটা হল আমরা পাশ্চাত্যের মেয়েরা যারা খোলা থাকতে ভালোবাসি, আর খোলা থাকার কারণে খোলা দেহটা আমাদের মেকআপ করতে হয়। ব্যাপকভাবে। এতে কী হয়? মেকআপ না করলে আমাদেরকে ভালো দেখায় না। খুব অড লুকিং লাগে। আর পর্দানশীল মেয়েদেরকে দেখলাম, তাদের স্কিনটা অত্যন্ত কমনীয়। তারা এঞ্জেলিক। অর্থাৎ মেকআপ ছাড়াই তারা যখন বোরখা খোলেন, আমার সামনে স্বাভাবিকভাবে আসেন, তাদের স্ক্রিনটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কমনীয়। তারা ফর্সা না কালো এটা বড় নয়। তাদের স্ক্রিনে যে কমনীয়তা, দেহের যে কমনীয়তা এটা অ্যাঞ্জেলিক। এটা পর্দার কারণেই হয়েছে।

আরেকটা হল দাম্পত্য জীবনে। আমরা পাশ্চাত্যে যেহেতু খোলামেলা সমাজে বাস করি, সারা দিনেই আমাদেরকে বিভিন্ন নারী পুরুষ একসাথে মিশতে হয়। বিবাহিত জীবন থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আকর্ষণ খুবই কম থাকে। একটা নরমাল প্রাতিষ্ঠানিক মনে হয়। অফিশিয়াল মনে হয়। কিন্তু পর্দাশীল পরিবারগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে সম্পর্কটা আরো অনেক গভীর বলে তার কাছে মনে হয়েছে। পর্দা সম্পর্কে এই যে একজন পাশ্চাত্যের নারীর মূল্যায়ন, এটা

আমাদের বুঝতে হবে। পর্দার উপকারিতা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। পর্দা যে আল্লাহর ফরয বিধান, এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং দুনিয়ার নিরাপত্তা লাভ করছি, এটা অনুভব করতে হবে এবং মানুষদেরকে সুন্দরভাবে বোঝাতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। আর দীন পালনের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা তো আসতেই পারে। মানুষ বুঝে না বুঝে করতেই পারে। এগুলোকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া নিআমত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন: ৬২। মহিলারা পরপুরুষের সামনে শব্দে করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন কি না?

উত্তর: মহিলারা পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবেন। তাদের সাথে সাধারণ ইন্টারেকশন করতে পারবেন। কথাবার্তা, লেনদেন– এটা ইসলামি শরীআতে বৈধ করা হয়েছে এবং কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। তবে মহিলারা এমনভাবে কথা বলবেন না, যেন অন্য পুরুষের ভেতরে আকর্ষণ তৈরি করে। আমাদেরকে বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীটাকে টিকিয়ে রেখেছেন মানব সভ্যতার মাধ্যমে। নারী-পুরুষের সর্ম্পকের মাধ্যমে। একটা আকর্ষণের মাধ্যমে। পারিবারিক জীবন খুব কষ্টের। স্ত্রীর বোঝা বাওয়া, স্বামীর ঝঞ্ঝাট মেনে নেওয়া, সন্তানদের পালন করা– এসব কিছু করে আমরা একটু মানসিক শান্তি পাই। সন্তান কত কঠের! কিন্তু সন্তানের মুখ দেখলে সব ভুলে যাই। মেয়েদের কণ্ঠস্বর শোনার ব্যাপারে... আমরা বলছিলাম, মেয়েরা সব কথা বলতে পারবেন। স্বাভাবিক সব কথাবার্তা-আলোচনা, ওয়ায, বক্তব্য। তবে কথাটা আকর্ষণীয় হবে না। কারণ নারী-পুরুষের আকর্ষণ জন্মগত। একজন পুরুষ নারীর আকর্ষণের ভিত্তিতে এবং সন্তানের প্রতি মমতার ভিত্তিতে পারিবারিক জীবন গড়ি। পারিবারিক জীবনের শত কষ্ট সত্ত্বেও শুধু এই মনের আকর্ষণের কারণে পরিবার টিকে থাকে। এটা যদি বিপথগামী হয়, নষ্ট হয়, তাহলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। আসলে এই কারণে

Western-এ পরিবার নেই। এ জন্যই ইসলাম নির্দেশ দিচ্ছে, মেয়েরা সব কথা বলবেন, তবে এমনভাবে বলবেন না, যে ব্যক্তি শুনছে তার ভেতরে ওই নারীর প্রতি একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মাতে পারে। এর ভেতরে রয়েছে খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে মিষ্টি করে মধুর করে কথা বলার প্রবণতা। এটা নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াত যদি স্বাভাবিক হয়, সেটা তো কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সুর করে, আকর্ষণীয় করে কুরআন তিলাওয়াত, যেটা পুরুষ ক্বারীরা করেন। এটা মহিলাদের উচিত নয় যে, পুরুষদের সামনে করবেন। এটা একান্তে নিজের মতো করে করবেন। এটা ইসলামের নির্দেশনা।

প্রশ্ন: ৬৩। কালো পোশাক পরে নামায পড়া যাবে কি না? কালো পোশাককে হিজাব হিশেবে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর: কালো পোশাকে নামায হবে না বা কালো পোশাকে বোরখা হবে না– এটা বড় অদ্ভুত কথা শুনলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের ব্যাপারে বলেছেন, সকল প্রকারের রঙ তাদের জন্যবৈধ, কোনো রঙের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সব রঙের সব পোশাক তারা পরতে পারেন। আর পুরুষদের জন্য কড়া রঙের পোশাক পরতে অনেক সময় নিষেধ করেছেন, (বিশেষত) কড়া লাল ধরনের। তবে মেয়েদের জন্য সবরকমের রঙের পোশাক বৈধ। কালো পোশাক অনেক দেশে বেশি রিকমান্ডেড করা হয়। কারণ কালো পোশাকটা কোনো সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে না। এজন্য বোরকার জন্য কালো পোশাকের ব্যবহার মধ্যপ্রাচ্যে খুবই প্রসিদ্ধ। বরং মধ্যপ্রাচ্যে অন্য কোনো রঙের পোশাক বোরকা পরলে সেটাকে খুব অড বা অস্বাভাবিক মনে হয়। তবে মূল কথা হল, যে কোনো রঙের পোশাক মুমিন মেয়েরা পরতে পারেন, এখানে শরীআতের কোনো নিষেধ নেই। (সম্ভবত, আমাদের দেশে কালো একটা শোকের আবহ তৈরি করে দিয়েছে, হয়তো এই কারণে কেউ কিছু বলেছে...) রাসূলুল্লাহ ﷺ

নিজেও কালো পাগড়ি পড়তেন, কালো জুব্বা পরতেন, মেয়েদের জন্য সবার জন্যেই কালোটা যে শোক, এই শোকটা অন্য লাইনের শোক, অর্থাৎ আমাদের ইসলামি লাইনের শোক না। এটা আমরা আমাদের দেশে মনে করি। والله اعلم

প্রশ্ন: ৬৪। বৃদ্ধ লোকদের জন্য কালো খেযাব কিংবা অন্যকে রঙের খেযাব ব্যবহার করার হুকুম কী? যুবকদের অসুস্থতা বা কোনো কারণে চুল সাদা হয়ে গেলে কালো খেযাব ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বিভিন্নভাবে অনেকগুলো হাদীসে, আবু দাউদের একটি হাদীস রয়েছে, কেয়ামতের আগে আমার উম্মতের অনেকে কবুতরের লেজের মতো করে কালো খেযাব করবে, চুলগুলোকে কালো বানিয়ে ফেলবে। ওরা জান্নাতের খুশবু পাবে না।[১] অর্থাৎ এটা পাপ। এই পাপের জন্য শাস্তি পাবে। আবু বাকর ﷺ এর আব্বা আবু কুহাফা যখন মক্কা বিজয়ের দিনে তার কাছে আনা হল, তখন তার চুলগুলো সাদা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওকে খেযাব দাও। কিন্তু কালো লাগাবে না। এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কালো রং ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। এর ভেতরে অনেকগুলো প্রতারণা রয়েছে। যেমন আমি বুড়ো হয়েছি, কালো খেযাব লাগিয়ে জওয়ান সাজলাম। এটা ইসলাম পছন্দ করে না। আপনি আপনার সৌন্দর্য বাড়ান কিন্তু নিজের বয়স গোপন করা কিংবা নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা, ইসলাম এটার বৈধতা দেয় না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

তরুণদের ক্ষেত্রে যাদের অল্প বয়স, হয়তো রোগের কারণে বা অন্য কোনো কারণে চুল পেকে গিয়েছে, আমরা তাদেরকে বলব, নিজের অবস্থা মেনে নিতে। কালো বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো রং ব্যবহার করে খেযাব দিতে। অনেক আলিমকেও দেখা যায় খেযাব ব্যবহার করতে। এক্ষেত্রে তারা দুটো বিষয় বলেন, কোনো কোনো সালফে সালিহীন,

১. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২১২।

সাহাবিদের ভেতরে, তাবিয়িদের ভিতর কেউ কেউ কালো ব্যবহার করেছেন। আরে বলতে, চান অমুক করেছেন তমুক করেছেন। এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেওয়ার পরে এক্ষেত্রে আর কারো আমল চলে না। আমরা বলব, তিনি করতেন তিনি হয়তো জানতেন না। অথবা তিনি কোনো ওযরে করেছেন। তার বিষয়ে আল্লাহ জানেন। তার অগণিত নেক আমলের কারণে আল্লাহ তার এটা মাফ করে দিতে পারেন। অথবা তিনি জানতেন না। কিংবা তার ইজতিহাদি ভুল হতে পারে। কিন্তু তার দলীল দিয়ে আমরা করতে পারি না। এরকম যদি করি তাহলে দীনের কিছুই থাকে না।

দ্বিতীয়ত, অনেক আলিম বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে দাড়ি কালো করা যাবে, যেন শত্রুরা বুঝতে পারে, এরা জওয়ান। এটা কোনো কোনো আলিমের মত। আর তারপরও তারা বিশেষ ক্ষেত্রে এটা বলেছেন। এ কারণে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধ অমান্য করতে পারি না। তৃতীয় বিষয় হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا.

তোমাদেরকে যখন কোনো কাজের আদেশ দেব, ততটুকু সাধ্যমত করো, নিষেধ করল আর কখনোই করবে না।২ এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন; আমার মন কীভাবে ওখানে যায়? শুয়োরের গোশত খাওয়া আল্লাহ আল্লাহর রাসূল নিষেধ করেছেন, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন বাধ্য হলে খাবে। তারপরও আমার মন তো বলবে যে খাব না, মরে গেলেও আমি ওটা গালে দেব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা জিনিস নিষেধ করেছেন, আর আমি কেন ওটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জায়িয করতে যাব? বরং যে কোনোভাবে আমরা ওটাকে বর্জন করার চেষ্টা করব। আর এটা খারাপ দেখায়। যখন কোনো বয়স্ক মানুষ দাড়ি কালো করেন, তখন এটা বোঝা যায়। আর এটা তো আমাদের সৌন্দর্য। আমাদের বয়সকে

---

২. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২; সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৩৭।

তিনি সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। এটা একটা গাম্ভীর্য!

প্রশ্ন: ৬৫। মেয়েরা মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন কি না?

উত্তর: রাসূল ﷺ বলেছেন:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

কোনো মুসলিম মেয়ের জন্য এটা বৈধ নয়, তিনি এক রাত, দুই রাত বা তিন রাত ৫০ মাইল দূরে যাবেন অথচ তার সাথে কোনো মাহরাম নেই।[৩] এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ। তিনি এটাকে হারাম বলেছেন। কাজেই এটা আমাদের তো আর হালাল করার সুযোগ নেই। এখন অনেকেই দূরে যান, বাধ্য হয়ে যান, অনেকেই ইচ্ছা করেই যান, মাহরাম থাকে না। আমাদের ঈমানের নূন্যতম দাবি হল আমরা এটাকে অবৈধ মনে করব। এটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বৈধ করার প্রবণতা ঠিক নয়।

৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৩৯।

দুআ/আমল

প্রশ্ন: ৬৬। আমাদের এখানে কেউ অসুস্থ হলে দেখা যায় দুআ ইউনুস এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লক্ষ/সোয়ালক্ষ বার পড়া হয়, তারপর দুআ করা হয়। এটা সুন্নাতসম্মত কিনা?

উত্তর: কেউ মারা গেলে তার জন্য দুআ ইউনুস খতম করা, কালিমা খতম করা– এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, করতে নির্দেশ দেন নি, করতে উৎসাহ দেন নি। কখনোই কোনোভাবে এই বিষয়ক কোনো নির্দেশনা কুরআন বা সুন্নাহয় নেই। এটা অনেক পরে আমাদের সমাজে এসেছে। কেউ স্বপ্ন দেখেছেন, কেউ ভালো বলেছেন। বিতর্ক না করে আমরা একটা চিন্তায় পৌঁছাতে পারি কি না, সেটা হল, আমাদের ইসলামের সর্বোচ্চ মডেল مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণ আমাদের সর্বোচ্চ মডেল। সমাজে যেগুলো আছে, কিছু ভালো কিছু মন্দ, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিদের কর্ম চিন্তা চেতনা হুবহু অনুসরণ করাটা উত্তম। অন্তত এই মূলনীতিতে আসলে, আমি আপনাদের বলব যে, আমরা এইসকল অনুষ্ঠানগুলোকে যদি সুন্নাহর ভেতরে নিতে পারি, অর্থাৎ কেউ মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিরা কখনোই আনুষ্ঠানিক দুআ করেন নি। তাঁরা ব্যক্তিগত দুআ করেছেন, দান করেছেন, পারলে সদাকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ বড় একটা টাকা স্থায়ী দান, একটা জমি অথবা জায়গা অথবা মসজিদের কোনো ঘর কামরা করে দেওয়া, স্থায়ী কোনো কাজ পিতামাতার নিয়াতে করা, এসব করেছেন।

তাহলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত এটার সাওয়াবটা পেতে থাকবেন। আর না হলে অস্থায়ী দানও করতে পারেন। আপনি কিছু খাবার বা গরু ছাগল কিনে মসজিদ মাদরাসা ইয়াতীমখানায় দিয়ে দিলেন, তারা খেল, আপনি সদাকার সাওয়াব পাবেন। কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো একে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সুন্নাতের বাইরে যেটা আমল করা হবে, সেটা কবুল হবে না, কোনো সাওয়াব হবে না। আমাদের পেট ভরবে, সমাজে সুনাম হবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে আমরা এর কোনো সাওয়াব পাবো না। দুই নম্বর কথা হল, এই আনুষ্ঠানিকতার নামে আমরা অনেক সময় সামাজিকতা করি, অনেক সময় লোক দেখানো হয়, গুনাহ হয়ে যায়। এজন্য আমরা এসব টাকাগুলো ইয়াতীম গরীব বিধবাদের দান করব, সদাকার সাওয়াবটা পিতামাতার জন্য নিয়ত করব। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।

প্রশ্ন: ৬৭। আযানের সময় একসাথে বিভিন্ন মসজিদে আযান শোনা যায়। এক্ষেত্রে যে কোনো একটির উত্তর দিলেই হবে, নাকি সবগুলোর উত্তর দিতে হবে?

উত্তর: আযানের জবাব দেওয়ার বিষয়টা আমাদের প্রাত্যহিক একটা আমল। যেটা অনেকেই করেন– আযানের জবাব বিভিন্ন মসজিদ থেকে শোনা গেলে কীভাবে দেবেন? এটার আগে আমি একটু পেছনে যেতে চাচ্ছি। সেটা হল, ইসলামে আযান একটা অলৌকিক বিষয়। সকল ধর্মেই ধর্মীয় ইবাদতের সময় ঘোষণার জন্য কিছু ব্যবস্থা আছে। কেউ সিঙ্গায় ফুঁক দেন, কেউ ঘণ্টা বাজান, কেউ আগুন জ্বালিয়ে দেন। এটাতে মানুষ সবাই বুঝতে পারে। ইসলামের আযানটা শুধু বোঝা না। ইসলামের সবচেয় শ্রেষ্ঠ কথাগুলো, ঈমানের সবচে বড় কথাগুলো আযানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এটা আকাশে বাতাসে প্রতিটি মুমিনের মনে, সৃষ্টির কানে এই সবচে সুন্দর কতগুলো চলে যায়।

আসলে এখানে শুধু ডাকার ব্যাপার নয়। আমি ডাকছি। কেউ আগুন দেয়, কেউ ঘণ্টা বাজিয়ে, কেউ সিঙ্গাই ফুঁক দিয়ে ডাকছেন। কিন্তু অর্থ নেই, তাৎপর্য নেই। শুধু একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু এখানে জানার পাশাপাশি ঈমানের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্যগুলো আমরা দিচ্ছি। যেমন অনেক ধর্মেই নমস্কার দেওয়া হয় বা সম্ভাষণ করা হয়। এটা মূলত শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। ইসলামে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ দুআটা করা হয়। এই যে মহান বাক্যগুলো মুয়াযযিন বলল, আমি বলতে পারলাম না, এটাতো আমার একটা কষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

যদি কেউ মুয়াযযিন যা যা বলে সে কথাগুলো ইয়াকিন থেকে অন্তর দিয়ে বলে তার গুনাহগুলো মাফ করা হবে, তার জন্য জান্নাত বরাদ্দ করা হবে।[১] এজন্য আযানের জবাব দেওয়া আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যেটা শুনব, আমরা বলব। তবে চেষ্টা করব ইয়াকিনের সাথে কথাগুলোর অর্থ অনুভব করে। তাহলে এর পূর্ণ সাওয়াবটা পাব।

এই ক্ষেত্রে যখন একাধিক মসজিদে আযান হবে তখন আমরা যে কোনো একটা মসজিদের আযানের জবাব দেব। হয় প্রথম যেটা শুরু করেছি ওইটাই শেষ করব। অথবা আমি জানি গ্রামের মধ্যে মসজিদের, মহল্লার মসজিদে আযানটা একটু পরে হবে ওইটাই জবাব দেব। যেকোনো একটার দিলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

১. সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৭৪।

সুদ/ঘুষ/ব্যবসা

প্রশ্ন: ৬৮। আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করছি। আমার পরিবারিক কিছু অসচ্ছলতাও রয়েছে। পারিবারিক সচ্ছলতার জন্য এবং নিজের লেখাপড়া সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি ছোট্ট একটা ব্যবসাও করার নিয়ত করেছি। কিন্তু ব্যবসার জন্য আমার কিছু পুঁজি দরকার। আর সেই পুঁজিটা আমি ব্যাংক থেকে আনতে চাচ্ছি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাকে চড়া হারে সুদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমি কী করব? আমি কি সুদ দিয়ে ব্যবসাটা করব?

উত্তর: সুদের ব্যাপারে প্রথম বিষয় হল, অধিকাংশ সময় সুদ দিয়ে ব্যবসা করে সুদ শোধ করা কঠিন। এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। মানুষ ক্রমেই সুদে জড়িয়ে পড়ে। এটা হল বাস্তব। দ্বিতীয় কথা, আল্লাহ তাআলা শরীআতে সুদ হারাম করেছেন। শরীআহভিত্তিক সুদের বিনিময়ে পণ্যের কেনাবেচার কিছু পথ আছে, যেটা ইসলামিক ব্যাংক নামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বে আছে। যারা সরাসরি নগদ টাকা না দিয়ে কিছু পণ্য কিনে দেয়, এর উপরে লাভ নেয়। এটা শরীআত সমর্থন করে। সমর্থন নয়, অনুমোদন করে। এই ধরনের কোনো অর্থ লগ্নিকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যদি তিনি নিতে পারেন সেটা ভালো। তা না হলে, বিশেষ করে ছাত্র জীবনে সুদ নিয়ে, ব্যাংকের সুদ নিয়ে অথবা এনজিও সুদ নিয়ে ব্যবসা করে কেউ সুদমুক্ত হতে পেরেছে, এরকম ঘটনা দেখা যায় না। এর থেকে বেঁচে থেকে কায়িক শ্রমও করা আমাদের জন্য অনেক ভালো।

প্রশ্ন: ৬৯। আমেরিকাতে আমরা ক্রেডিটকার্ড নিয়ে ব্যবসা করি এবং সেখানে সুদের কথা উল্লেখ থাকে। যদি লেনদেনটা স্বাভাবিক থাকে তাহলে সুদ দিতে হয় না। লেনদেন যদি অনিয়মিত করা হয় তখন সেখানে সুদ দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কার্ড নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে কি না?

উত্তর: এখানে মূল বিষয় হল, সুদ দেয়া নেয়া করা যাবে না। সুদমুক্তভাবে যদি আমরা লেনদেন করতে পারি তাহলে বৈধ হবে। বিভিন্ন রকমের ক্রেডিটকার্ড ডেবিটকার্ড আজকাল হয়েছে, অনেক কোম্পানি অনেকভাবে এগুলো করে। প্রশ্নকর্তা যেটা বলেছেন, অর্থাৎ কেউ যদি যদি লেনদেন অনিয়মিত করে, তাহলে তার উপর সুদ প্রযোজ্য হবে। নইলে কোনো সুদ চাপবে না। সে ক্ষেত্রে স্বভাবতই বৈধ হওয়ার কথা। এখানে কোনো অবৈধ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

প্রশ্ন: ৭০। একভাই প্রশ্ন করেছেন, আমি একটি অফিসে চাকরি করি। চাকরি করতে গিয়ে আমি অসাবধানতাবশত ঘুষ নিয়ে ফেলেছি এবং সেটা আমার সম্পদের সাথে মিশে গিয়েছে। এখন আমি কীভাবে এই দায় থেকে মুক্ত হতে পারি?

উত্তর: প্রথমত ঘুষের সংজ্ঞাটা আমাদের বুঝতে হবে। ঘুষ হল, যে কর্মের জন্য আমি সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে টাকা পাচ্ছি, সেই সেবার জন্য সেবাগ্রহীতা বা অন্য কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করাটাই ঘুষ। বখশিশ নামে হোক, উপহার নামে হোক, হাদিয়া নামে হোক, যে নামেই হোক না কেন, শর্ত করে হোক, বিনাশর্তে হোক, সেবা দেয়ার আগে হোক, সেবা দেওয়ার পরে হোক। আমি একটা অফিসে বসে থেকে ফাইল সই করা বা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য একটা বেতন পাই। কম হোক বেশি হোক। একজন সেবা নিতে এসেছে। সে সেবা নিয়ে খুশি হল, আমাকে কিছু টাকা দিল। কিন্তু আমি এই সেবাটা দেওয়ার জন্য আগেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেছি। এই সেবাগ্রহীতা বা অন্য কারো কাছ থেকে ওই সেবার জন্য টাকা নেওয়া

হল ঘুষ ।

এই ঘুষ আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে বলেছেন:

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ... وَالرَّائِشَ يَعْنِيْ الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا.

যে ঘুষ নেয়, যে ঘুষ দেয় এবং যে দুজনের মাঝখানে লিংক করে দেয়, যেটা আমাদের সমাজে বিভিন্ন মিডিয়া আছে এরা সবাই আল্লাহতালার অভিশপ্ত।[১] এখন যদি কেউ হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ে, না জেনে, মনের আবেগে। এরকম অনেক মুমিন আছে জীবনের শুরুতে অনেক ভুল করেছেন, এখন অনুতপ্ত। তাদের কাজ হল, প্রথম কথা, যার থেকে ঘুষটা নেওয়া হয়েছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটা হলে হক জায়গামত চলে গেল। এতে আমরা ক্ষমার নিশ্চয়তা পেতে পারি। আর এই ক্ষেত্রে, বান্দার হকের ক্ষেত্রে তার কাছে ফিরিয়ে দিলে, ক্ষমাটা আমাদের জন্য নিশ্চিত।

আল্লাহর কাছে তাওবারও একটা পূর্ণতা এসে গেল। যেটা অনেক সময় পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের ওই টাকাটা, যার থেকে নিয়েছি তার উত্তরাধিকারদের পেলে তাদের হাতে দেব। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব, আশা করা যায় ক্ষমা পাব। না হলে কোনো জনকল্যাণ, মানবকল্যাণে ব্যয় করব এবং আল্লাহ তাআলার কাছে বলব, এই কল্যাণময় কর্মের সাওয়াবটা তাকে দেওয়া হোক, যার হক আমি নষ্ট করেছিলাম। আর আমাকে দয়া করে মাফ করে দেয়া হোক। এটা মাফের নিশ্চিত পথ না হলেও তাওবার একটা বড় অংশ। আমরা অনেক সময় মনে করি তওবা করেছি, আল্লাহ! আর কোনোদিন ঘুষ খাব না। এটা কিন্তু তাওবা নয়। এটা হল শুধু একটা অংশ। যে টাকায় আমি অবৈধভাবে ঢুকেছি, এটা থেকে মুক্ত হওয়াও

---

১. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭০৬৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯০২১, ২২৩৯৯; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৫০৭৬।

তাওবার একটা অংশ। কাজেই আমি জীবন অনেক সুদ খেয়েছি, লক্ষলক্ষ, কোটিটাকা কামাইছি বসে বসে। এখন আর ঘুষ খাই না। এখন আর খাওয়ার সুযোগও নেই। ওটা থেকে আমাকে মুক্ত হতে হবে। আমি হিসাব করব কত টাকা আমি ঘুষে নিয়েছিলাম। এই টাকার জন্য এ বাড়িটা অথবা এই ব্যাংকের এত টাকা আমি দীনি মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে দিলাম। আল্লাহ, আমি মালিককে পাই নি, কিন্তু তোমার মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে দিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। এ সাওয়াবটা অমুককে পৌছে দাও। আশা করা যায় এ তাওবার মাধ্যমে তিনি ক্ষমা পেতে পারেন।

প্রশ্ন: ৭১। ইদানিং রোগীরা যখন ডাক্তারের কাছে যান, রোগীদের প্যাথলজিকাল টেস্টের নামে কিছু অপ্রয়োজনীয় টেস্ট তারা দিয়ে থাকেন। এবং ওইসব জায়গা থেকে তারা কিছু কমিশন পান। এই কমিশন যে তারা নিচ্ছেন রোগীদেরকে কষ্ট দিয়ে, এটা কি হালাল হবে?

উত্তর: রোগীদের কষ্ট না দিয়ে হলেও হারাম। এই কমিশনটা অবৈধ। এটা এমন একটা উপার্জন যাতে আমার কোনো পরিশ্রম নেই। প্রথম কথা হল, এটা আমানতের খেয়ানত। একজন রোগী ডাক্তারের কাছে যান, তাকে ফী দেন। তিনি তার থেকে এমন পরামর্শ চান যেটা শতভাগ রোগীর স্বার্থ দেখে করা হবে এবং ওষুধ লেখা হবে রোগীর স্বার্থ দেখে। সবচেয়ে উপকারী। সবচেয়ে সস্তা সবচেয়ে উপকারী। আমি যখন ডাক্তারকে ফী দিয়েছি, ডাক্তারের সাথে আমার যে চুক্তি তা হল, তিনি আমার স্বার্থের জন্যই তার পরামর্শটা দেবেন। এখানে আর অন্যকোন ব্যক্তির স্বার্থ, তার নিজের বা কোনো কোম্পানির স্বাথ, এটা নাজায়িয অবৈধ খিয়ানত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে তিনি আমানতদার। তাকে আমানত

আদায় করতে হবে।[২] কনসালটেন্টকে আমরা ফী দিয়েছি, তিনি আমার স্বার্থের জন্য পরামর্শ দেবেন। কাজেই তিনি পরামর্শের ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন, আন্দাযে ওষুধ লিখবেন, কোনো কোম্পানির বিশেষ ওষুধ লিখবেন, তিনি জানেন, এর চেয়ে সস্তা ওষুধ আছে, এর চেয়ে আমার উপকারের ওষুধ আছে, তারপর লিখবেন। এগুলো সবই হারাম। আর এর জন্য পয়সা নেওয়াও হারাম। কাজেই আমরা আশা করি, যারা অন্তত দীনদার সৎ ডাক্তার রয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে অনেক পয়সা দিয়েছেন এবং আল্লাহ হালালের মধ্যে বরকত রেখেছেন।

প্রশ্নঃ ৭২। যদি কোনো ব্যক্তি ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয় তাহলে ওই চাকরি থেকে সে যে বেতন পাবে তা তার জন্য হালাল হবে কি?

উত্তরঃ ঘুষের চাকরি দুই পর্যায়ের। একটা হল যোগ্যতা আছে। চাকরির জন্য যে যোগ্যতা বলা হয়েছে তা আমার আছে। কিন্তু ঘুষ না দিলে চাকরি পাব না। হয়তো সাক্ষাৎকারে পাস করলেও চাকরি পাব না। এক্ষেত্রে যারা বাধ্য হয়ে ঘুষ দেন, অর্থাৎ যোগ্যতা আছে, কিন্তু ঘুষ না দিলে চাকরি হবে না, এ ক্ষেত্রে ঘুষ দেয়ার কর্মটা অবৈধ হবে। যদি তিনি মাযুর হন, তবে মহান আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন যে আল্লাহ, বাধ্য হয়ে করেছি, মাফ করে দেন। কিন্তু তিনি পরিশ্রম করে চাকরির উপার্জন করলে তা বৈধ হবে। আর যদি এমন হয়, যোগ্যতা নেই। যোগ্য মানুষের চাকরি নিয়েছেন, তার ঘুষ দেওয়া হারাম, চাকরিও হারাম, ইনকাম হারাম।

২. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৭৪৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫১২৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৮২২।

উলূমুল হাদীস

প্রশ্ন: ৭৩। রমাদান মাসকে আমাদের সমাজে তিনভাগে ভাগ করা হয়। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত।[1] এভাবে তিনভাগে ভাগ করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর: এটা খুব মশহুর (প্রসিদ্ধ)। আমাদের মুসলিম উম্মাহর সকলেই এটা জানেন। তবে এই হাদীসটা সনদগতভাবে খুবই দুর্বল। উলামায়ে কেরাম হাদীস (যাচাই-বাছাই ছাড়া) শুনে শুনে বলেছেন, এটা অবশ্য তাদের দোষ নয়। ক্রুসেড ও তাতার যুদ্ধের পরে যখন মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে গেল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতায় জ্ঞান-গবেষণা অনেক কমে গেল। যে কারণে এই যুগের পরে যে সমস্ত বইপত্র লেখা হয়েছে, উলামায়ে কেরাম অনেক সময় যাচাই-বাছাই না করেই হাদীস লেখেছেন। হাদীসগুলো আগেই সঙ্কলিত এবং সেগুলোর সনদ যে দুর্বল এটাও উলামায়ে কেরাম আগেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আলিমরা সঙ্কলন দেখেই... বাইহাকিতে আছে, লিখে দিয়েছেন। কিন্তু এর সনদ যে বাইহাকি বা অন্যান্য আলিম দুর্বল বলেছেন এটা লক্ষ করেন নি।[2] যে কারণে হাদীসগুলো আমাদের সমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। হাদীসটা সনদগতভাবে দুর্বল।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, হাদীস কী করে দুর্বল হয়? আসলে, হাদীস

---

১. সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৮৮৭; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৬০৬১।

২. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-৩৩৩৬; আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২/২৬২-২৬৪।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা। এটা সঙ্কলন করা হয় সাহাবি, তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়িদের যুগে। যেমন, কোর্টে একটা লোক সাক্ষ্য দিল যে, ওই লোকটা খুন করেছে। খুন করেছে বললেই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। ক্রস করা হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, লোকটা কেমন, সৎ কি না। উনি দেখেছেন কি না, কার কাছে দেখেছেন, ওই সময় লোকটা কীভাবে ওটা করেছিল। যখন বিচারক নিশ্চিত হন যে, সে সত্যই দেখেছে, তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মুহাদ্দিসরা রাবীদের হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন করতেন। তাকে বিভিন্ন ক্রস প্রশ্ন করে যখন নিশ্চিত হয়েছেন তখন তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সঙ্কলনের সময় সহীহ যয়ীফ সবই গ্রহণ করেছেন, পাশাপাশি ক্রস ইগজামিন করে যেগুলো সহীহ সেগুলো সহীহ বলেছেন, যেগুলো দুর্বল সেগুলো দুর্বল বলেছেন।

প্রশ্ন: ৭৪। জাল হাদীস নির্ভর দাওয়াতের ব্যাপকতা হাদীসের প্রতি সাধারণ মানুষ ও মুসলিমদেরকে বিমুখ করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে আমাদের সমাধান কী?

উত্তর: সমাধান হল, আমরা সহীহ হাদীস নিয়ে সমাজে বেরিয়ে পড়ব। এটা হল সমাধান। আমরাও যদি কাউকে বলি, তোমার এটা ভালো না, তোমার ওটা ভালো না, তুমি ভুল, তুমি অন্যায় করছো– আপনি শতবার বলেন, তারা ওটা ত্যাগ করবে না। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এজন্য আমাদের বিকল্প কর্ম করতে হবে। আমাদের খুব দরকার হল, সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক অরাজনৈতিক দাওয়াতকে ময়দানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটা যখন আমরা করব, অর্থাৎ যারা জাল হাদীস ভিত্তিক দাওয়াত দিচ্ছেন, তাদের জন্য যদি শতকোটি টাকার বই লিখি, সেই বইগুলো বই-ই থাকবে। কারণ তারা ময়দানে বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছেন, আর আমি তো বই লিখে লাইব্রেরিতে রেখে দিয়েছি। বড়জোর কেউ একজন কষ্ট করে কিনে বইটি পড়তে পারে। আমাদের যেটা করতে হবে, নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ না দেখিয়ে পজেটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে, সহীহ হাদীস নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে চলে যাব। মুসলিম দুই প্রকার। ১০ থেকে ১৫ পার্সেন্ট মুসলিম দীনের ব্যাপারে আগ্রহী। দীন জানতে চায়, ওয়ায মাহফিলে যায় অথবা টিভির সামনে বসে

অথবা মসজিদে যায়। আর বাকি প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ মুসলিম জানতে চায় না। এরা বেতলব, বেখবর। আমরা যদি এই বেতলব মুসলিমদের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিতে না পারি, তাহলে উম্মাতের অবস্থা ভালো না। খ্রিস্টান হয়ে যাবে অচিরেই। কাজেই আমাদের কথা হল, আমরা সুন্নাহনির্ভর দাওয়াত তৈরি করি প্রত্যেকেই। অর্থাৎ আপনার মসজিদ থেকে প্রতি সপ্তাহে একদিন দুইদিন আপনি বেরিয়ে পড়েন। দোকানগুলোতে যান, বলেন, ভায়েরা আসলাম, নামাযে যাবেন। এই ব্যাপারটা 'আমরু বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার'। কাফেলা তৈরি করতে না পারলেও প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিন, দুয়েকদিন পরপর আমরা যদি মসজিদগুলো থেকে দাওয়াতে বের হই। বেনামাজি, বেতলব, একেবারেই দ্বীনবিমুখ নারী-পুরুষদের দীনের দাওয়াত দিতে হবে। কাজেই সুন্নাহনির্ভর দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে না গিয়ে শুধু সমালোচনা করে কিছুই করা যাবে না।

প্রশ্ন: ৭৫। আমরা কীভাবে হাদীসের গুরুত্ব প্রচার করব?

উত্তর: হাদীসের বিষয়ক প্রচার করতে হাদীস বিষয়ক যেসব মিথ্যা প্রচারণা, এসব বুঝতে হবে। হাদীস ছাড়া ইসলাম পালন সম্ভব না এবং হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আলিমদের গবেষণা কেমন ছিল, এ বিষয়গুলো আমরা একটু হৃদয় দিয়ে বুঝলে খুব সহজে বলতে পারব। এ বিষয়ে গবেষণা আছে। মাওলানা মওদুদি রাহিমাহুল্লাহর হাদীসে রাসূলের আইনি গুরুত্ব নামে একটা বই আছে। ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রফেসর ড. আব্দুল মাবুদের একটা বই আছে। আমার **হাদীসের নামে জালিয়াতি** বইটাতে আমি কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন: ৭৬। হাদীস সংরক্ষণের দলীল কোথায় পাওয়া যায়?

হাদীস সংরক্ষণের দলীলের বিষয়ে আরবিতে অগণিত বই আছে। সংক্ষেপে আমার **হাদীসের নামে জালিয়াতি** বইটা পড়তে পারেন। সেখানে অনেক তথ্য পাবেন।

বিদআত

প্রশ্ন: ৭৭। আমরা ইবাদতের নামে অনেক সময় বাড়িয়ে ইবাদাত করতে খুব পছন্দ করি। মজা লাগে। যেটাকে আমরা বিদআত বলে জানি। অনেক আলিম এটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, বিমানে চড়া কি বিদআত? এটা করা কি বিদআত? বিদআতের আসল সংজ্ঞা বা মিনিংটা কী?

উত্তর: দীনের ভেতরে বাড়াবাড়ির তিনটা দিক আমরা বলেছি। অর্থাৎ আকীদায়, নিজের আমলে, অন্যের কাছে দীন পৌঁছানোয়। আর এই বাড়াবাড়িটাই মূলত বিদআত। বিদআত হয় কখন? বিদআত হয় যখন, দীনের ভেতরে এমন কিছু সংযোগ করা হয়, যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি। আপনি যেটা বললেন, প্লেনে চড়া কি বিদআত? আসলে প্লেনে চড়াকে কেউ বিদআতের ভেতরে মনে করে না। বিষয় হল, বিদআত রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর কাছে একটু সারেন্ডার করি, তাহলে বুঝ হয়ে যায়। বিদআত হল রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেন নি বা যেভাবে করেন নি সেটাকে দীনের ভেতরে ঢোকানোর মাধ্যমে দীনের কিছু বাড়িয়ে দেওয়া। আমরা প্লেনে চড়ি, এটা দীন কি না?! অর্থাৎ কেউ কি মনে করে, প্লেনে চড়ে না গেলে হজ্জের সাওয়াব কম হবে? এটা মনে করে না। তাহলে এটা দীনের ভেতরে কোনো বিদআত না। কেউ যদি এরকম মনে করে, তবে ওটা বিদআত। বিদআতের ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় হাদীসে এসেছে। হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

[আমাদের এই কাজের মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।][১]

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

[যে ব্যক্তি এমন কর্ম করল যে বিষয়ে আমাদের কর্ম নেই তা প্রত্যাখ্যাত।][২]

এই নতুনত্বটা দীনের ভেতরে (فِيْ أَمْرِنَا) হতে হবে। দীনের বাউন্ডারির বাইরে যত নতুনত্ব, এটা বিদআত নয়।

দুই নাম্বার কথা: এর ভেতরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিদের যে কর্ম রয়েছে তার বাইরে হতে হবে। এর পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'রদ' কথাটা থেকে আরেকটা ব্যাপার বোঝা যায়। যে কর্মের পেছনে সাওয়াবের চিন্তা আছে এটা শুধু বিদআত হবে। অতএব, সে সাওয়াবের আশায় করেছে, আল্লাহ সেটাকে রিজেক্ট করে দিয়েছেন। আর যেখানে সাওয়াবের আশা নেই ওটা তো বিদআতই হচ্ছে না। চতুর্থ আরেকটা বিষয় আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার হাদীস শরীফে বলেছেন:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

প্রত্যেক বিদআতই বিভ্রান্তি।[৩] তার অর্থ হল বিদআত মূলত কর্ম নয়, মনের ব্যাপার। চিন্তার, বিশ্বাসের ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেটা বলছেন, দালালাত, বিভ্রান্তি। এটা চিন্তার জগতের ব্যাপার, কর্মের জগতের না। যেমন, মনে করেন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'তাসবীহ-তাহলীল' করছি। এটাকে কেউ বিদআত বলবে না। আমি বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতে পারি। আমি কুরআন

১. সহীহ বুখারি, হাদীস-২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭১৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৪।
২. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭১৮; সহীহ বুখারি ৩/৬৯, ৯/১০৭।
৩. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪২।

তিলাওয়াত করতে বসেছিলাম। করতে করতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছি। এটাকে কেউ বিদআত বলবে না। কেউ বলবে না দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। কিন্তু ধরুন, একজন লোক এই দাঁড়িয়ে জিকির বা তিলাওয়াতকে ইবাদত মনে করে। প্রথমে, সে বসেছিল। কুরআন তিলাওয়াতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল যে, দাঁড়িয়ে পড়লে কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব বেশি হবে। কুরআনের আদব হবে। সে একটা দলীল দিল যে, আমরা সালাত আদায় করি, নফল সালাত বসে পড়লে অর্ধেক সাওয়াব, দাঁড়িয়ে পড়লে পূর্ণ সাওয়াব। আর নফল সালাতে দাঁড়িয়ে তো আমরা কুরআনই পড়ি। তার মানে এভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই আল্লাহ এই সাওয়াবটা ডাবল দিচ্ছেন। তার মানে কুরআন দাঁড়িয়ে পড়লে ডাবল সাওয়াব। এই সুস্পষ্ট যুক্তি দিয়ে, দলীল-প্রমাণ দিয়ে সে দাঁড়ানোটাকে কুরআন তিলাওয়াত নামক ইবাদতের একটা অংশ মনে করল। সাওয়াব মনে করল। এ মনে করাটা কিন্তু বিদআত, গোমরাহি, দলাল, পাপ। সে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়ছে, এটা কিন্তু পাপ ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের ভেতর দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে পড়াটা বেশি সওয়াবের বলেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানোটাকে কোনো গুরুত্ব দেন নি। বরং বসে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে পড়া একই রকমের বিষয়। অধিকাংশ বিদআত মূলত জায়িয। অর্থাৎ শরীআতে বৈধ।

কিছু বিদআত আছে শরীআতে নিষিদ্ধ। যেমন কবরে সিজদা করা, কবর পাকা করা, কবরের গম্বুজ করা। মানুষ এটাকে করেছে, করার পর আবার এটাকে সাওয়াব মনে করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে অধিকাংশ বিদআত বাহ্যিকভাবে বৈধ কাজ। ওই বৈধ কাজটাকে আমরা দীন মনে করার কারণে বিদআত হয়ে যাচ্ছে। যেমন, প্লেনে চড়ে হজ্জে যাওয়া। আমরা যাই, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কেউ যদি মনে করে, প্লেন থাকতে লোকটা রকেটে গেল। প্লেন থাকতে

লোকটা বাসে গেল। ওর বোধহয় সাওয়াবটা কম হয়ে গেল। এই চিন্তার কারণে..., এই চিন্তাটা বিদআত।

প্রশ্ন: ৭৮। বিদআতের আমল যাদের মধ্যে আছে তারা এটার গ্রহণযোগ্যতার জন্য একটি যুক্তি উপস্থাপন করেন, সব জিনিসই যদি বিদআত হয়, তাহলে এই যে আধুনিক প্রযুক্তি, আমরা প্লেনে চড়ে হজ্জে যাই, আমরা বিল্ডিং বানাই, যত টেকনোলজি রয়েছে, সবই বিদআত হয়ে যাবে। আসলে মৌলভিরা বোঝে না, তাই এসব বলে। তাহলে আসলে কোনটা বিদআত এবং কোনটা বিদআতের বাইরে?

উত্তর: আমরা জানি আল্লাহ তাআলার ইবাদতে শরীক করলে শিরক হয়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুআতে শিরক করলে বিদআত হয়। এটা বুঝতে হবে, যে কাজ নবীর থেকে নিতে হয় সে কাজ অন্য কারো থেকে নিলেই শিরক হয়, শিরক ফিন নুবুওয়াহ! এটার নাম বিদআত। যেটা নবীর থেকে নিতে হবে না, দুনিয়ার কাজ, এখানে কোনো বিদআত হয় না। এটা বুঝতে হলে, আমাদের নিজেদের জীবনের কর্মগুলোকে বুঝতে হবে। বিদআত বলতে, যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা করেন নি, সেটাকে দীনের অংশ মনে করা। কেউ যদি প্লেনে চড়ে হজ্জে যায়, সে এটা বিশ্বাস করে না যে, প্লেনে চড়ে হজ্জে না গেলে সাওয়াব কম হবে। অথবা যে বাসে যাচ্ছে অথবা যে জাহাজে যাচ্ছে তার সাওয়াব কম হচ্ছে। এটাকে কিন্তু সে দীনের অংশ মনে করছেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি আযানের আগে সালাত বা সালাম পড়ছেন, সে ব্যক্তি একই 'ইয়াকিনান' বিশ্বাস করছেন, এইটা না পড়ে যে আযান দিচ্ছে তার আযান এবং দীনের বরকত কম হচ্ছে। এটাকে সে দীনের অংশ মনে করছে। এখানে হল বিদআত ও জাগতিক বিষয়ের পার্থক্য। আমাদের জীবনের কর্ম দুই রকম। একটা হল ইবাদত, আরেকটা হল মুআমালাত। মুআমালাতের ক্ষেত্রে বৃত্তটা প্রশস্ত। সেটা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেটা করেছেন সেটা করা সুন্নাত। যেটা করা নিষেধ করেন নি সেটা জায়িয। জীবনের

প্রয়োজনে করা যাবে, জগতের প্রয়োজনে করা যাবে। তবে দীনের অংশ মনে করা যাবে না। আর যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, সেটা নাজায়িয। আর যেটা ইবাদত, জীবনের প্রয়োজনে করি না, শুধু আল্লাহর খুশির জন্য করি। পানাহার, বাড়িঘর, লাইট, প্লেন– এগুলো তো আস্তিকরাও করে, নাস্তিকরাও করে। এটাকে কেউ দীনের অংশ মনে করে না। কিন্তু যেটা দীন, এটা শেখাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছিলেন। আর আমরা এটা বুঝি। যারা তর্ক করেন তারা বোঝেন। দীনের ক্ষেে্র তারা সুন্নাত হিসেবে যেসব মানেন, সেখানে কেউ কিছু ঢোকালে কিন্তু আবার আপত্তি করেন।

আমরা একটু আগে বলছিলাম, সালাতের ভেতরে সিজদা বাড়ালে আপত্তি করবেন, যদি কেউ টুপি পাগড়ি না পরে হ্যাট পরেন, তারা আপত্তি করবেন। যেগুলোকে তারা সুন্নাত মনে করেন, তার ভেতরে কেউ কিছু ঢোকালে তারা আপত্তি করবেন। বলবেন সুন্নাতের বাইরে যাওয়া যাবে না। এজন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো জিনিস বৃদ্ধি করার নাম হল বিদআত। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবিদের যুগে ছিল না, এমন কিছুকে দীনের অংশ মনে করেন, যেমন আমরা এক মসজিদে গিয়ে দেখলাম মসজিদে এসি লাগানো আমরা ভাবলাম সাওয়াব কম হবে অথবা এসি লাগায় নি, এজন্য সাওয়াব কম হবে। তাহলে এসিকে তারা ইবাদাতের অংশ বানাচ্ছে। এটা কেউ কিন্তু মনে করেন না। তারা জানে এটা জাগতিক ব্যাপার। নামাযে একটু আরামে দাঁড়ানো যায়। এটাকে কেউ ইবাদাতের অংশ মনে করেন না। এক জায়গায় আমরা নামাযে ঢুকলাম, সেখানে তারা ইকামাতের পর সবাই দাঁড়িয়ে কয়েক বার দরূদ ও সালাম পড়ে নিচ্ছেন, এটাকে কিন্তু তারা ইবাদতের অংশ মনে করছেন। আল্লাহ পাকের তাকাররুবের (নৈকট্যের) অংশ মনে করছেন। আল্লাহর নৈকট্যের জন্য যা কিছু শিক্ষা, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিতে হবে। আর দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি বলে দিয়েছেন:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা বেশি জানো।৪ গবেষণা করো, কিন্তু হারামের বাউন্ডারির ভেতরে থাকবে।

যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শিখতে হবে, আল্লাহর নৈকট্যের পথ, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ, আল্লাহ যেটা করলে খুশি হবেন, সেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারো থেকে কিছু করলে, অন্য কাউকে এখানে নিয়ে আসলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি জানার পরেও সেটাকে দীন মনে করলে তা বিদআত, এটার অর্থ হচ্ছে সুন্নাতকে অপছন্দ করা।

প্রশ্ন: ৭৯। বিদআত সম্পর্কিত আলোচনা অনেকে শুনতেও চান না। অনেকেই মনে করেন, এই আলোচনাগুলো আমাদেরকে দীন থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

উত্তর: কোনো কিছুকে বিদআত বলে চিত্রিত করা আমাদের কাজ না। আমাদের কাজ সুন্নাতকে যিন্দা করা। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাহমতো আমল করা। যে ব্যাপারে ভাই প্রশ্নটা করেছেন, এই অতিরঞ্জনের সীমাটা কী? সীমাটা হল রাসূলুল্লাহ ﷺ। সীমালঙ্ঘন হল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীমাকে লঙ্ঘন করা। লঙ্ঘনটা আমরা একটু বুঝি– রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত কম পালন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কম বকা দিয়েছেন। আর সীমা ছাড়িয়ে বেশি করলে বেশি বকা দিয়েছেন। ব্যাপারটা মজার। তাহাজ্জুদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটা প্রিয় সুন্নাত। দীনের গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত। কেউ যদি তাহাজ্জুদ মোটেও না পড়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নরম করে বলেছেন:

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ.

আবদুল্লাহ খুব ভালো ছেলে, যদি রাতে একটু তাহাজ্জুদের সালাত পড়তো!৫ রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন চার ঘণ্টা পড়েছেন। অনেক সাহাবি

৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৬৩।

৫. সহীহ বুখারি, হাদীস-১১২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৭৯; মুসনাদ আহমাদ,

সারারাত পড়তে চেয়েছেন। যারা সারারাত পড়তে চেয়েছে, তাদেরকে এমন বকা দিয়েছেন... । এটা আমার সুন্নতের ব্যতিক্রম...

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

যে আমার সুন্নতকে কম মনে করল, ছোট মনে করল, সে আমার উম্মত না।৬ বিদআতে লিপ্ত হলে সুন্নাতটা ছোট মনে হয়। সুন্নাত মুতাবিক আযান 'আল্লাহু আকবর' দিয়ে শুরু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দিয়ে শেষ। এটাতে তৃপ্তি হচ্ছে না। আগে কিছু, পরে কিছু না যোগ করতে হচ্ছে! আরো মজার ব্যাপার আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুরুদ পড়তে বলেছেন আযানের পরে। আযানের পরে দুরুদ পড়লে তৃপ্তি হচ্ছে না আগে কিছু না পড়লে। তার মানে আমার ক্ষুধাটা সুন্নাতের ভেতরে নেই। আমার মনটা সুন্নাতে তৃপ্ত হচ্ছে না। সুন্নাতটা আমার কাছে অসম্পূর্ণ। আর এইটার নামই হল সুন্নাতে অবজ্ঞা করা। এটাতে আমাদের ঈমানটা দুর্বল হয়ে যায়। বিদআতের মজাটা হল, অবৈধ প্রেমের মজার মতো। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের মজার চেয়ে অবৈধ প্রেমে সাময়িক মজা বেশি লাগে। কিন্তু এটার ভেতরে কোনো শান্তি নেই ।

প্রশ্ন: ৮০। আমাদের এলাকায় কিছু মসজিদ আছে, যে মসজিদগুলোতে আযান দেয়ার আগে মুয়াযযিন সাহেব 'আসসালামু আসসালাতু ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালামু আসসালাতু ইয়া হাবীব আল্লাহ'– এই ধরনের কিছু বাক্য বা কালিমা বলে। এরপরে তারা আযান শুরু করে। এটা একটি রসম বা প্রথায় পরিণত হয়েছে। এটা কতটুকু সুন্নাহসম্মত?

উত্তর: দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাহর গুরুত্বটা আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে। আমরা বারবারই দর্শকদেরকে বলি, আমাদের ঈমান হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ইবাদত করব একমাত্র আল্লাহর এবং ইবাদতটা কীভাবে করব, এটা শিখব একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ থেকে।

হাদীস-৬৩৩০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৯১৯।

৬. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪০১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩২১৭।

আযান একটা ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে শিখিয়েছেন, সাহাবিরা তা পালন করেছেন, যুগযুগ ধরে তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়ি সবাই এগুলো পালন করেছেন। আমরা যখন সাহাবিদের যুগে যাব, তখন দেখব, তারা আযান শুরু করেছেন, 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে আর আমরা আযান শুরু করছি সালাত এবং সালাম দিয়ে। তাহলে আমাদের আযানের সাথে তাদের আযান মিলল না। তাদের আযানটা যদি ষোলআনা আল্লাহর মাকবুল হয়, তবে আমাদেরটা আঠারোআনা হয়ে গেল। আমাদের আঠারোআনাকে যদি ষোলআনা ধরি, তাদের ইবাদতটা চৌদ্দআনা বা বারোআনা হয়ে গেল। আমরা মনে করছি, আমরা আল্লাহর বেশি প্রিয় হতে চাচ্ছি, তাদের চেয়ে। আর এটার নামই বিদআত। যখন কোনো মুসলিম এমন কোনো আমল করে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা করেন নি এবং এটাকে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিদের চেয়ে বেশি উত্তম মনে করেন। এর অর্থ হল তাদের আমলটাকে ছোট মনে করা। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

যে আমার সুন্নাতকে ছোট মনে করল বা অসম্পূর্ণ মনে করল, এর চেয়ে অন্য কিছু ভালো হতে পারে মনে করল, সে আমার উম্মত থাকল না।[৭] আরো একটা মজার ব্যাপার আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আযান দেওয়া শিখিয়েছেন 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে এবং আযানের পরে দরূদ পড়তে বলেছেন। এই বিদআতের মাধ্যমে আযানের পরে দরূদ পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যারা করেন তারা এক্ষেত্রে যুক্তি দেবেন, আযানের আগে দরূদ সালাম তো নিষেধ না। একটা ভালো কাজ।

ভালো কাজে ধারণাটা আবার আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। একজন মানুষ সালাত আদায় করছে। প্রত্যেক রাকআতে চারটা ছয়টা আটটা করে সিজদা করছে। আমরা সবাই একমত যে, সালাতের সিজদা ভালো কাজ। কিন্তু আমরা এটা রিকমেন্ড করব কি না। কখনোই করব

৭. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪০১।

না। কিন্তু কেন? এখন কেউ যদি বলে কোনো হাদীসে কি নিষেধ আছে যে, এক রাকআত সালাতে চারটা সিজদা করা যাবে, না দুটোর বেশি করা যাবে না? আমরা নিশ্চিত কোনো হাদীসে নিষেধ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, এটাই একমাত্র ডকুমেন্ট। এখন আমি অনেক যুক্তি দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, কিন্তু নিষিদ্ধ করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, কারণ তাঁর দরকার ছিল না। তিনি মাসুম ছিলেন। সাহাবিদের গুনাহ কম ছিল। আমরা অনেক গোনাহগার। যত বেশি গুনাহ ততবেশি সিজদা। কারণ সিজদায় গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন তোমরা সিজদা করো আর কাছে এসো।[৮] কারণ আমরা যেহেতু বেশি গুনাহগার, এজন্য আমরা দুই সিজদার জায়গায় চার সিজদা করব। এই যুক্তি আমরা মানব না। না মানার কারণ কারোর কাছে এটা সুন্নাতের খেলাফ। আর অধিকাংশের কাছে এটা প্রচলন নেই তাই। কিন্তু প্রচলিত হয়ে গেলে কিন্তু তিনি প্রচলন এর পক্ষে যুক্তি দেবেন। এজন্য ভাই, আমাদেরকে প্রচলন নয় সুন্নাত দেখতে হবে। দ্বিতীয় কথা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ইবাদত শেখান..., যেমন দরূদ পড়া খুব ভালো কাজ, কিন্তু তাই বলে আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বাধার আগে কয়েকবার দরূদ পড়ে নেব কি না? সালাম ফেরানোর পর কয়েকবার দরূদ পড়ে নেবে কি না? ভালো কাজ ততক্ষণ ভালো থাকে যতক্ষণ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত এর ভেতর থাকবে। এটাকে বিশেষ কোনো রীতিতে করতে গেলে আর ভালো থাকে না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

যদি কেউ এমন কোনো কর্ম করে যা আমরা করি না আল্লাহ সেটা কবুল করবেন না, সাওয়াব দিবেন না, রিজেক্টেড হবে।[৯] এজন্য আমরা অনুরোধ করব, আবেগ, যুক্তি বর্জন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিদের কর্ম দেখে তার ভেতরে থাকার চেষ্টা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ

৮. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ সূরা [৯৬] আলাক, আয়াত: ১৯।
৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭১৮; সহীহ বুখারি ৩/৬৯।

বলেছেন, যখন মুয়াযযিন আজান দেবে মুয়াযযিন যা যা বলে, তাই বলো। আযানের পরে তোমরা দরুদ পড়। এরপর তোমরা আমার জন্য অসিলার দোয়া করো।[১০] এগুলো হল সুন্নত ইবাদত। আমাদের সমাজে কিন্তু দরূদ এর আমলটা একেবারে উঠে উঠে গেছে। এজন্য হাদীস শরীফে এসেছে:

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ

যখনই কোন জাতি বিদআত তৈরি করে ঠিক সেই পরিমান সুন্নাত আল্লাহ তাদের থেকে তুলে নেয়।[১১] সুন্নাত মুক্তি, সুন্নাত নাজাত, সুন্নাত সাওয়াব। যখন আমরা একটা বিদআত তৈরি করলাম, তখন ওই পরিমাণ সুন্নত উঠে গেল। আবার আযানের পরের দুআটাও এখানে সুন্নাত। লক্ষ্য করেন, এটা কিন্তু আযানের শব্দ হবে না। এটা নীরবে মৃদু শব্দে হবে। অর্থাৎ আযান যে সাউন্ডে হয় অনুরূপ সাউন্ডে যদি আমরা দরূদ পড়ি তাহলে কিন্তু এটা সুন্নত থাকল না। আযানটা হবে জোরে মাইকের; দরূদটা হবে মৃদু শব্দে আস্তে নীরবে। আযান এর মতন মাইকে এভাবে পড়াও কিন্তু সুন্নাত না।

প্রশ্ন: ৮১। অনেক জায়গায় দেখা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আযান দেওয়ার আগে দরুদ শরীফ অথবা 'আসসালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ' (এ জাতীয়) কিছু একটা পড়ে, এরপর আল্লাহু আকবার বলা হয়। এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখবেন? এটাও কি বিদআত এর মধ্যে পড়ে?

উত্তর: হ্যাঁ। এখন কথা হল, যারা এটা করেন, তারা বলেন সালাত (দরুদ) তো সব সময় পড়া যায়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। সমস্যা হল, আযান নামক ইবাদত এর সাথে সালাতটাকে যোগ করা হয়েছে। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে। বিদআত মানেই দলীল আছে,

১০. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৮৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫২৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬১৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৭৮।

১১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৬৯৭০।

যুক্তি আছে, সুন্নাত নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি। বিদআত কিন্তু দলীলবিহীন নয়। প্রতিটি বিদআতের অত্যন্ত জোরালো দলীল আছে। কিন্তু সুন্নাত নেই। বিদআত অর্থ মূলত বৈধ। কিন্তু সুন্নাত না। যেমন আমরা পশু জবাই করি, এক্ষেত্রে, আল্লাহু আকবার বা বিসমিল্লাহ বলা হল সুন্নাত। ফকীহগণ বলেছেন, শুধু আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, রহমান এই নাম শব্দটা উচ্চারণ করে জবাই করা জায়িয, বৈধ। এখন একব্যক্তি এই বৈধতাকেই দীন বানিয়ে ফেলল। এটাই রীতি। সে সবসময় এটা করে। এটা বিদআত। সুন্নাতকে অস্বীকার করা হল। এখন আমরা আযানের আগেপরে যা কিছু যোগ করছি, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আযানের থেকে ব্যতিক্রম। যেমন যেখানে নেই...। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, বুযুর্গ বলেছেন, যেকোনো ইবাদতের শুরুতে শেষে দরুদ পড়লে ওটা কবুল হয়। এখন আমরা তাহলে প্রতিদিন যখন সালাতে দাঁড়াব তখন সালাতের আগে দুরুদ শরীফ পড়ে নেব সবাই এবং সালাম ফিরিয়ে একবার দরুদ শরীফ পড়ে নেব। এই দলীল দিয়ে যে কর্মটা আমরা তৈরি করলাম, এই কর্মটা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো করেন নি। আর কোনো দলীল দিয়ে যদি এমন কর্ম তৈরি হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, বুঝতে হবে দলীলটা আমরা ভুল বুঝেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক বুঝেছেন।

প্রশ্ন: ৮২। ইমাম যদি সুস্পষ্ট বিদআতের অনুসারী হয়, তবে তার পেছনে সালাত আদায় করা বৈধ কি না?

উত্তম: বিদআত হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, সাহাবীরা করেন নি, এমন কিছুকে দীন মনে করা। এটা কর্মের চেয়েও চেতনা, অর্থাৎ বিশ্বাসের বিষয়। যেমন দরূদ সালাম পড়া নাজায়িয কিছু নয়। খুবই ভালো কাজ। কিন্তু বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে করলে সাওয়াব হবে, এটা দীনের অংশ, আজানের অংশ, এটা মনে করলে আমার দীন প্রমাণ হবে। না করলে বেয়াদব, ওহাবি...।

দীন বা ইবাদতের অংশ বানাতে হলে সুন্নাত লাগবে। এটার পর্যায়

রয়েছে। কিছু বিদআত রয়েছে, আংশিক সুন্নাতের খেলাফ। আবার কিছু বিদআত পুরোটাই বিদআত। কথাও বিদআত, পদ্ধতিও বিদআত হবে। আর কিছু বিদআত নাজায়িয বিদআত। কিছু বিদআত বিশ্বাসের বিদআত। আমাদের সমাজে কমবেশি সবাই বিদআতে জড়িত হয়ে পড়েন সমাজের প্রচলনের কারণে। অর্থাৎ ছোটখাটো বিদআত, যেগুলো বিশ্বাস বা আকীদার পর্যায়ে নয়, ওরকম বিদআত যদি কোনো ইমামের থাকে, তার পেছনে নামায পড়তে হবে, যদি উত্তম ইমাম না পাই। কারণ জামাআতে সালাত আদায় করা মুমিনের উপর ওয়াজিব। তাইতো ইমাম ভালো হোক আর মন্দ হোক, যেটা হাদীস শরীফে এসেছে:

صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ

নেককার এবং বদকার, সবার পিছনে সালাত পড়তে হবে।[১২] জামাআতের সালাত ত্যাগ করা যাবে না। উত্তম পাওয়া যায় ভালো। নইলে— এইরকম বিদআত পাপের অন্তর্ভুক্ত— আর পাপীর পেছনে জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে, যদি উত্তম কাউকে না পাই। আর মসজিদ কমিটি যদি বিদআত জানার পরও তাকে রাখেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ গোনাহগার হবে, ব্যক্তি মুমিন নয়। আমার তো জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে। ইমাম পরিবর্তনের অধিকার বা ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই আমি সালাত আদায় করব। আমার সালাত হয়ে যাবে। বিদআত যদি শিরকের পর্যায়ে চলে যায়— যেমন আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে, আল্লাহ ছাড়া কেউ অলৌকিক সাহায্য করতে পারে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সর্বত্র বিরাজমান, সবকিছু জানে— তাহলে তার পেছনে সালাত আদায় করা যাবে না।
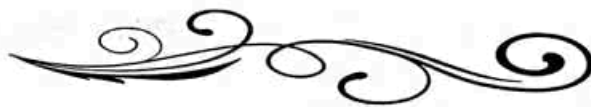
১২. বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৬৮৩২।

কিয়ামতের আলামত

প্রশ্ন: ৮৩। কিয়ামতের তো অনেক আলামতের কথা আমরা শুনি এবং কিছু কিছু জিনিস আমরা দেখিও। ছোটছোট অনেক দূর্ঘটনা আমাদের পৃথিবীতে হচ্ছে। প্রশ্নটা হচ্ছে, কিয়ামতের আলামত আসলে কোনগুলো?

উত্তর: কিয়ামতের আলামত বিষয়ে কুরআন কারীমে কিছু বলা হয়েছে। আর বাকি হাদীস শরীফে ব্যাপক আলামতের কথা বলা হয়েছে। উলামায়ে কেরাম কিয়ামতের আলামতগুলোকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। আলামতে সুগরা, আলামতে কুবরা। আলামতে সুগরা অর্থাৎ সাধারণ চিহ্ন। কিয়ামতের পূর্বে ছোটছোট আলামত বা পূর্বাভাস। আর আলামতে কুবরা অর্থাৎ বড়বড় পূর্বাভাস। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কথাগুলো বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে ঘটবে, এগুলোকে আলামতে সুগরা বলা হয়। এগুলোর ভেতরে যেমন রয়েছে, মক্কা শরীফের ব্যাপারে, যেমন হাদীসে এসেছে, কিয়ামত হবে না, যতদিন না মক্কার বাড়িগুলো মক্কার পাহাড়ের চেয়ে উপরে উঠে যাবে। প্রথম যুগের মানুষ এটা বুঝত না। এরপরে যখন দেখলাম পাহাড়ের উপরে বাড়ি হচ্ছে, তখন আমরা ভাবতাম বোধহয় এগুলোকেই বোঝানো হয়েছে যে, পাহাড়ের উপরেও বাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আমরা দেখছি মক্কার মাটি থেকে বানানো বাড়ি পাহাড়গুলোর চেয়ে অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। অন্য হাদীসে এরকম এসেছে যে, কিয়ামতের আগে মক্কার নিচে অনেক গর্ত হয়ে

যাবে। এক গর্তের সাথে আরেক গর্ত মিলে যাবে। তখন মানুষেরা এটা বুঝত না, এখন আমরা যখন হজ্জে যায় দেখি মক্কার নিচে দিয়ে অগণিত সুড়ঙ্গ, টানেলে সব ভরে গেছে। পাহাড়ের নিচ দিয়ে, হারামের নিচে দিয়ে। অগণিত সুড়ঙ্গ একটার সাথে আরেকটা মিশে যাচ্ছে। অন্য একটা হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, যে পাহাড়গুলো তার স্থান থেকে সরে যাবে। আমরা আগে তত বুঝতাম না, এখন দেখছি পাহাড় কেটে বিল্ডিং হচ্ছে, ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এগুলো ঘটছে। অন্য হাদীসে এসেছে, যেটা আমরা অনেকেই জানি:

تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ.

তুমি দেখবে যারা রাখাল ছিল, নগ্নপদে ছাগল চরিয়ে বেড়াত তারা বড় অট্টালিকা উঁচু করার ব্যাপারে পাল্লা দেবে। শুধু উঁচু অট্টালিকার মালিক হবে তা নয়, প্রতিযোগিতা করবে, কে কত উঁচু করতে পারে।[১] এখন আমরা দেখি যে, একজন যদি ১২০ তলা বিল্ডিং বানায় পরে আরেকজন তার চেয়ে আরো দুইতালা বেশি করে আরো কয়েক ফুট বাড়িয়ে এই প্রতিযোগিতা করে। এই প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী শুরু হয়ে গেছে। এই জাতীয় অনেক আলামত বা চিহ্ন, পূর্বাভাস রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। যেগুলো বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রয়েছে। দেড়হাজার বছর ধরে হাদীসগুলো রয়েছে, এগুলোকে আমরা তখন এইভাবে বুঝি নি, বিভিন্ন াবে আশা করেছিলাম, এখন বাস্তবে দেখছি। নৈতিক অবক্ষয়ের কথা আছে, ব্যভিচার বৃদ্ধির কথা আছে। এইগুলো সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর পাশাপাশি কিছু আলামতে কুবরা রয়েছে। যেগুলোকে হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে বলেছেন। যেমন, দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা عليه السلام এর পুনর্গমন, পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয়, ভূমিধ্বস, ব্যাপক ভূমিধ্বস। এইধরণের বেশকিছু পূর্বাভাস রয়েছে ।

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬৯৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬১০; সুনান নাসায়ি-৪৯৯০।

প্রশ্ন: ৮৪। ইমাম মাহদি ﷺ কখন আসবেন?

উত্তর: জি। এটা খুবই গুরত্বপূর্ণ বিষয়। কিয়ামতের আলামতগুলো বর্ণনামূলক (descriptive)। যখন ঘটবে, তখন আমরা জানব যে ঘটে গেল। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এর অর্থ এই নয়, আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করব, কীভাবে সূর্যকে পশ্চিম দিকে নেওয়া যায়। বা পৃথিবীর গতি পরিবর্তন করা যায়। পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা যায়। যখন এটা ঘটবে তখন আমরা জানব যে, এটা ঘটল।

হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের পূর্বে সন্তানেরা পিতামাতার অবাধ্য হবে। এর অর্থ এই নয়, কীভাবে সন্তানদেরকে পিতামাতার অবাধ্য করানো যায়, কীভাবে কিয়ামত তাড়াতাড়ি করে নেওয়া যায়। ইমাম মাহদির বিষয়টা একই রকম। ইমাম মাহদি আসবেন। যখন আসবেন, মানুষ জানবে। কিন্তু আমাদের সমাজে ইমাম মাহদিকে নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি রয়েছে। এটা এখন থেকে নয়। ইমাম মাহদি বিষয়ে সহীহ হাদীস কম, খুবই অল্প। সহীহ বুখারি , সহীহ মুসলিমে এই মর্মে কোনো হাদীস নেই। অন্যান্য সুনান গ্রন্থে অল্প কিছু সহীহ হাদীস আছে। বাকি সবই জাল ও বানোয়াট হাদীস। এটা হল প্রথম বিষয়। অল্প কিছু সহীহ হাদীসের আলোকে যেটা বোঝা যায়, সেটা হল, শেষ জামানায় একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক আসবেন। মাহদি শব্দের অর্থ হেদায়াতপ্রাপ্ত, সুপথপ্রাপ্ত। মাহদি অনেকেই– চার খুলাফায়ে রাশিদ, তাঁরা মাহদি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন, 'খুলাফায়ে রাশিদীন আল মাহদিয়্যীন'। রাশিদ খলীফাগণ সবাই মাহদি, হেদায়াতপ্রাপ্ত। ঠিক খুলাফায়ে রাশিদীনের মানের একজন হেদায়াতপ্রাপ্ত, সুপথপ্রাপ্ত শাসক আসবেন। তিনি মাত্র সাতবছর বিশ্ব শাসন করবেন। তিনি জুলুম, অত্যাচারগুলো সরিয়ে দিবেন। এটা কিয়ামতের একটা আলামত। এটাও বড় আলামতের ভেতরে উল্লেখ

করেন নি রাসূলুল্লাহ ﷺ। এটা ছোট আলামতের শেষ পর্যায়ের। এটা নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে সব থেকে বেশি বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। বিগত দেড়হাজার বছরে, ইসলামের ইতিহাসে প্রায় তিনহাজার ইমাম মাহদি বেরিয়েছে। প্রতি বছরেই দুই তিনজন করে বের হয়। এবং তারা বেরিয়েছেন, দাবি করেছেন, স্বপ্ন-কাশফের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে দেখিয়েছেন, তার ভক্তরা স্বপ্ন দেখেছেন কাশফ হয়েছে, কিছু ভক্ত জুটিয়েছেন। কিছু মানুষ সত্য ন্যায় এর লোভে, এবার ভালো কিছু করে ফেলব বলে তার পেছনে গিয়েছেন। অল্প বা বেশি রক্তপাত করিয়ে একসময় হারিয়ে গিয়েছেন।

এখানে কয়েকটা মনোবৃত্তি কাজ করে। একটা হল পলায়নী মনোবৃত্তি। ইসলাম আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে যে কোনো পরিবেশে তোমরা দীনের দাওয়াত দাও। কিন্তু আমরা দেখি যে সমাজ পরিবেশ ভালো না। আমরা নিজের দাওয়াতের ব্যাপারে চিন্তা না করে আমরা চিন্তা করি, ইমাম মাহদি না এলে কিছু করব না। এখন চুপ করে বসে থাকি। অর্থাৎ ইমাম মাহদি যদি একলক্ষ বছর পরেও আসে, আমরা চুপ করে ঘুমাব। আমার দায়িত্ব আমি পালন করব না। আর কেউ চিন্তা করে কোথায় গেলে ইমাম মাহদি পাওয়া যায়?! আমি হয়তো ইমাম মাহদি বা অমুক হয়তো মাহদি। তাকে নিয়ে আমরা দুনিয়া পাল্টে ফেলেব। দ্বিতীয়ত জোর করে, অন্যায় পরিবর্তন করে, তাড়াতাড়ি ভালো কিছু করে ফেলার প্রবণতা। ইমাম মাহদি আসলে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে সবকিছু সাইজ করে ফেলে দেব। এটা একটা অবাস্তব চিন্তা। আমাদের দায়িত্ব হল দাওয়াতের মাধ্যমে কঠোরতাকে বিনম্রতা দিয়ে...

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ[২]

অহিংসভাবে, বিনম্রভাবে, সহিংসতাকে অহিংসা দিয়ে প্রতিরোধ করে আমাদের দাওয়াত এগিয়ে নিয়ে যাব। আল্লাহ কবে মাহদি বের

২. সূরা [২৩] মুমিনূন, আয়াত: ৯৬।

করবেন আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন! তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু হাদীস আছে। ইমাম মাহদির বিষয়ে সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিমে কোনো হাদীস নেই। তবে সুনান আবু দাউদ এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থ এবং প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর বাইরে কিছু গ্রন্থে হাদীস আছে। সবগুলো সহীহ হাদীস জমা করলে, যয়ীফ বাতিলগুলো বাদ দিলে যেটা অর্থ দাঁড়ায়... আবু দাউদের একটা হাদীসে, বলা হয়েছে, হাদীসটা মুটামুটি সহীহ, শেষ যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশের ভেতর থেকে আলী رضي الله عنه এর বড় ছেলে ইমাম হাসানের বংশ থেকে একজন শাসক আসবেন। তার কপালটা বড় হবে, চেহারা সুন্দর হবে এবং তার নাম হবে মুহাম্মাদ। তার পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি কোথায় আসবেন এ ব্যাপারে একটা হাদীস প্রায় সব মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন। একটা শাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যাবে। অনেকে একটা মানুষকে নিয়োগ দিতে চাইবে, তিনি পালিয়ে মক্কায় চলে আসবেন। মক্কায় আসার পরে মানুষরা খুঁজে তাকে বের করবে। এরপর মাকামে ইবরাহীম এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে তার কাছে বায়াত করা হবে, রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম হিশেবে। ইসলামের শরীআতে ইমাম অর্থই রাষ্ট্রপ্রধান। ইমাম, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বায়াত করা হবে। এতে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মানুষেরা ক্ষিপ্ত হবে। সিরিয়া থেকে তার বিরুদ্ধে তাকে ধ্বংস করার জন্য বাহিনী পাঠানো হবে। ওই বাহিনীটা পথিমধ্যে বাইদা নামক প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন এটা সবাই জানবে মিডিয়ার মাধ্যমে যে, মাহদির বিরোধীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারবে ওই ব্যক্তির মাহদি হওয়ার আলামত। তখন সিরিয়া থেকে ইরাক থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের এসে মক্কায় মাহদির কাছে বায়াত করবে। এরপরে মাহদির বিরুদ্ধে আরবেরই কুরাইশ বংশের কালব বংশের একদল মানুষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নামবে। কিন্তু তারা যুদ্ধে পরাজিত হবে। এ পর্যায়ে এসে খুরাসান এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের দলে দলে তার কাছে আসবে, বায়াত নেবে। তার রাষ্ট্রপ্রধানত্ব মেনে নেবে।

এটা হল সারসংক্ষেপ, যেটা বোঝা যায়।

এখানে মূল প্রশ্ন হল, পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমাদের করণীয় কী?

একটা হাদীস আছে, ইমাম মাহদির খবর পেলে..., খুরাসান থেকে যখন কালো পতাকাগুলো চলে যাচ্ছে, তখন জানবেন তার ভেতরে মাহদি আছে। তোমরা পাথরের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার কাছে বায়াত করবে। হাদীসটার সনদ সম্পর্কে কথা আছে। তবে এই হাদীস থেকে কত যে ভণ্ডামি বেরিয়েছে! কালো পতাকা মানেই ইমাম মাহদি। আপনারা জানেন, আব্বাসি খেলাফত এই হাদীসটা ব্যবহার করে দাওয়াত দিয়েছিল। তাদের মূল প্রচারক ছিল আবু মুসলিম খুরাসানি। খুরাসানের লোক। এবং তাদের ফ্ল্যাগ ছিল কালো এবং তাদের পোশাক ছিল কালো। এরপরে এই হাদীসটাকে ব্যবহার করে তারা মানুষদের কে বলে, আমরা যেহেতু কালো পতাকা নিয়ে, আমরাই মাহদি। এবং আব্বাসীয় খলীফাদের ভেতরে তৃতীয়জন তিনি মাহদি দাবি করেন। তিনি মাহদি বলে শাসন করেন। এরকম বিভিন্ন সময়ে এই হাদীসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে মুমিনের দায়িত্ব হল, সুফিয়ান সাওরি থেকে একটা কওল বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যদি ইমাম মাহদি আমার দরজা দিয়েও যায়, আমি সালাম দিব না। যখন দুনিয়ার সব মানুষ তাকে মাহদি বলে মেনে নেবে, আমি বলব আলহামদু লিল্লাহ, তুমি মাহদি আমি মেনে নিলাম। ইমাম মাহদি অনুসন্ধান করা, মাহদি খুঁজে তার কাছে যাওয়া, মাহদির সৈন্য হতে যাওয়া, মাহদির কাছে যাওয়া– এগুলো কখনো ইসলাম নির্দেশ দেয় নি। প্রতিটি মুমিন তার দায়িত্ব পালন করবে। যখন বাস্তবে দেখা যাবে যে, একটা মানুষ, তার ভেতরে শতভাগ আলামত পাওয়া গেছে, বিশ্বের মুসলিম জনপদ তাকে মাহদি মেনে নিয়েছে, বায়াত করেছে। তখন আমরা বলব আমরা বায়াত করলাম, মেনে নিলাম। আপনিই আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান। ব্যাস!

এটাই যথেষ্ট। এটার বাইরে যা করা হয়েছে, এতে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে!

প্রশ্ন: ৮৫। এক ইসলামি চিন্তাবিদের ছোট্ট একটি রিসালা পড়ার সুযোগ হয়েছে। তিনি সেখানে লেখেছেন যে, এ যুগ ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের যুগ। এই বিষয়টি আসলে ঠিক কি না?

উত্তর: এটা মোটেও ঠিক না। কোন যুগ মাহদির...! আপনাকে বলি... স্বপ্ন কাশফের মাহদি তো গত দেড় হাজার বছর ধরে বেরোচ্ছেই। এটা বললাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর থেকেই মাহদি বেরোচ্ছে। অনেক অনেক মাহদি বেরিয়েছে। তার ভেতরে, উমাইয়া শাসন শেষের দিকে যখন আব্বাসি শাসন প্রতিষ্ঠা হল। নাফসে যাকিয়া, আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশের মানুষ। সবই এরকম ঠিক আছে। ইমাম হাসানের বংশের। তাকেও অনেকে ইমাম মাহদি বলে ঘোষণা করেছেন। আবার উমার ইবন আবদুল আযীযকে সত্যিই মাহদি বলেছেন কেউ কেউ। তিনি একজন মাহদি শাসক। এরপরে স্বপ্ন কাশফের কথা বলি। আমাদের বাঙালি কমিউনিটির মানুষ আপনারা সবাই জানেন, মুজাদ্দিদ আলফে সানির কথা, তিনি তার মাকতুবাতে লিখেছেন। তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন, ইমাম মাহদির যুগ এসে গেছে। এ শত বছরের ভেতরে উনি হয়তো এসে যাবেন। আমরা প্রায় ৫০০ বছর পার করে ফেললাম, কোনো খোঁজখবর নেই। এটা একটা কষ্ট কল্পনা। অনেক সময় অনেক বুযুর্গ একটা কাশফ দেখেছেন। কাশফ দীনের কোনো দলীল না। এটা ব্যক্তিগত অনুভূতিমাত্র। কাজেই ইমাম মাহদি আরো একলক্ষ বছর পরে আসতে পারেন। যখন আসবেন তখন আমরা চিন্তা করব। দ্বিতীয় বিষয় হল, এই যুগযুগ বলার ভেতরে দীনের কী ফায়দা আছে? আমরা চুপ করে থাকব? মাহদি না আসা পর্যন্ত দীনি দাওয়াত তা'লীম তারবিয়ত সব কি বন্ধ থাকবে? আর যদি না-ই থাকে, মাহদি কবে আসবে চিন্তা করার দরকারটা কী? এটা একটা বাতিল চিন্তা।

প্রশ্ন: ৮৬। কিয়ামতের একটা বড় আলামত এটা যে, দাজ্জাল আসবে। আমাদের দেশে কোনো কোনো ভাইয়েরা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখেছি, মানুষেরা দাবি করছে খ্রিস্টান সভ্যতা-ই দাজ্জালি সভ্যতা বা এটাই দাজ্জাল। আসলে বিষয়টা কী?

উত্তর: দাজ্জাল বিষয়টা খ্রিস্ট ধর্মে আছে। যেটাকে এন্টিক্রাইস্ট বলে ওরা। এন্টি ক্রাইস্ট আসবে, ক্রাইস্টের সাথে যুদ্ধ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা পুরনো। তবে ইসলামি পরিভাষায় দাজ্জাল প্রসঙ্গটা কুরআনে নেই, হাদীসে আসছে। হাদীস শরীফে দাজ্জালের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এটা হল মানুষের বিশ্বাস এক্সপ্লয়েট করা হবে। আমাদের সমাজসহ ইউরোপ আমেরিকাতেও অলৌকিকত্ব দেখলেই মনে করি এটা কোনো বড় কিছু। অর্থাৎ কেউ যদি অসুস্থকে সুস্থ করে দেয়, অথবা মরা মানুষ জিন্দা করে দেয়, কেউ হয়তো পানির উপর দিয়ে হেটে গেল, বাতাস দিয়ে উড়ে গেল– ইনি নিশ্চয় আল্লাহর প্রিয়। এ চেতনায় আমাদের সমাজে অনেক বাবা হয়ে গেছে এবং অন্যান্য অমুসলিম সমাজেও বাবার অভাব নেই। অলৌকিক বাবা, মিরাকলাস বাবা আর-কি। ফাদার, ঈশ্বরিক ক্ষমতা রাখেন বলে মানুষ তাকে সিজদা করে, মানুষ তার কাছে কিছু আশা করে, তার ধ্যান করে। এই যে শিরকি চেতনা, এটার সম্পূর্ণতা পাবে দাজ্জালের মাধ্যমে।

আমরা মাঝেমাঝেই বলি যে, অলৌকিকতা দেখে বিশ্বাস করা ঈমানের পরিপন্থী। এটা অবশ্য প্রচলিত যে, বাইবেলের ভেতরে যিশুখ্রিস্টের একটা বক্তব্য মার্ক লিখিত সুসমাচারের শেষে আছে, তোমাদের কেউ যদি বিশ্বাস করে, সে বিষ খেলে মরবে না, সে সাপ ধরলে কামড়াবে না। সে যদি কোনো রোগীর গায়ে হাত দেয় ভালো হয়ে যাবে, সে একটা পাহড়কে বললে পাহাড় পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পাহাড় পড়ে যাবে!! আমরা বিশ্বাস করি, ঈসা عليه السلام এমন আজগুবি কথা বলেন নি। বিশ্বাস মানুষের আজগুবি কবিরাজের জন্য না। বিশ্বাস মানুষের মনুষ্যত্ব তৈরির জন্য। মানুষ সত্যের উপর থাকে মিথ্যা থেকে বেঁচে

থাকে। একজন মানুষকে আমরা যদি দেখি, তিনি শত প্রলোভনে ঘুষ খান না। এটা বিশ্বাস প্রমাণ করে। আরেকজন লোক সাপ ধরলে কামড়ায় না, এটা কোনো বিশ্বাস না, কোনো উপকারও নেই। ইসলাম কখনো এই দিকটা দেখায় নি। ইসলাম কখনো এটা বলে নি যে, তোমরা কারো অলৌকিত্ব দেখে বিশ্বাস আনবে। কোথাও নেই।

আমাদের একটা আকীদা, কারামাতুল আওলিয়া হক। এই বিষয়টার সাথে এটার পার্থক্যটা কী? পার্থক্যটা হল, ইসলাম যেটা বলে কারামাতুল আওলিয়া হক, এটা কুরআনে নেই, হাদীসেও নেই। তবে যখন উমাইয়া যুগ, আব্বাসি যুগ আসল, কেউ কেউ বিজ্ঞানের নামে অলৌকিকত্ব অস্বীকার করতেন। তখন উলামায়ে কেরাম বললেন, কারামাতুল আওলিয়া হক। অর্থটা কী? কোনো নেককার মানুষের বেলায়াতটা প্রমাণিত। কীভাবে প্রমাণিত? তার সুন্নাতের ইত্তেবা, তার তাহাজ্জুদ, তার সততা, তার হারাম বর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে তার বেলায়াত প্রমাণিত হয়েছে। এরকম বেলায়াত প্রমাণিত কোনো মানুষ থেকে যদি অলৌকিক ঘটনা নিশ্চিত জানা যায়, আমরা এটাকে জাদু বলব না। বলব, এটা ঘটতে পারে। অর্থৎ কোনো ওলি থেকে অলৌকিক কিছু বেরোলে আমরা সেটাকে কারামত বলব। কিন্তু কারামত দিয়ে ওলি চেনা যাবে না। ওলি দিয়ে কারামত চেনা যাবে। কারণ উলামায়ে কেরাম বলেছেন, একই রকম কারামত খারাপ লোক থেকে বেরতে পারে এটা ইসতিদরায বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যদি কোনো একটা ভালো লোক থেকে কারামত বের হয়, কেউ যদি ভালো মানুষ হন, তিনি একজনের গায়ে হাত দিয়েছেন, ভালো হয়ে গেছে। আলহামদু লিল্লাহ তিনি নিশ্চয় ভালো লোক হবেন।

তবে এখানে আরেকটা জিনিস আছে। কারামত মানে অলৌকিক সম্মাননা। কারামাত মানে ক্ষমতা নয়। এখানে আরেকটা শিরক আমাদের ভেতরে আছে। কারামত মানে বলি অলৌকিক ক্ষমতা। কারামত ক্ষমতা নয়, আল্লাহ তাকে ওই সময় একটা সম্মান দিয়েছেন।

সে যেকোনো সময় রুগীর গায়ে হাত দিলে ভালো হবে, সেটা না কিন্তু। যেমন উমার ﵁ একদিন মদীনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাজার কিলো দূরে প্রায় ইরাকের একটা ঘটনা চোখে দেখে তাকে বলেন: يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ সারিয়া সাবধান হয়ে গেলেন। তাহলে দেখা গেল উমার হাজার মাইল দূরের জিনিস দেখলেন। এর অর্থ এই নয়, উমার সব সময় দেখতেন। এই উমার ﵁ কেই মারার জন্য মাত্র তিনহাত দূরে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। উনি দেখলেন না, ছুরি মেরে দিল। তার মানে এই যে বিষয়টা, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছেন। এটা কোনো স্থায়ী ক্ষমতা না। স্থায়ী ক্ষমতা জাদু। যেটা বলছিলাম, 'কারামাতুল আওলিয়া হক' অর্থ ওলিদের থেকে যদি কোনো অলৌকিক কিছু বের হয় সেটা সত্য। কিন্তু এটা তার ক্ষমতা নয়। এটা দেখে ওলি চেনা যাবে না।

এই কারামত দেখে ওলি চেনার প্রবণতাকে আমরা কুরআন কারীমে পড়ি, বনী ইসরাইল বিভ্রান্ত হয়েছিল। সামেরি নামক একজন মানুষ, সে একটা গরুর বাচ্চা বা বাছুর বানিয়েছিল সোনা-রুপার অলঙ্কার গলায়ে। সেটা আবার হাম্বা হাম্বা করে ডাকত। একটা সোনা-রুপার মূর্তি ডাকছে দেখে, কারামতি দেখে ওরা সবাই বিশ্বাস করে ওটাকেই দেবতা মানল। এর শাস্তিও তারা পেয়েছিল। আর সর্বশেষ শাস্তি পাবে দাজ্জালের মাধ্যমে। দাজ্জালও এইরকম অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে আসবে আর সেটা দেখে অনেকেই তাকে বিশ্বাস করবে। মৃত মানুষকে তুলে দেবে । ঈমান হারিয়ে ফেলবে। এই ঈমানের পরীক্ষা হিসেবে দাজ্জাল আসবে।

প্রশ্ন: ৮৭। হযরত ঈসা عليه السلام পৃথিবীতে আগমন করবেন, এটা আমরা জানি। কিন্তু উনার আগমনের নির্দিষ্ট সময় আছে কি না?

উত্তর: এটা একটা জীবনঘনিষ্ঠ বা ঈমানঘনিষ্ট প্রশ্ন। কারণ মুসলিম জগতে আমরা সবাই মোটামুটি ধারণা রাখি যে, ঈসা عليه السلام শেষযুগে আবার আসবেন। এই জীবনঘনিষ্ট বা ঈমানঘনিষ্ট প্রশ্ন এখন বিভিন্ন

কারণে নতুনভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। তার একটা কারণ হল, আমাদের বাঙালি এবং অন্যান্য মুসলিম সমাজের ভেতরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য যে কৌশলগুলো গ্রহণ করেন প্রচারকগণ, এ-ব্যাপারে ১৯৭৮ খ্রি. আমেরিকার কলোরোডো স্প্রিং শহরে তাদের একটা সম্মেলন হয়। নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স অন মুসলিম এভাঞ্জালাইজেশন। মুসলিমদের খ্রিস্টানকরণের সম্মেলন। তারা এখানে সিদ্ধান্ত নেন মুসলিমদের ধর্মান্তর করা যায় না। কিন্তু তাদেরকে তাদের ধর্মের কথা দিয়ে আমরা কীভাবে খ্রিস্টান বানাতে পারি। তার ভেতর একটা হল, মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা عليه السلام আসবে। কাজেই আমরা মুসলিমদের বলব, তিনি তো আসবেনই, আমরা আগে থেকে তাঁর উম্মত হয়ে প্রস্তুতি নিই। এর পাশাপাশি তারা বলতে চান, ঈসা নবী তো এখনো নবী। তিনি বেঁচে আছেন। কাজেই আমরা শুধু এক নবীকে মানলে হবে না। দুই নবীকেই মানতে হবে। এভাবে বিভিন্ন রকমের প্রতারণা ও অপপ্রচারের ভেতর দিয়ে তারা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন।

কেউ যদি তার ধর্মে বিশ্বাস সুস্পষ্ট করে কাউকে ধর্মের দাওয়াত দেন, প্রচার করেন, এটা আমরা আপত্তি করতে পারি না। এটা তার অধিকার। কিন্তু কেউ যদি এমন বলেন, ঈসা عليه السلام কে আমরা বিশ্বাস করি, মহানবী ﷺ কে বিশ্বাস করি। আসলে মিথ্যা কথা। তারা বলেন ঈসা عليه السلام নবী, মুহাম্মাদ ﷺ নবী। দুজনকে মানতে হবে। এটা তাদের কথা না। তারাও বিশ্বাস করেন, একজনকে ছাড়া মানা যায় না। আমরা মাঝেমাঝে মানুষকে বোঝায় যে, ভাই একই সাথে কি দুজন প্রধানমন্ত্রীকে মানা যায়? একই সাথে দুজন পীরকে কি পীর মানা যায়? আমাদের সমাজে ধারণায় বলি। এবং ইঞ্জিল শরীফের প্রচলিত যেটা আছে, ঈসা মসীহ নিজেই বলছেন, একমাত্র স্বর্গের ঈশ্বরকে ছাড়া কাউকে পিতা বলবে না। ফাদার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আর ঈসাকে ছাড়া কাউকে গুরু বলবে না। এখন তিনিও বলছেন, একজন ছাড়া গুরু হতে পারে না। তবুও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ অভ্যাস হল,

পাদ্রিদেরকে ফাদার বলা। বাইবেলে কিন্তু নিষেধ আছে, যিশুখ্রিস্ট নিজেই বলছেন, একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়া কাউকে ফাদার বলবে না আর একমাত্র যিশুখ্রিস্ট ছাড়া কাউকে গুরু বলবে না, আচার্য বলবে না। তাহলে একজনকে তারা মানেন। কিন্তু তারা বোঝাতে চান, আমরা দুটোই মানি। তারা এ পর্যায়ে একটা কথা বলেন যে, ঈসা عليه السلام আবার যেহেতু আসবেন, কাজেই আমরা তার জন্য প্রস্তুতি নিব।

আপনার যে প্রশ্নটা, ঈসা عليه السلام আসার (নির্দিষ্ট) সময় আছে কি না? এ সময়ের ব্যাপারে দুইটা অ্যাপ্রোচ। একটা হল ইঞ্জিল শরীফগুলোর অ্যাপ্রোচ। ইঞ্জিল শরীফ গুলোতে বারবার বলা হয়েছে যে, ঈসা عليه السلام আবার ফিরে আসবেন। আবার মুসলিমরা বিশ্বাস করছেন, ঈসা عليه السلام আবার ফিরে আসবেন। মুসলিমদের বিশ্বাসের ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট কিছু নেই। কুরআনে কোথাও নেই, ঈসা عليه السلام আবার ফিরে আসবেন। একটা কথা সূরা নিসায় আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর উপর ঈমান আনবে।[৩] তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলতে, তিনি আসবেন, এসে দুনিয়াতে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টা ছাড়া কুরআন কারীমে ঈসা عليه السلام পুনরাগমনের কথা কোথাও নেই। তবে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। হাদীসগুলো ইসলামি পরিভাষায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের যে, ঈসা عليه السلام শেষ যুগে আসবেন। এজন্য ঈসা عليه السلام পুনরাগমন মুসলিম বিশ্বাসের একটা অংশ। এ দুটো দুটো পৃথক ধর্মের বিশ্বাস। আবার আরেকটাও রয়েছে, ইয়াহুদিরাও বিশ্বাস করেন মাসীহ আসবেন। মাসীহ ক্রাইস্ট আসবেন। তারা বিশ্বাস করেন, খ্রিস্টানগণ তাদের মাসীহ বিষয়ক বিশ্বাসকে এক্সপ্লয়েট করে যিশুকে মাসীহ বলেছে। যিশু মাসীহ নন। বরং ইয়াহুদি ধর্মে বিশ্বাস হল, (নাউুবিল্লাহ) যিশু প্রতারক। নাউযুবিল্লাহ। তিনি মাসীহ শব্দটার

৩. সূরা [৪] নিসা, আয়াত: ১৫৯।

অপব্যবহার করেছেন। মাসীহর আগমনের অপেক্ষায় আছেন। তাদের মাসীহ আসবেন। আবার খ্রিস্টানগণ মাসীহের পুনরাগমনের অপেক্ষা করছেন। খ্রিস্টান এবং ইয়াহুদি ধর্মের মাসীহ কি তাহলে দুজন? ইয়াহুদি ধর্মে মাসীহের যে চেতনা, এটা ইয়াহুদিদের দাবি। কারণ পুরাতন নিয়মে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম যেটা জুইস (Jews) বাইবেল, এটাতে মাসীহেরর একটা ধারণা আছে। এই ধারণা ইয়াহুদিদের ভেতরে আছে যে, মাসীহ আসবেন। কিন্তু ঈসা ইবন মারয়াম মাসীহ নন। বরং ইয়াহুদিদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি প্রতারক, নাউযুবিল্লাহ। তিনি মিথ্যা মাসীহ দাবি করছেন। কারণ তাদের পুরাতন নিয়মে, জুইস বিশ্বাসের মাসীহ হবেন বিজয়ী। তিনি বিজয়ী শাসক হবেন, বাদশা হবেন। সারাবিশ্বে ইয়াহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। ইয়াহুদিদের অধীনে সবাইকে নিয়ে যাবেন। আর মাসীহ ঈসা তিনি এগুলো কিছুই করেন নি। তিনি মার খেয়েছেন। মারেন নি। পরাজিত হয়েছেন।

তাহলে তিনটা ধর্মের মানুষেরা এই মাসীহের অপেক্ষা করছেন। ইয়াহুদিরা একজন মাসীহের অপেক্ষা করছেন। তিনি ত্রাণ করবেন এবং সারা বিশ্বের ইয়াহুদিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সকল বিশ্বকে তাদের পদানত করবেন। আর খ্রিস্টানগণ যে মাসীহের অপেক্ষা করছেন, তিনি ঈসা ইবন মারয়াম। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি শূলে চড়ে যন্ত্রণা পেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরে তিনদিন মাটির নিচে থেকে দোযখে যান। শাস্তি পেয়ে। এরপর তিনি তিনদিন পর জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে যান। তিনি ফিরে আসবেন। আর মুসলিমরা মাসীহের অপেক্ষা করছেন। তাদের বিশ্বাস ঈসা সেই মাসীহ, তবে তিনি শূলে চড়েন নি, যন্ত্রণাও পান নি। শূলে চড়ার আগেই আল্লাহ তাকে নিয়ে গিয়েছেন। পরে তিনি আসবেন।

খ্রিস্টধর্মের মাসীহের ব্যাপারে ইঞ্জিলের ভেতর একেবারে রিপিটেড, বারবার নিশ্চিত করা হয়েছে খুব দ্রুত তিনি আসছেন। খুব দ্রুত

বলতে, আবার ক্লিয়ার করেছে, তোমাদের জীবদ্দশায়, আমার এখানে যারা রয়েছে তাদের কারো কারো মৃত্যুর আগেই, আমি ফিরে আসব। ঈশ্বরের পুত্র আপন প্রতাপে নেমে আসবেন। তোমাদের অনেকের মৃত্যুবরণ করার আগেই আমি ফিরে আসব। এজন্য প্রথম, দ্বিতীয় প্রজন্মের খ্রিস্টানরা ইয়াকিনের সাথে বিশ্বাস করতেন তাদের জীবদ্দশাতেই ঈসা আসছেন। শুধু কয়েকদিন অপেক্ষা। উনি আসছেন। এটা বারবার, অন্তত দশবারো জায়গায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কয়েকদিনের ভেতরে কুইকলি এবং তোমাদের জীবদ্দশায়, তোমাদের কোনো কোনো মানুষের মৃত্যুর আগেই।

সাধুপল চিঠিতে লেখছেন, ভাইয়েরা, আমরা সবাই মরব না, আমাদের ভেতরে অনেকে মরবে না, যে বেঁচে থাকবে, এমন অবস্থায় তিনি চলে আসবেন। এসে, যারা মৃত তাদেরকে তুলবেন। পুনরুত্থিত করবেন। আর আমরা যারা জীবিত তারা রূপান্তরিত হয়ে স্বর্গে চলে যাব। এটা তারা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সময়ের আবর্তনে একশত বছর পার হয়ে গেল, তিনি আসলেন না। তখন তাদেরকে কেউ বলতে লাগলেন যে, আল্লাহ তাআলার কাছে তো একদিন একহাজার বছরের সমান। কাজেই তোমরা ব্যস্ত হচ্ছে কেন? ওখানে কিন্ত যিশুখ্রিস্ট বলে নি, একদিন, দুইদিন বা তিনদিন পর। তিনি বলেছেন তোমরা বেঁচে থাকতেই। এখন তারপর একটা ব্যাখ্যা দিলেন যে, আল্লাহর কাছে একদিন একবছরের সমান। কাজেই উনি একদিন পুরলে আসবেন। মানে হাজারে। এটাকে বলে মিলেনিয়াম। এটাকে বলে মিলেনিয়াজম। খ্রিস্টধর্মের একটা বিশ্বাস হল, তিনি মিলেনিয়ামে আসবেন। এজন্য প্রথম মিলেনিয়াম যখন পুরে গেল, যিশুর আসার একটা পূর্ব শর্ত আছে। সকল ইয়াহুদিকে নিয়ে আসতে হবে ফিলিস্তিনে, যিশু এসে তাদের বিচার করবে। এজন্য তারা ফিলিস্তিন দখল করার জন্য ক্রুসেড শুরু করলেন যে, ক্রুসেডের মাধ্যমে ফিলিস্তিন দখল করতে হবে এবং সকলকে ইয়াহুদিকে সেখান আনতে হবে। যেন যিশু এসে বিচার করে তাদের জাহান্নামে নিতে পারে। আবার কিন্তু তৃতীয় মিলেনিয়াম

যখন শুরু হল। দ্বিতীয় মিলেনিয়াম যখন শেষ হল। অর্থাৎ ২০০০। তখন আবার বিশ্বব্যাপী একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এটার পেছনেও মিলেনিয়াজম, অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের আগমনের প্রস্তুতির একটা বিশ্বাস আছে বলে অনেকের কাছেই মনে হয়। যে, যিশুখ্রিস্ট আসবেন, মিলেনিয়াম পুরে গেলে। কাজেই আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করি। এবং ফিলিস্তিনকে দখল করি, আরববিশ্বকে দখল করি। সেখানে ইয়াহুদিদেরকে জমায়েত করি। এ ধরনের একটা বিশ্বাস। আবার ইয়াহুদিরাও তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিশ্বাসকে, খ্রিষ্ট ধর্মের এই বিশ্বাসকে অনেক সময় ব্যবহার করে। এটা হল খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী ইঞ্জিল বলছে, যিশুখ্রিস্ট কয়েক বছরের ভেতরে আসবেন। তাঁর শিষ্যদের জীবদ্দশায় আসবেন। তারা বেঁচে থাকতেই আসবেন। তিনি আসেন নি। এই ভবিষ্যদ্বাণী বাহ্যিকভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তখন তারা আর একটা ব্যাখ্যা করেছে মিলিনিয়াম।

আর ইসলাম ধর্মে সময়ের কোনো নির্ধারণ নেই। কিয়ামতের আগে শেষ দিকে তিনি আসবেন। তিনি যখন আসবেন, মুসলিম বিশ্ব ইমাম মাহদির নেতৃত্বে একটা যুদ্ধে থাকবেন ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে, এরকম একটা ধারণা পাওয়া যায়। এবং তিনি ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবেন। তিনি দাজ্জালকে নিহত করবেন, এই ধরনের বিষয়গুলো এসেছে। তবে এটা আগের মতোই আমরা পূর্ববর্তী একপর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, এটা কখন আসবেন, কবে আসবেন– এটা আমাদের কোনো চিন্তার বিষয় নয়। যাদের জীবদ্দশায় আসবেন, তারা বলল যে, হ্যাঁ আসলেন। যদি তার দ্বারা এসব কিছু সংঘটিত হয় আলামতগুলো পূর্ণ হয় তখন। এখন কেউ দাবি করল আমি ঈসা, এটা দাবি করলে হবে না।

এটা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক যে, আল্লাহর কাজের হিসেব নেওয়া। যে, আল্লাহ কেনো পাঠাচ্ছেন না। আর আসলে আমার লাভটা কী? না আসলে আমার ক্ষতি কী? আমার ঈমানের সাথে, তাকওয়ার সাথে,

দাওয়াতের সাথে, দীনের সাথে, জান্নাতের সাথে ইমাম মাহদির কোনো সম্পর্ক নেই। তারা মনে করেন ইমাম মাহাদি আসলে এই সব অনাচার দূর হয়ে যাবে, আহা! কত ভালো হয়ে যাব। কত ভালো-মন্দ তো সাত বছরের জন্য! আর কী বা হবে? না হলে আমার ঈমানের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো। এজন্য নিজের কর্মে ফাঁকি দিয়ে পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে এটাতে তারা পেরেশান হন।

প্রশ্ন: ৮৮। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করছেন, এই খ্রিস্টীয় সভ্যতাটাই হল মূলত দাজ্জাল। বিষয়টি যদি একটু খুলে বলতেন?

উত্তর: 'খ্রিস্টান সভ্যতা' কথাটি মূলত ঠিক নয়। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা কিংবা ওয়েস্টান সিভিলাইজেশন বলতে পারি। খ্রিস্টধর্ম যতদিন ধর্মীয়ভাবে পাশ্চাত্য জগতকে ডমিনেট করেছে ততদিন সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ভিন্নমত– এগুলোর সবই চার্চ নিয়ন্ত্রিত খ্রিস্টধর্ম প্রচণ্ডভাবে রোধ করেছে। যতদিন ধর্ম ইউরোপের ডমিনেন্ট ছিল– ভিন্নমত, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যচর্চা কোনোক্রমেই উন্নতি পায় নি। যখন তারা ধর্মকে পাশে ফেলে দিয়ে ধর্মমুক্ত সভ্যতা গড়তে গেলেন, তখন তারা সভ্য হয়েছেন। এ সভ্যতার ভেতরে ধর্ম নেই। এমনকি ধর্মীয় অনুভূতি, ধর্মীয় মূল্যবোধও নেই। তবে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষ খ্রিস্টধর্ম অনুসরণ করেন বলে মনে করা হয়। যদিও বাস্তবে তারা না বাইবেলের ধর্ম অনুসরণ করেন, না চার্চের ধর্ম অনুসরণ করেন। এজন্য এটা পাশ্চাত্য সভ্যতা।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দাজ্জাল বলার প্রবণতা ঠিক নয়। কারণ ভবিষ্যদ্বাণীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বলেছেন ওইভাবে বিশ্বাসে রাখা উচিত। এটা তো বাস্তব বয়ান। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দাজ্জাল বললে আমাদের কী লাভ? আর না বললেই বা আমাদের কী ক্ষতি? আর এটা দাজ্জাল হলেই বা আমাদের সমস্যা কী? না হলেই বা আমাদের সমস্যা কী? আবার হয়তো হাজার বছর পরে আরেকটা সভ্যতা আসবে, তখন আবার কিছু বুযুর্গ গবেষণা করে বলবে, এটাই

দাজ্জাল। এজন্য এজাতীয় ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা করা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই না। ঠিক ইমাম মাহদির নিয়ে গবেষণা, কাতরতা একটা অন্যায়। দাজ্জাল কে? দাজ্জাল যখন আসবে– রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে দাজ্জালের বিবরণ দিয়েছেন, আমরা যেটা আগে বলেছি– একটা অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসবে। নিজেকে ঈশ্বরের অবতার দাবি করবে, যে আমিই ঈশ্বরের অবতার। প্রমাণ হিসেবে বলবে, এই দেখো, আমি মৃতকে জীবিত করে দিচ্ছি, আমি বৃষ্টি নামিয়ে দিচ্ছি, আমি গোপন-ভাণ্ডার বের করে দিচ্ছি, আমাকে ঈশ্বর মেনে নাও, আমাকে আল্লাহ, বাবা, দয়াল বাবা মেনে নাও। এতে লক্ষকোটি মানুষ ঈমান হারাবে। ঈমানের একটা পরীক্ষা এই যে, ঈমান আল্লাহর কিতাব সুন্নাহর উপর হবে? না কারামত দেখে, অলৌকিকতা দেখে হবে। এর একটা পরীক্ষা হবে। এর পাশাপাশি কিছু হয়তো চলবে। দাজ্জালের বাহিনী বেড়ে যাবে। এক পর্যায়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে দাজ্জালের অনুসারীদের ভেতরে ইয়াহুদিরা থাকবেন বলে কোনোকোনো হাদীসে এসেছে। খুরাসান থেকে সত্তর হাজার ইয়াহুদি দাজ্জালের পেছনে আসবে। কোনোকোনো গবেষক বলেন যে, ইয়াহুদিগণ যে মাসীহের অপেক্ষা করছেন, সে ওই দাজ্জাল হবে। এটা গবেষকদের কথা। প্রত্যেক ধর্মের মানুষের অধিকার আছে, তার ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া। ইয়াহুদি ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক না। সব থেকে বড়কথা, পাশ্চাত্যের সভ্যতা দাজ্জাল এটা আমাদের কল্পনামাত্র। এটাকে দাজ্জাল বলার ভেতরে দিয়ে কাগজের পর কাগজ নষ্ট হবে, ছবির পর ছবি নষ্ট হবে, মুমিনের জীবনের প্রয়োজনীয় সময় নষ্ট হবে, ঈমান বাড়বেও না কমবেও না, আমল বাড়বেও না কমবেও না।

জামাআত/মাযহাব

প্রশ্ন: ৮৯। আমাদের দেশে একটা সংগঠন যখন আমাদেরকে দাওয়াত দেয় তখন বলে, ওদের সাথে সম্পর্ক করতে হবে। একটা হাদীসও বলে, সংগঠনবিহীন মৃত্যু নাকি জাহিলিয়াতের মৃত্যু! এটার ব্যাখ্যা জানতে চাচ্ছিলাম।

উত্তর: আপনি যে হাদীসটা উল্লেখ করেছেন, হাদীসটাকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো বুঝেছি। ইসলামে জামাআতকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, জামাআতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিরকা বা তাফাররুককে নিষেধ করা হয়েছে, হারাম করা হয়েছে। জামাআত মানে ঐক্য, দলহীন ঐক্য। আর ফিরকা মানে হল দল, গ্রুপ ইত্যাদি। ইসলাম আমাদেরকে দলমুক্ত ঐক্যের চেতনা দেয়। অর্থাৎ কর্মের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ থাকতে পারে, দল থাকতে পারে। মুসলিম হিসাবে সবাই আমরা একটাই দল, সেই দলের নাম হল ইসলাম। প্রত্যেক মুসলিম আরেক মুসলিমকে তার দল মত নির্বিশেষে ভাই জানবে, এটাই হল ইসলামের নির্দেশনা। কিন্তু আমরা ইসলামের নির্দেশনাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছি। আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا.

তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করো, দলাদলি কোরো

না, ফিরকাবাজি কোরো না, তাফাররুক কোরো না।[১] আমরা এর অর্থ বুঝেছি, তোমরা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু... মানে দল; দল করো তোমরা। উমার রা. বলেছেন, ঐক্য ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ থাকে না। আর ঐক্য মানে দল থাকবে না; আমরা সবাই মুসলিম একদল, এই অনুভূতি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো গ্রুপ থাকতে পারে। সেই গ্রুপগুলো হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো। আমরা প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা করি। কিন্তু এক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র আরেক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র দুইদল; তাদের ভেতর দলাদলির চেতনা থাকবে– এটা ঠিক নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে হাদীসটা আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা বলি,

إِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারিতেও রিওয়াআত এসেছে, অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন...।[২] এটার প্রসঙ্গটাও আপনাদের বলি। ইয়াযীদের সময়ে, ইয়াযীদের অপকর্মের কারণে ৭২/৭৩ হিজরি সালে মদিনাবাসী ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। প্রথমে তারা ইয়াযীদের রাষ্ট্রীয় বাইয়াত গ্রহণ করে, পরে তার অপকর্মের কারণে বিদ্রোহ করে। তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমার, বিদ্রোহীদের যে নেতা, আবু মুতী তাবিয়ি, মশহুর ছিলেন। তাকে এসে বলেন, দেখো, তোমাদের বিদ্রোহটা বৈধ নয়। রাষ্ট্রীয় আনুগত্যটা বজায় রাখা জরুরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ঐক্য জামাআত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সামাজিক ঐক্য বজায় রাখবে। যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য থেকে অথবা রাষ্ট্রের আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, বিদ্রোহ করবে, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করবে। এর কারণ, জাহিলি যুগে আরব দেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। তখন মানুষ কবিলাতান্ত্রিক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আরবের মানুষদেরকে রাষ্ট্রব্যবস্থা দেন।

১. সূরা [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১০৩।
২. সহীহ বুখারি, হাদীস-৭০৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৪৯, ১৮৫১।

আরব ছাড়া বাইরে ইরানে মিশরে রোমে অন্য জায়গায় রাষ্ট্র ছিল। আরবের মানুষেরা রাষ্ট্র চিনত না। বিশেষ করে মূল আরবে। রাষ্ট্র আর কবিলার পার্থক্য কী? কবিলা মানে, আমার বংশের একজন, আমি তার আনুগত্য করব। সে মারা গেছে, তার ছেলে হয়েছে। আর রাষ্ট্র মানে বিভিন্ন কবিলা মিলে যে কোনো একজন মানুষ হবে। আমার কবিলার নয়, শত্রুর কবিলার হতে পারে। কিন্তু আমাকে তার আনুগত্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যদি আগের মতো স্বাতন্ত্র্যবোধ কবিলাতান্ত্রিকতায় লিপ্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন কর, তাহলে কিন্তু আগের মতো জাহিলি জীবনে চলে গেলে।

এইজন্য এই হাদীসের অর্থ হল, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা। সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমাজবিচ্ছিন্ন না হওয়া। সবাই মিলে একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান মেনেছে, আপনি বললেন আমি তাকে মানব না, আমি এই রাষ্ট্রের আইন মানি না। বাস করব রাষ্ট্রে...। এই সমাজবিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচানোর জন্য, এই মর্মে অনেকগুলো হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসের অর্থ একই। যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে হবে। এই জামাআত শব্দের অর্থ দল, গ্রুপ বা সংগঠন নয়। এটা জামাআতের সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ। দল-গ্রুপ-সংগঠন মানে হল ফিরকা, হিযব; এটাকে আরবিতে জামাআত বলা হয় না। তবে কর্মের জন্য একটা গ্রুপ তৈরি করা, ভালো কাজের জন্য একটা গ্রুপ তৈরি করা দোষের কিছু নয়, কিন্তু এটা কুরআন হাদীস নির্দেশিত জামাআত নয়, এটা করলে করতে পারেন। না হলে, আপনার মতো কাজ করবেন বা কাউকে ভালো মনে করলে তাদের সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। কিন্তু এই রকম দল করার মাধ্যমে আমরা ইসলামের ভেতরে দল ঢুকিয়ে...। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ঐক্য ছাড়া মুসলিম হওয়া যায় না। আমরা বলছি, ঐক্য ধ্বংস না করে, দলাদলি না করলে মুসলিম হওয়া যায় না। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন।

(উপস্থাপক: অর্থাৎ আমরা কাজকর্মে যে যাই করি না কেন, কিন্তু চিন্তা-চেতনা এইসব ক্ষেত্রে আমাদের সকলের এক হতে হবে...) ঐক্যটা মূলত মানসিক। আমরা কর্মের জন্য কেউ নোয়াখালী কেউ কুমিল্লা কেউ চিটাগাং-এ, কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ রাজশাহী, কেউ চট্টগ্রাম, কেউ তাবলীগ, কেউ চরমোনাই, বিভিন্ন গ্রুপ হতে পারি। এই গ্রুপটা যদি দীন হয়, তাহলে আমরা দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। গ্রুপটা কর্মের জন্য। আমরা কিছু মানুষ একসাথে একটা ভালো কাজের চেষ্টা করছি। কিন্তু চিন্তাচেতনায় আমরা সবাই কুমিল্লা, নোয়াখালী, মক্কা, মদীনা, এই দল, সেই দল– সকলেই মূলত আমরা একদল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দলের সদস্য ছাড়া কিছুই নই। আমাদের মুসলিম সমাজে এই বিচ্ছিন্নতা এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছে, আমরা কোনো মুসলিমকে বিচার করি তার কিন্তু নেক আমল দিয়ে না; তার ইবাদতের অবস্থা, তার হালাল খাওয়ার অবস্থা (দিয়ে না)। আমরা সবচে' আগে দেখতে চাই, সে আমার দলের কি না...। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা কঠিন গুনাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ বলেছেন, যারা তাদের দীনটাকে ভাগভাগ করে গ্রুপগ্রুপ করে নিয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্কই নেই।[৩] কাজেই, আমরা মুমিনকে বিচার করব তার ভেতরে কতটুকু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রয়েছে। আল্লাহর ইবাদত রাসূলের সুন্নাত কতটুকু আছে। আমরা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় কর্ম করতে পারি। কিন্তু মুমিনের প্রতি সম্পর্ক মূল্যায়নটা হবে কুরআন এবং সুন্নাহ দিয়ে, ইসলাম দিয়ে। তা না হলে এই দলীয় চেতনা তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন খারাপ অবস্থায় নিয়ে যাবে, যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন: ৯০। আজ সারা পৃথিবীর মুসলিমদের যে করুণ দুর্দশা, মুসলিমরা হাজারো ফিরকায় বিভক্ত। আমাদের ঐক্য কীভাবে সম্ভব?

উত্তর: বিভক্তিটা বাস্তব। বিভক্তি আমরাই তৈরি করেছি। ঐক্য এবং

৩. সূরা [৬] আনআম, আয়াত: ১৫৯।

বিভক্তি মূলত মনের ব্যাপার। এটা কলবের ইবাদত। আমাদের প্রথম কাজ হল, আমরা অন্তর দিয়ে সবাইকে ভালোবাসব। দল মত নির্বিশেষে যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে, সে আমার ভাই। আমি তাকে ভালোবাসি। তার ভেতরে ভুল অন্যায় পাপ হাজারো থাকতে পারে। এজন্য সে আমার শত্রু নয়, সে আমার বিপথগামী ভাই। সে ভুলে ডোবা আমার ভাই। যেমন আমরা কোনো নাপাক অপবিত্র কিছু দেখলে ঘৃণা করি, কিন্তু আমার ছোট্ট ছেলে, ছোট্ট ভাই গায়ে অনেক ময়লা লাগিয়ে আমার কাছে আসে, আমি কিন্তু আমার ভাইকে ঘৃণা করি না। ভাইকে ভালোবাসার পাশাপাশি ভাইয়ের গায়ের ময়লা দূর করার ব্যাপারে আমাদের একটা আবেগ থাকে। এটা পরিষ্কার করতে হবে। আমরা আমাদের মনের ভাইকে কখনোই দুশমন মনে করব না। প্রতিটি মুমিন, যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে, সে আমার ভাই। তার ভেতরে যে অন্যায়গুলো আছে, এর জন্য আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব– 'আল্লাহ তাকে ভালো করে দাও'। এটা হল প্রথম ধাপ।

আমরা যতই ঐক্যের কথা বলি, ঐক্য আল্লাহ তাআলার পছন্দ। এবং শয়তান খুব কষ্ট পায়। এজন্য শয়তান এবং তার সাথিরা অনৈক্য তৈরীর জন্য সর্বদা সক্রিয়। বিভিন্ন জায়গায় কয়েক লাখ মসজিদ হয়েছে, এতে শয়তান নারায হয় না। কয়েক হাজার মাদরাসা হয়েছে, এতে শয়তান কষ্ট পায় না। কিন্তু কিছু মানুষ বিভেদ ঝগড়া দূর করে কাছাকাছি হতে যাচ্ছে, এই খবর পড়লে শয়তান অসম্ভব রকমের আহত হয়। এজন্য এটার ব্যাপারে আমরা বুঝি, যারা ঈমানদার তারা কষ্ট পায়। ঐক্য আল্লাহর হুকুম।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

আল্লাহর রজ্জু ধারণ করো ঐক্যবদ্ধভাবে। বিভক্ত দলাদলি কোরো না।[৪] এখানে আমাদের ঐক্যের মূল নির্দেশনা আছে, সেটা হল আল্লাহর

---

৪. সূরা [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১০৩।

রজ্জু। আর আল্লাহর রজ্জু হল কুরআন। আমরা যদি কুরআনটাকে সবাই মেনে নিই, কুরআনে যেটা আছে, সেটাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। আর কুরআন যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহর কথা বলেছে, অন্য জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের নমুনা এসেছে। সুতরাং কুরআন এবং সুন্নাহকে যদি আমরা মূল ধরি। এটাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব, এর বাইরে ইখতিলাফ যেগুলো আছে, এটা যার যার তার তার, এটাকে আমরা গুরুত্ব দেব না। যে যেটা করে করুক। এটা যখন আমরা মেনে নেব, তখন আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করা হবে। তখন আমাদের ঐক্য এসে যাবে।

তৃতীয়ত, অনৈক্যের কথা যারা বলেন, আমাদের সাধারণ মুসলিমদের উচিত, তাদের সাথে একমত না হওয়া। কারণ অনৈক্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতারা লাভবান হন। ভোট সংগ্রহ করেন। আর অনেক সময় ধর্মীয় নেতারা দল ভারী করেন। যদি কোনো ধর্মীয় নেতা অনৈক্যের কথা বলেন, আমরা তাদের জন্য দুআ করব। কিন্তু তার অনৈক্যের কথায় একমত হব না। এবং সকল মুসলিমকে আপন জেনে, ভাই অনুভব করে তার জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করব, যেটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করো এবং বিভক্ত হোয়ো না।

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। সুতরাং শত্রুতা হল বিভক্তি। এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে শত্রু মনে করা। আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা দিলেন, তোমরা ভাইভাই হয়ে গেলে। একজন মুসলিমকে ভাই মনে করা, মহব্বত করা এটা হল ঐক্য।[৫] আমরা

৫. সূরা [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১০৩।

প্রত্যেকে চেষ্টা করব।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঐক্য মানে কিন্তু একমত হওয়া নয়। দলাদলি আর মতভেদ এক না। আমরা যেটা বলি, সবাই আমার মত গ্রহণ করে আমার মুরীদ হয়ে যাক। অথবা আমরা অনেক সময় মনে করি, ঐক্য মানে মতভেদ ভুলে যাওয়া। দূর হয়ে যাওয়া। মতভেদ দূষণীয় নয়। মতভেদ থাকবেই। মতভেদ থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে মতভেদ নেই, এমন কোনো পরিবার নেই। পিতা-পুত্রের মতভেদ নেই, ভাই-ভাই মতভেদ নেই এমন কোনো পরিবার নেই। মানুষ যেহেতু জীবন্ত, মানুষ তো আর রোবট নয়। কাজেই মতের ভিন্নতা এসে যাবে। আমরা অনেক সময় মতভেদ আর বিভক্তিকে এক মনে করে ফেলি। মতভেদ হতে পারে। কিন্তু মতভেদ যখন হৃদয়ে যায়, মতের ভিন্নতার কারণে তাকে ভিন্নদল, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, এটা হল বিভক্তি। আমরা দুটো ভুল করি, একটা হল, আসুন, সবাই একমত হই, অর্থাৎ আমার দলে আসি। এটা যেমন অন্যায়। আসুন, সবাই মতভেদ বর্জন করে একমত হই– এটা অসম্ভব অবাস্তব কথা। প্রত্যেকে নিজনিজ মতসহ আসুন সবাইকে ভালোবাসি। প্রত্যেককে সকল মুসলিমকে একদল মনে করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। একজন অপরজনকে শত্রু মনে করা যাবে না। কারো বিরুদ্ধে গালি দেয়া যাবে না, মতবিরোধ করতে গেলে সম্মানের সাথে করতে হবে। এটা হল ঐক্যের প্রথম ধাপ।

প্রশ্ন: ৯১। দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও অনর্থক গভীর চিন্তা ভাবনার সুযোগ আছে কী?

উত্তর: ভাই যে প্রশ্ন করেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন এবং কুরআনেও নিষেধ আছে।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ.

হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন কোরো না।[৬]

ধর্মের বিষয়ে দীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন ইসলাম নিষেধ করেছে। কিন্তু সমস্যা হল, সীমাটা কী আর লঙ্ঘনটা কী– সেটা আগে জানতে হবে। অনেক সময়, একজন সালাত আদায় করেন না, তাকে সালাত আদায় করতে বললে উনি সীমালঙ্ঘন মনে করেন। ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নেই। এটাও উনি বাড়াবাড়ি মনে করছেন। আবার একজন হয়তো মানুষকে ধর্মের নামে হত্যা করছেন সেটাকে কিছু মনে করছেন না। সীমাটা জানতে হবে। লঙ্ঘনটা কীভাবে হয়, জানতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্নভাবে সীমালঙ্ঘনকে চিত্রায়িত করেছেন। ধর্মের সীমাটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। আর তার বাইরে যাওয়াটা হল লঙ্ঘন। লঙ্ঘন করার বিভিন্ন পর্যায়ে আছে।

ভাই তিনটি বিষয় বলেছেন, অতিরঞ্জন, অনর্থক চিন্তা এবং সীমালঙ্ঘন। সীমালঙ্ঘনের দুটো জিনিস আমাদের আছে। একটা হল নিজের জীবনে দীন পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নতের সীমার বাইরে যাওয়া। অতি বেশি নফল নামায পড়া, অতি বেশি নফল রোযা রাখা, অতি বেশি ইবাদত করা, নিজের সাধ্যের বাইরে ইবাদত চাপিয়ে নেওয়া। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার নিষেধ করেছেন।

إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا، فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.

তোমরা বিরক্ত না হলে আল্লাহ বিরক্ত হবেন না। কাজেই এমন ইবাদত কোরো না, যেন তোমাদের উপরে ক্লান্তি এসে যায়।[৭] যে ব্যক্তি দীনটাকে নিজের জন্য কঠিন করে নিয়েছে সেই অপারগ হয়ে গিয়েছে। এই কঠিন করার একটা দিক এটা যে, আমরা নিজেরা স্বাভাবিক আমল করব, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচওয়াক্ত ফরয নামায

৬. সূরা [৪] নিসা, আয়াত: ১৭১; সূরা [৫] মায়িদা, আয়াত: ৭৭।
৭. মুআত্তা মালিক, হাদীস-২৮৮।

দিয়েছেন। তাহাজ্জুদ সুযোগ পেলে পড়তে হবে, নফল ইবাদত করতে বলেছেন, কিছু নফল রোযা রাখতে বলেছেন। আমরা নিজের জন্যে এমন কিছু করে নিলাম যেটা খুবই কঠিন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন। একজন যুবক সাহাবির বিবাহ দেয়া হয়েছে, স্ত্রীর সাথে সময় কাটান না। ইবাদত বন্দেগিতে কাটান। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেকে বললেন, এটা আমার সুন্নাত না, এটা আমার নিয়ম না। কিছু সময় পরিবার, কিছু সময় এবাদত– এভাবে তোমাকে কাটাতে হবে। এটা একটা দিক।

আরেকটা হল অন্যের ঘাড়ে দীন দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। অর্থাৎ মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। না দিলে লাঠি ধরলাম। মেরেই তোমাকে দীন দিয়ে দেব। এটা ঘটেছে সাহাবিদের যুগে। আলী রাঃ যুগে, খারিজিদের ভেতরে। সহীহ বুখারির শেষ দিকে একটা হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসটা... জুনদুব ইবন জুনাদা... কিছু আবেগী যুবকদের দেখলেন, যারা খারিজি ছিলেন। খারিজিদের কথা ছিল যে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং যারাই বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তারাই প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে অস্ত্র ধারণের প্রবক্তা। মানুষের সৎকাজে আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজে নিষেধ করা– এই অজুহাতে অস্ত্রধারণ করে। তাদেরকে নসিহত করে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ.

যখনই কেউ দীনটাকে কঠিন করে নেয়। সে আর দীন মানতে পারে না।[৮] তারা নিজের জীবন কঠিন করেছে। তারা খুব ইবাদত করত। আর পরের জীবনেও কঠিন করেছে। মানে, কিছু হলেই তাকে মেরে ফেলবে। এটা হল আরেকটা সীমালঙ্ঘন।

আরেক ধরনের সীমালঙ্ঘন ইসলামি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। কুরআন এবং

৮. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০৩৪।

সুন্নাহয় যেটা আছে, এর বাইরে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে যুক্তি দিয়ে কিছু বানিয়ে নেওয়া। কুরআনে আল্লাহ যেটুকু বলেছেন, বিশেষ করে গায়েবি..., আকীদাটা হল গাইবি বিষয়। গায়েবির জিনিস আমরা জানি না। যুক্তি দিয়ে যাওয়া যায় না। আল্লাহ কুরআনে যেটুকু বলেছেন সেটুকু মেনে নেওয়া। যেমন, আমরা বোধহয় আগে আলোচনা করছিলাম, ইসা মসীহ বা অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে। এক্ষেত্রে কুরআন হাদীসে যেটা আছে সেটা মেনে নেওয়া। আল্লাহ ওটা ঘটাবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এটা কি পাশ্চাত্য সভ্যতা নাকি অমুক সভ্যতা, এইটা, সেইটা চিন্তা করা অনুচিত। আকীদার বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সিফাত, জান্নাতের বিষয় জাহান্নামের বিষয়, কবরের বিষয়গুলো নিয়ে, যতটুকু কুরআন সুন্নাহয় আছে, এর বাইরে স্বপ্ন দিয়ে কাশফ দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, যুক্তি দিয়ে কোনো একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়ার চেষ্টা করা, যেখানে আমরা যেতে পারব না বিজ্ঞান দিয়ে। বিজ্ঞান নিয়ে যাওয়া যায় দুনিয়ার ব্যাপারে। আখিরাতের ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে যাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহয় যেটুকু আছে বিশ্বাস না করে আরো কিছু বাড়ানোর চেষ্টা করা– এটা এক ধরনের সীমালঙ্ঘন।

প্রশ্ন: ৯২। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং মাযহাবিদের নামাযের পার্থক্যের ব্যাপারে অনেকে অনেক ইস্যু তৈরি করে। আমরা কীভাবে এটার মোকাবেলা করব?

উত্তর: সিফাতুস সালাত অর্থাৎ নামাযের পদ্ধতি বলতে দাঁড়ানো থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত, আমি হিসাব করে দেখেছি, এই পদ্ধতির ভেতরে এক হাজারেরও বেশি সুন্নাত আমল আছে। প্রথম হল, পা-গুলো কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, সোজা হয়ে দাঁড়ানো, হাত দুটো তোলা, আল্লাহু আকবার বলা, আল্লাহু আকবার কখন বলা, হাত বাঁধা, বিসমিল্লাহ পড়া, না পড়া, সানা পড়া, কোন সানা পড়া, আউযুবিল্লাহ পড়া, সূরা পড়া, সূরা কোন পদ্ধতিতে পড়া, প্রত্যেক

আয়াতে থামা, আমিন বলা, অন্য একটা সূরা পড়া, কোন নামাযে কোন সূরা পড়া, রুকুতে যাওয়ার সময় কী বলা, রুকুতে হাতের আঙুলগুলো কীভাবে থাকা, এরকম করে প্রায় হাজারেরও বেশি কর্ম আছে দুই রাকআত নামাযের ভেতরে। আপনি যে ইস্যুর কথা বললেন, অর্থাৎ ইখতিলাফ, আমি ৫/৬ টার বেশি খুঁজে পাই নি। ১০০০ মাসআলার ভেতরে ৫ থেকে ৬ টার বেশি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই নি। প্রথম পার্থক্য, হাতটা কোথায় বাঁধতে হবে। এর আগ পর্যন্ত কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় পার্থক্য, রুকুতে যাবার সময় রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে কি না। তৃতীয় পার্থক্য সিজদায় যেতে হাত না হাঁটু আগে। চতুর্থ পার্থক্য 'আমীন' জোরে বলা বা আস্তে বলা। পঞ্চম পার্থক্য বসার পদ্ধতি নিয়ে।

আমি কিন্তু এই ৫ টার বেশি আর খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা খুঁজতে থাকেন। ১০০০ এর ভেতরে এই পাঁচটার প্রত্যেকটা মুস্তাহাব পর্যায়ের। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষেরই দলীল আছে। ফরয নামাযের সময় সূরা ফাতিহা পড়বে কি না, এই ব্যাপারে ফরয হারামের কথা বলা হয়, বাকি সব পর্যায়ের মুস্তাহাব পর্যায়ের। এখন আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এগুলোকে দেখব? ১০০০ এর ভেতরে পাঁচটা মতভেদকে বড় করে দেখব– আবার মতভেদগুলো মুস্তাহাব পর্যায়ের– নাকি আমরা সবাই মূলত একই করছি, কিন্তু সামান্য বৈচিত্র্য নিয়ে এবং এই মতভেদগুলোর প্রায় সবই সাহাবিদের যুগ থেকেই চলে আসছে। আমাদের সমাজের ডিভিশন দুই প্রকারের। একটা হল কুরআন হাদীসের কোথাও নেই, সাহাবিরা করেন নি, এটা বিদআত। এ ব্যাপারে আমরা কঠোর। এক্ষেত্রে হক এবং বাতিল। সুন্নাত হক, বিদআত বাতিল। আর যেক্ষেেে হাদীসে একাধিক আছে, সাহাবিদের সময় একাধিক মত ছিল, এক্ষেত্রে হক-বাতিল বলে কিছু নেই। এখানে উত্তম-অনুত্তম আছে। আমরা এক্ষেত্রে বাতিল বললে কিছু হাদীস এবং অনেক সাহাবি বাতিল হয়ে যায়। আমরা তাঁদেরকে মডেল মানি, আল্লাহ তাঁদেরকে মডেল বলেছেন। এজন্য এক্ষেত্রে

আমরা যেটাকে দলীলের আলোকে উত্তম মনে করব, অবশ্যই আমল করব। কিন্তু অন্যের মতটাকে বাতিল বা নামায হবে না– এই পর্যায়ে আমরা না যাই। এটাই সালফে-সালিহীনের রীতি। সাহাবিদের যুগে এরকমই ছিল তাবেয়িদের যুগ এই রকম ছিল। ইশারার ক্ষেত্রে... হানাফির সব মূল কিতাবে আছে, হানাফিরা করে না, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু একটা মাযহাবে আছে। একটাই পার্থক্য আছে, আঙ্গুলটা নড়বে কি না। নড়ার ব্যাপারে একটা সহীহ হাদীস এসেছে, শায়খ শুয়াইব আরনাউত হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন। এছাড়া ইশারা বলতে কেউ হরকত (নড়ানো) বুঝেছেন, আবার কেউ ইশারা বলতে সোজাসুজি ইশারা বলেছেন। এগুলো খুবই মাইনর মতভেদ। ইশারার ব্যাপারে কিন্তু সবাই একমত যে, ইশারা হবে। সুতরাং যে বিষয়টি নিয়ে সাহাবদের থেকে মতভেদ ছিল, এটাতে আমরা নরম হই। আমি সৌদি আরবের আলিমদের কাছ থেকে এটাই বুঝেছি, তারাও এ রকমই করেন। আমরা এক্ষেত্রে সালফে-সালিহীনের মতোই উদার হই। আমি যেটাকে উত্তম মনে করি সেটা পালন করব। আর কেউ যদি আমার দৃষ্টিতে অনুত্তম কিছু করে, এটা নিয়ে তাকে খারাপ না মনে করি। বিদআতে লিপ্তের মতো তাকে ঘৃণা না করি।

তালীম/তাবলীগ

প্রশ্ন: ৯৩। তাওহীদ সম্পর্কে অল্পকিছু জানা মুসলিম আমি। নিজেদের ইলম বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আমাদের সমাজের দায়িত্ব কী?

উত্তর: দাওয়াত! দাওয়াত কিন্তু আমাদের সামাজিক দায়িত্ব না, ঈমানি দায়িত্ব। এজন্য আমরা অবশ্যই দাওয়াত দেব। তবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

আল্লাহর দীন সহজ। মানুষকে সুসংবাদ দেন। তাদেরকে দুঃসংবাদ দিয়েন না।[১] আমরা হুজুররা যখন ওয়ায করতে শুরু করি, একদম সবাইকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই। এটা কিন্তু দাওয়াত না। ভাই! আপনি একটু নামায পড়েন, আল্লাহ মাফ করবেন, আল্লাহর কাছে তওবা করেন, নিরাশ হবেন না। ছোটখাটো মতভেদকে বড় না করে তুলে... আপনি নামায পড়েন, তাওহীদ মানেন, ঈমানটা বোঝেন। আমরা সহীহ সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াত নিয়ে বেরিয়ে যাই। তবে, মূলনীতি হবে, وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا - সুসংবাদ দাও, ভয় দেখায়ো না। ভয়ের কথাগুলো একটু সুসংবাদের কায়দায় বলার চেষ্টা করব আবেগ দিয়ে বলার চেষ্টা করি। এবং يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا - সহজ করি, কঠিন না করি। এভাবে দাওয়াতে যাওয়া আমাদের এই মুহূর্তে ফরযে আইন।

প্রশ্ন: ৯৪। বাচ্চাদের আলিম বানাতে হলে বাংলাদেশে কী কী

১. সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭৩৪।

প্রতিষ্ঠান আছে?

উত্তর: খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমার অনুরোধ হল, আপনারা প্রতিষ্ঠান বানান। বাংলাদেশ আলিম তৈরির প্রতিষ্ঠান খুবই কম। যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আলহামদু লিল্লাহ কিছুটা কাজ হচ্ছে। আলিয়া মাদরাসাগুলো শেষ হয়ে গেছে। আলিয়া মাদরাসায় আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বিত ছিল। বর্তমানে সরকার এখানে পরিপূর্ণ স্কুল সিলেবাস দিয়ে দিয়েছেন। আপনি মেট্রিক পরীক্ষা দেবেন ১০০০ নাম্বারে, দাখিল পরীক্ষা দেবেন ১৩০০ নাম্বারে। স্কুলের সবকিছু পড়ার পরে কিছুটা কুরআন-হাদীস পড়তে পারবেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল, তারা পড়বে না এবং আমরা মাদরাসার উস্তাদরা নাম্বার দিতে বাধ্য হব। তা না হলে মাদরাসার মঞ্জুরি বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের চেয়ে মাদরাসায় পড়া ছেলেমেয়েদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের কে আলিম বানাতে হবে। এজন্য আমার অনুরোধ হল, ইসলাম খুবই সহজ, আরবিভাষা সহজ ভাষা। মেধাবী ছাত্ররা খুব সহজে এসব আয়ত্ত করতে পারে। আপনারা দয়া করে যাদের ভেতরে ক্ষমতা আছে, আপনারা সবাই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের মাদরাসা এখন হচ্ছে কিছু। ডাক্তার জাকির নায়েক স্কুল করেছেন, এটা আলিম তৈরি করে না, এটা ভালো মুসলিম তৈরি করে। এটা একটা টার্গেট। খুব ভালো টার্গেট। কিন্তু যদি আলিম তৈরি বন্ধ হয়ে যায় উম্মাত বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। আপনি স্কুল পর্যায়ের সকল ছাত্রকে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান দিয়ে দিলেন, এর মানে এই নয়, যে দেশে আর ডাক্তার লাগবে না। ডাক্তারকে তো লাগবেই। এক্সপার্ট ডাক্তার লাগতেই হবে। এক্সপার্ট আলিম আমাদেরকে তৈরি করতেই হবে। এ ব্যাপারে ভালো প্রতিষ্ঠানে তৈরি করেন। বর্তমানে কিছু কিছু কওমি মাদরাসা আছে, শিক্ষা দিচ্ছে। আলিয়া মাদরাসাও আছে কিছু। কিন্তু এখান থেকে ভালো আলিম বের হচ্ছে না। আপনারা যারা সমাজ ও দীন নিয়ে চিন্তা করেন তারা অন্তত এটা হোক যে, সেখানে ভদ্র

পরিবারের ছেলেরা ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, সমাজসহ ভালো আলিম হতে পারবে। আমরা জানি, আলিম হলে বর্তমানে সরকারি চাকরি কোনো ব্যাপার না। এর বাইরে প্রচুর উপার্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। আমি কওমি মাদরাসার ছাত্রদের সম্পর্কে জানি, একদম টোটাল কোনো ডিগ্রি নেই, ইন্টারনেট এক্সপার্ট হয়ে গেছে, লক্ষলক্ষ টাকা ইনকাম করছে। সম্মানের সাথে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করছেন তারা। আমি একজন হাফিযের বেতন দেই ২০ হাজার টাকা। আর আমার প্রতিষ্ঠান, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার্স পাশ করে সাতলক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে ১২ হাজার টাকার চাকরি নিয়েছে, এমপিওভুক্ত একটা কলেজে!

প্রশ্ন: ৯৫। আমরা বাংলাদেশে যারা আলিম-উলামা রয়েছি, যারা ইসলামটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছি, যেটা যুবক বা তরুণ প্রজন্মের কাছে কঠিন মনে হয়। অথচ আমরা ইউরোপ বা বিভিন্ন দেশে দেখি, যুবকরা খুব সহজে ইসলামকে বোঝার সুযোগ পায়। নামাযে দাঁড়িয়ে যায়।

উত্তর: এর কারণ হল আমরা শুনে মুসলমান। আল্লাহ বলেছেন পড়ে মুসলিম হও। আল্লাহ বলেছেন, 'ইকরা'-পড়ো। কুরআন হাদীস সুন্নাহ যদি আমরা পড়ি, তাহলে আমরা বুঝব, দীনের চেয়ে সহজ কিছু নেই। সালাতের মূল বিষয় হল, সালাত আমার জন্য। আমি সালাত আদায়ের মাধ্যমে মনটাকে সুন্দর করব। আমার আবেগ আল্লাহকে জানাব। যেমন আমি খাদ্য খাই। খাদ্য খাওয়া যেমন আমার নিজের জন্য, সালাত আমার আত্মার খাদ্য, এটা আমার জন্য। আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন, সালাত আদায় করব। টুপি থাকলে, আলহামদু লিল্লাহ, না থাকলে টুপি ছাড়াই। এটাই দীনের বিধান। যেখানে যেভাবে আছে, সালাত আদায় আমাকে করতেই হবে। যেমন খাদ্য খাব, খুব ভালো তরকারি হলে ভালো। নইলে যেটা আছে সেটাই খাব। খেতেই হবে। কারণ খাওয়াটা আমার জন্য

প্রয়োজন। এজন্য, আমরা সালাতের আনুষ্ঠানিকতাকে এত গুরুত্ব দিয়েছি, এর জীবনমুখিতাকে নষ্ট করে ফেলেছি। কাপড় নেই, টুপি নেই, সূরা কিরাআত জানি না, সালাত পড়ব না– আমরা এগুলো বলেছি। কিন্তু সালাত অন্যরকম। টুপি থাকলে ভালো, সুরা ফাতেহা জানলে ভালো। নইলে ওগুলো ছাড়াই আমাকে সালাত আদায় করতে হবে। সালাতের ভেতরে আমি আল্লাহকে স্মরণ করব। এটাই আমার মূল ইবাদত। এখানে আমাদের আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে, ইবাদতটা কার জন্য? ইমাম সাহেবের জন্য? মুয়াযযিন সাহেবের জন্য? পুরোহিতের জন্য? না আমার জন্য? আমার জন্য। কারণ ইবাদত তো আমার নিজের জন্য। ইসলাম সহজ শুধু নয়, আসলে আল্লাহ তাআলা দীন দিয়েছেন আমার জন্য। আমি সালাতের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত, আমরা সারাদিন যে জীবন যাপন করি, টেনশন আসে, উৎকণ্ঠা আসে ভয় আসে, লোভ আসে, আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাই, যখন সালাত আদায় করি, দৈহিকভাবে ফ্রেশ হই, আমরা ওযু করি; আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, যতটুক পারি আল্লাহ সাথে কথা বলি। আল্লাহর প্রশংসা করি। আল্লাহর কাছে দুআ করি। আমাদের মন আবার সুন্দর হয়ে যায়। ঠিক এই জন্য আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

সেই মুমিন সফল যারা সালাতের মধ্যে মনোযোগী।[২] এজন্য আমাকে আমার ভালোটা বুঝতে হবে।

প্রশ্ন: ৯৬। আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এখন খ্রিস্টান মিশনারিদের কিছু তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুসলিমদেরকে ঈসা মাসীহের ধর্মে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের মুসলিম হিসেবে, দায়ি হিসেবে আমরা কী করতে পারি বলে আপনি মনে করেন?

---

২. সূরা [২৩] মু'মিনূন, আয়াত: ১-২।

উত্তর: বর্তমানে বিষয়টা অনেক উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং প্রবাসেও অনেকেই বিষয়টা জানতে পারছেন। জানতে চাচ্ছেনও অনেকেই। বিষয়টা হল, সাধারণভাবে অনেক আগে থেকেই খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের ভেতরে একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, মুসলিম ধর্মান্তরিত হয় না। দীর্ঘদিন ধরে তারা চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশরা আসার পরে। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের পরে আঠারো সালের দিক থেকে ব্যাপক চেষ্টা করেছেন। তারা সফল হন নি। এই ব্যারিয়ার ভাঙার জন্য ১৯৭৮ সালে আমেরিকার কলোরাডো স্টেটে একটা নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স অন মুসলিম এভানযেলাইজেশন। মুসলিমদেরকে ইঞ্জিলিকরণ বা খ্রিস্টানিকরণ বিষয়ে একটা কনফারেন্স করা হয়। সেখানে তারা সিদ্ধান্ত নেন, মুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত বলা যাবে না। খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে ইসলামিক পরিভাষায়..., ধর্মান্তর করলে তাদেরকে বলতে হবে তরীকা পরিবর্তন। বিগত প্রায় বিশ পঁচিশ বছর ধরেই খ্রিস্ট ধর্মীয় বইগুলোকে ইসলামিক পরিভাষায় লেখা হচ্ছে। এবং তাদের সকল বই, সকল প্রচারণায়, পাদ্রি বাদ দিয়ে ইমাম, যাজক বাদ দিয়ে ইমাম, ফাদার বাদ দিয়ে আব্বাজান হুজুর বা এরকম সবকিছু ইসলামি পরিভাষায় ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি একটি কৌশল। এর ভেতরে বড় কৌশল হল, তারা বলেন, আমরা খ্রিস্টান নই। ওই যে আপনারা ইয়াহুদি, খ্রিস্টান বলেন? আমরা ওরকম খ্রিস্টান না। আমরা মুসলিম। তবে ঈসায়ি তরীকার মুসলিম। আমরা মুহাম্মাদ ﷺ কে মানি, কুরআন মানি, আমরা সব-ই মানি। তবে ঈসা নবীর তরীকা অনুসরণ করে। এবং তারা আগে যেটা ধর্মান্তর বলতেন এখন সেটাকে বলেন তরীকাবন্দি। এবং কখনো বলেন ঈসায়ি তরীকায় মুরীদ করা। ব্যাপ্টাইজ করার নামে তারা ঠিকই পানি ছিটান বা নদীতে নামিয়ে দেন। কিন্তু বলেন আমরা ঈসায়ি তরীকায় মুরীদ করছি। এটা হল একটা দিক।

দ্বিতীয়ত তারা ধর্মান্তরকরণে অনেকটাই সফল। তাদের টার্গেট ছিল

২০১৫ সালের ভেতর বাংলাদেশের one-third এবং ২০৪০-৪৫ সালের ভেতরে বাংলাদেশের মেজরিটি মানুষকে খ্রিস্টান করবেন। এই ২০১৫ এর ভেতরেই তিনভাগের একভাগ, মানে পাঁচকোটি মুসলিম খ্রিস্টান করবেন। এরকম একটা টার্গেট তাদের ছিল। এখানে ষোলআনা সফল না হলেও তাদের সফলতা ব্যাপক। বাংলাদেশের উপজাতি এলাকা ছাড়াও দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি, পশ্চিমে সাতক্ষীরা এবং বর্তমানে প্রতিটি জেলাতেই তাদের অনেক প্রচারক রয়েছেন। তাদেরকে তারা মুবাল্লিগ বলেন। প্রিচার বলেন না। ইসলামি শব্দ ব্যবহার করেন। প্রত্যেকেই ডোর টু ডোর যান। তাদেরকে রিপোর্ট দিতে হয় যে, কতজনকে তারা ধর্মান্তরিত করলেন। বিভিন্ন জায়গায় তারা বিভিন্ন কৌশল নিয়েছেন। ধর্মান্তর করে তারা কোনো নাম পরিবর্তন করেন না। তুমি মুসলিম। তুমি মসজিদে যাবে, ঈদে মীলাদুন্নবীতে যাবে। আমরা মুসলিম, তবে ঈসায়ি তরীকার মুসলিম। আমি ঈসায়ি তরীকায় চলব। ওদের সাথে মিশবে, খাওয়া-দাওয়া করবে, কোনো সমস্যা নেই। এভাবেই তারা চলেন। আর একটা হল কুরআন দিয়ে ঈসায়ি ধর্ম প্রমাণের চেষ্টা করেন। তারা বলেন, আমরা কুরআন মানি। কুরআনকে সম্মান করি। দুঃখজনক! ধর্ম প্রচার তো কোনো দোষের কিছু নয়। তার ধর্ম তিনি প্রচার করবেন, কিন্তু মিথ্যা বললে, কষ্ট লাগে। তারা বলবে আমরা কুরআন মানি।

প্রথমে তারা কুরআন পড়তে দেয় এবং বলে, কুরআনের এই আয়াতে ঈসা নবীর কথা আছে, তাহলে ঈসাকে মানব না কেন?! ঈসা, আল্লাহর কালিমা, বলা আছে। আল্লাহর কালিমা মানে আল্লাহর যাতের অংশ। কাজেই আমরা তাদের মানব না কেন? আল্লাহ কুরআনে বলেছেন বা মুসলিমরা বিশ্বাস করে, ঈসা নবী জীবিত। মুহাম্মাদ ﷺ মৃত। কাজেই ঈসাকেও মানতে হবে। মুসলিমদের সরল বিশ্বাসকে তারা এক্সপ্লয়েড করার চেষ্টা করছে। প্রথমে খুব ভালো, এরপরে যখন প্রকৃত খ্রিস্টান হতে যায় তখন তাদেরকে বলে কুরআন মাটিতে রেখে

তার ওপর দাঁড়াতে হবে অথবা পেশাব করতে হবে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমরা প্রশ্ন করি, ভাই, বিশ্বে আর এমন কোনো ধর্ম নেই যে ধর্মান্তর করার জন্য অন্য ধর্মের গ্রন্থকে অপমান করতে বলে। লক্ষ্য কোটি মানুষ মুসলিম হয়। কেউ বলে না যে, বাইবেলকে অপমান করতে হবে। এমনকি মুসলিমেরা যখন আমেরিকা, ইউরোপের বা খ্রিস্টান পাদ্রিদের কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদ করে, তখন তারা প্রতিবাদ করে, অন্যায় করে, মারধর করে, ভাঙচুর করে, কিন্তু বাইবেল নিয়ে আগুনে দেয় না। এটা অসম্ভব। অন্য ধর্মগ্রন্থকে অপমান করব, এটা কল্পনাই করে না তারা। অথচ তোমরা বলছ, তোমরা শান্তির মানুষ। কিন্ত তোমাদের প্রথম কথা হল কুরআন অথবা হিন্দুদের ক্ষেত্রে বেদ, গীতা ইত্যাদি পোড়াতে হবে। একভাই, তিনি খ্রিস্টান হয়েছেন। মুসলিমের ছেলে। আমরা গিয়ে তাকে বোঝালাম, দেখো, এগুলো যে ভুল কথা। এই দেখো বাইবেলে লেখা আছে, ইঞ্জিলে এটা আছে। তিনি বললেন, দেখেন সবই তো বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার পেছনে সাতবছর থেকে, তারা আমাকে কুরআনের উপর দাঁড় করিয়ে খ্রিস্টান বানিয়েছে। কীভাবে হঠাৎ করে বাদ দেবে? তাদের প্রচারণার অনেক কৌশল সুন্দর। ধৈর্য। একজনকে টার্গেট করে বছরের পর বছর পেছনে লেগে থাকতে পারে। আরেকজন মুসলিমের ছেলে। ঈসায়ি মুসলিম হয়েছেন বলে দাবি করতেন। নানান আজেবাজে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে বলতেন। ইমাম সাহেবকে বেশি খোঁচাতেন। কারণ আমাদের সমাজে ইমাম সাহেবরা দুর্বল। ছেলেটা হঠাৎ মারা যায়। মারা গেলে সমাজের লোকেরা জানাযা পড়তে বলে। তিনি (ইমাম) বলেন, এর জানাযা পড়া যাবে না। সে নবীজির বিরুদ্ধে, কুরআনের বিরুদ্ধে অনেক নোংরা কথা বলত। এখন ওই যুবকেরা ধরেছে ইমাম সাহেবকে, আপনি কেন জানাযা পড়াবেন না? কী হয়েছে? না পারলে আপনাকে চাকরি থেকে ছাটাই করে দেওয়া হবে, ইত্যাদি। তখন ওই ছেলেটার ক্রন্দনরত মা বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ইমাম সাহেবের কথা ঠিক, আমার ছেলের

জানাযা করা যাবে না। আমি নিজে দেখেছি ও কুরআন মাটিতে রেখে তার উপর পেশাব করে।

এভাবে তারা যদি তাদের কথাই ঠিক থাকতেন, সমস্যা ছিল না। কিন্তু তারা আসলে এখানে মিথ্যার আশ্রয় নেন। যে, আমরা কুরআন মানি, মুহাম্মাদ ﷺ কে মানি , শ্রদ্ধা করি। আমরা ঈসায়ি তরীকায় চলি। খ্রিস্টান মিশনারির ভাইয়েরা যুবকদের কাছে টানেন, হাদিয়া দেন, বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠান করেন, সামাজিক অনুষ্ঠান করেন। নতুন নতুন যারা মুরতাদ, যারা খ্রিস্টান হয়েছেন, কিছু ইমাম হয়েছেন। তারা কৌশল ব্যাপক পরিবর্তন করেছে এবং কৌশলের কারণে তারা সফলতা পাচ্ছেন। তারা সফলতা পাচ্ছেন, কারণ তারা মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করতে চায় না। কিন্তু তরীকা পরিবর্তন বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য সহজ। কারণ বিভিন্ন তরীকা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। এভাবে তারা ধর্মান্তর করছেন। ধর্মান্তরকারীদেরকে সমাজের মেশানোর জন্য চেষ্টা করছেন, পূনর্বাসনের চেষ্টা করছেন। আরেকটা কৌশল আছে, যেটা হল শিক্ষা ও চিকিৎসা। যেমন দিনাজপুরে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের আছে। সেখানে মুসলিমদের ছেলে-মেয়ে পড়ে। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুপুরে ফ্রি খাবার দেওয়া হয়। খাবার দেওয়ার আগে প্রার্থনা করা হয়। পিতা-পুত্রের নামে প্রার্থনা করা হয়, ঈসা মসীহের নামে প্রার্থনা করা হয়। মুসলিমদের ছেলে-মেয়েরাও করে। কিন্তু এটা যে শিরক, এটা তাদের বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না। মুনাজাত হচ্ছে। আরবিভাষা ব্যবহার করেন। আসেন মুনাজাত করি ঈসা মসীহের নামে, পিতার নামে, পবিত্র আত্মার নামে মুনাজাত করা হয়, এভাবে ধীরেধীরে আমাদের সন্তানদেরকে ওই পথে নেওয়ার জন্য। এবং তারা খুব ধৈর্য্যশীল। বছরের পর বছর। পঁচিশবছর কষ্ট করতে রাজি। একজন তার ধর্ম পালন করতে দূর থেকে ছুটে এসেছেন। বছরের পর বছর বাংলাদেশ পড়ে আছেন এটা তো তার দৃষ্টিতে এবং যেকোনো মানুষের বিচারে পজিটিভ। হ্যাঁ, তিনি মিথ্যা বলছেন। তারা প্রতারণা করছেন, এটা

কষ্টের কথা।

কিন্তু আমাদের বড় ভুল হল..., আমাদের বাংলাদেশের মুসলিমদের কথা বলি, আমাদের ভেতরে প্রান্তিকতা, দলাদলি এত কঠিন হয়ে গিয়েছে– যেমন এক এলাকায় কিছু মানুষ খ্রিস্টান হয়েছে, আমরা জানতে পেরে সেখানে একটা দাওয়াতি কাফেলা পাঠালাম। সেখানে মানুষেরা কিছু সালাফি বা নতুনভাবে সহীহ হাদীস মানার চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছেন। তারা তাবলীগকে ঘৃণা করেন। এখন আমাদের কাফেলাগুলো তাবলীগের মতোই গিয়েছেন যে, মসজিদের থেকে আশপাশের মুসল্লিদেরকে, খ্রিস্টান যারা হয়েছেন, তাদেরকে একটু বোঝাবে। কুরআন নিয়ে, বাইবেল নিয়ে। তাদের সেভাবে ট্রেনিংও আছে, প্রশিক্ষণ আছে, যে মিথ্যাগুলো তারা বলেন, তা ধরিয়ে দেয়ার মতো। এখন আমাদের সহীহ হাদীসপন্থী ভাইয়েদের কথা হল, মুসলিম খ্রিস্টান হয়েছে, সেটা আমরা দেখব, কিন্তু তাবলীগ মসজিদে ঢুকতে দেব না। পরে আমি তাদের সাথে কথা বললাম, ভাই আপনারা কী পেয়েছেন? মুসলিম খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের দায়িদেরকে ঢুকতে দিচ্ছেন না? পরে তারা ঢুকতে দিলেন। আরেক মসজিদে পাঠালাম, তারা মীলাদকে পছন্দ করেন। সেখানে যখন তারা শুনেছে যে, কিছু মানুষ আসছে তাবলীগের সাথি, যারা মীলাদ কিয়াম পছন্দ করে না, সেখানে মসজিদে ঢোকার পরে তিনি মীলাদ শুরু করে দিলেন। এদেরকে কথাই বলতে দিলেন না। মীলাদ এর পর মীলাদ চলতে থাকল।

এই সঙ্কটের যে ব্যাপকতা, এর জন্য একটা ছোট কথা মনে পড়ল। সিঙ্গাপুর থেকে এক প্রবাসী ভাই বলেছেন, সেখানেও বাংলা ভাষাভাষী কমিউনিটির ভেতরে বাংলাভাষায় কথা বলেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ। বাংলা ভাষায় কথা বলছেন, বাঙালিদেরকে ফোনে ডেকে নিচ্ছেন, গল্প করছেন, বন্ধুত্ব করছেন, তাদের চার্চে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদেরকে বলছেন আপনার মুসলিমরা খুব

ভালো। আপনাদের সব ঠিক আছে তবে ঈসা নবীর নাম যেহেতু কুরআনে আছে, তাকে আল্লাহর পুত্র এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস না করলে আপনারা জান্নাতে যেতে পারবেন না। অর্থাৎ বিশ্বের সকল জায়গাতেই তারা চেষ্টা করছেন, প্রত্যেক দেশের জন্য পৃথক পৃথক প্রচারক রয়েছেন। সেই দেশের ভাষা শিখে, সে দেশে দাওয়াতে পাঠাচ্ছেন। আরেক ভাই আমাকে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসলেন। সম্ভবত ব্রাজিল থেকে তাকে মোবাইলে চ্যাট করার নামে তাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছেন। এরকম তার ভেতরে কিছু সন্দেহ তৈরি করে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হল, প্রথমত আমাদের সন্তানদেরকে দীনের ভেতরে লালন-পালন করা। আরেকটা যেটা আমরা সকলে অবহেলা করি, সেটা হল দাওয়াত না দেওয়া। আমরা মুসলিম আমাদের আশেপাশে যে যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজে আমাদের আশেপাশে অনেক মুসলিম আছেন যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম নন। অর্থাৎ মুসলিম কিন্তু দীন পালন করছেন না। আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি অথবা অবজ্ঞা করি, কিন্তু দাওয়াত দিই না। তাদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। আর বিশেষ করে যারা বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে আমেরিকার মতো সমাজে বাস করেন, তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে, বাইবেল সম্পর্কে, ঈসা মসীহ সম্পর্কে, ইয়াহুদি ধর্ম সম্পর্কে ইসলামি স্কলারদের গবেষণা পড়া দরকার, অধ্যায়ন করা দরকার। এ ব্যাপারে ধারণা থাকা দরকার। কারণ গ্লোবালাইজেশনের যুগে সব ধরনের মানুষ পরস্পরের কাছে আসবে। কাজেই আমাদের সন্তানেরাও এগুলো জানবে। এরপর ইসলামি আখলাক আমাদের মানুষদের সামনে তুলে ধরতে হবে, যে আখলাক মানুষদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসবে। আমরা মুসলিমদেরকে যত বেশি প্যাক্টিজিং করতে পারব, ততই তাদের ভেতর থেকে অন্য ধর্মের আকর্ষণ, অন্য ধর্মের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সুযোগ কমে যাবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কুরআনেই নিয়ম বলে দিয়েছেন:

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

[উত্তমপন্থায় প্রতিহত করো।][৩]

কথা তারা হয়তো... যখন কিছু মিথ্যা বলেন বা কিছু জিনিস খারাপ বলেন অথবা কুরআন আগুনে দেন অথবা কুরআনের বিরুদ্ধে কিছু বলেন, কুরআন পুড়াতে বলেন, আমাদের কষ্ট লাগবে, কিন্তু আমরা কিন্তু অনুরূপ কিছু করতে পারব না। আমরা সুন্দর ভাষায়, সুন্দর আচরণে আমরা দাওয়াতটা দিতে থাকব। আমাদের উদ্দেশ্য দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে তাদের খারাপ কাজটার প্রতিহিংসা নেওয়া নয় যে, আমাদের মনে কষ্ট হয়েছে রাগটা ঝেড়ে দিলাম। উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধানমতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেখানো পথে মানুষদেরকে আল্লাহর কথা বলা।

প্রশ্ন: ৯৭। ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ফেসবুক ব্যবহারে তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করাও কি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত?

উত্তর: ফেসবুক একটা নেশা। ওরা এর মধ্যে এসব গভীরভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমাদের এখানে হতাশার কিছু নেই। আমাদেরও এর ভেতরে দীনকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা খুবই দরকার। সমস্যা যেটা হয়েছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া টেলিভিশন শুরু হওয়ার পরপরই খ্রিস্টানরা সহজেই ওটাকে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের আলিমরা এ নিয়ে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব করেছে। আর আমরা, 'করব না', 'নাজায়িয' 'হালাল হারাম' করতে করতে ওরা পুরোটা দখল করে ফেলেছে। এজন্য এখন আলিমদের, দায়িদের এগুলো ব্যবহার করা দরকার। বর্জন করে লাভ নেই।

প্রশ্ন: ৯৮। পৃথিবীতে মানবপাচার বেড়ে যাচ্ছে এবং সারা পৃথিবীতে অভিবাসীদেরকে প্রবলেম হিসাবে দেখা যাচ্ছে। অভিবাসীরা সাগরে ভাসছে। কেউ তাদের উদ্ধার করার নেই। যে পৃথিবীতে আজকে

৩. সূরা [৪১] ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৪।

মানবতার অধিকারের ব্যাপারে সবাই আমরা সোচ্চার। সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? এই সঙ্কটাপন্ন মানবতার জন্য আমাদের কী দায়িত্ব রয়েছে?

উত্তর: এখানে অনেকগুলো দায়িত্ব রয়েছে। আমরা ইসলামিক পারস্পেক্টিভে কথা বলব, যেটা দীনের বিধান। প্রথম কথা হল, যারা মানব পাচার করছেন, এরা হল অত্যন্ত বড় ধরনের অপরাধ করছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরা অনেক টাকাপয়সাওয়ালা মানুষ হওয়াতে অর্জিত টাকা দিয়ে তারা আইনের বাইরে চলে যেতে পারছেন। কাজেই মানবপাচারের ক্রাইমের জন্য মূলত দেশের আইন ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যবস্থা পুরোপুরি ইনভলভ হয়ে যায়। মানুষ দরিদ্র, এটা ঠিক। মানুষ অভাবে রয়েছে, এটাও ঠিক। কিন্তু মানুষ দরিদ্র হলেও দেশে বাস করতে পারে। যখন একজন চটকদার লোভ দেখায় যে, তুমি অমুক জায়গায় চলো, এটা হবে, সেটা হবে। একদিকে বাস্তব দারিদ্রের কষ্ট। আরেকদিকে অবাস্তব একটা স্বপ্ন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই স্বপ্ন দেখিয়ে যারা প্রতারণা করেন এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা এটা শরীআতের বড় নির্দেশ। এবং এখানেই মূল সমস্যা হয়ে গিয়েছে। এই লোকগুলোর টাকা কামাই করছেন এবং এই টাকাটা বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে তারা আইনের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছেন। ইসলামের নির্দেশনা হল, এদেরকে ধরা এবং যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া। এবং এই অপরাধের দরজাগুলো বন্ধ করা

দ্বিতীয়ত মানুষ কখন পালিয়ে অন্য দেশে যেতে চায়? যখন সেই দেশে বসবাস কষ্টকর হয়। একজন তুরস্কের মানুষ কিন্তু নৌকায় পাড়ি দিয়ে গ্রীসে যাওয়ার চেষ্টা করে না। চেষ্টা করে কে? একজন মরক্কের মানুষ অথবা তিনি লিবিয়ার মানুষ। কারণ ওদের দেশে বসবাসটা কষ্টকর। এজন্য আল্লাহ তাআলা যে ইনসাফ ব্যবস্থা দিয়েছেন, এটা যদি প্রত্যেক দেশের মানুষ, আমরা সবাই মিলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

করতাম তাহলে মানুষ আর এভাবে জীবনকে বাজি রাখত না। তৃতীয়ত ঈমানি চেতনা। আমাদের ভেতরে যদি ঈমানি চেতনা পূর্ণ হয়, তাহলে এসব হত না। আমরা অনেক সময় দেখি, একজন মানুষ দুই-তিন লাখ টাকা দিয়ে বিদেশে গিয়েছে। সে এখন বিদেশে গিয়ে রাস্তা ঝাড়ু দেয় অথবা বাথরুম সাফ করে। তাদেরকে আমরা বলেছি যে, আপনি এই কাজটা বাংলাদেশে করতেন? তখন তারা বলে, ভাই, বাংলাদেশে যদি আমরা এই ধরণের কাজ করি, আমাদের মান সম্মান থাকে না। আমাদের দেশে কায়িক শ্রমকে অপছন্দ করা হয়। এটা কে 'কোমা' কাজ মনে করা হয়। এটা ঈমানি চেতনার অভাব। ইসলামে কায়িক শ্রমকে নবী-রাসূলের কাজ বলা হয়েছে।

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ

আল্লাহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তারা কায়িক পরিশ্রম করেছেন, রাখাল হয়েছেন।[৪] কেউ কামার, কুমোরের কাজ করেছেন। এই যে কর্ম আমাদের ধর্ম। কর্ম সবচেয়ে বড় ইবাদত, এই চেতনার অভাব আছে। অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কর্মমুখী নয়। অনেক দেশে শিক্ষা কর্মমুখী। কাজেই আমরা যদি আমাদের দেশের মানুষকে কর্মমুখী করে তুলি বা সব মুসলিম দেশের মানুষগুলোকে কর্মমুখী করি তাহলে এটা একটা বড় সমাধান হয়। আরেকটা হল, কর্মের সুযোগের অনুপস্থিতি। অর্থাৎ একজনের যোগ্যতা আছে, কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। আরেকজন অযোগ্য লোক চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। হয় দুর্নীতির মাধ্যমে অথবা রাজনীতির প্রভাবের মাধ্যমে, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে। এটা রোধ না করলে এই কষ্ট দূর করা যাবে না। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ইসলামি ব্যবস্থা, ইসলামি চেতনা আসলে এটা করা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

কিছু মানুষ দেশ ছাড়েন জুলুমের কারণে। যেমন রোহিঙ্গারা দেশ ছাড়ছেন। এটাও আমাদের মানবতার একটা অপমান। বিশ্বে

৪. সহীহ বুখারি, হাদীস-২২৬২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২১৪৯।

মানবাধিকারের কথা, গ্লোবালাইজেশনের কথা, এতকিছু বলার পরেও একদেশে শতশত বছর ধরে বসবাসকারী একটা জনগোষ্ঠীকে এইভাবে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, হত্যা করা হবে বর্বরভাবে। আমরা তাদেরকে পরদেশি বলে ওই ভাবেই রেখে দেব। আবার দেখা যাচ্ছে, কোথাও একটি সামান্য ঘটনা নিয়ে সে দেশে আমরা সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে দেশ দখল করে ফেলছি মানবতা রক্ষার জন্য। এটা আমাদের দ্বৈতনীতি, অত্যাচার বা মুনাফিকির একটা প্রকাশ মাত্র। এসকল ক্ষেত্রে সকল মজলুম মানুষগুলোকে আশ্রয় দেওয়া ঈমানের দাবি এবং মানবতার ন্যূনতম দাবি। দুর্ভাগ্য হল যে, অনেক দেশের মানুষ আল্লাহ তাআলা তাদের তৌফিক দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু তারা কৃপণ। মানুষ যত বড়লোক হয় তত কৃপণ হয়, যে কারণে তারা এ ধরনের অল্প কিছু মানুষকে দেশে নিতে চায় না। আবার তাদের দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতাও করছেন না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা আশা করি বিভিন্ন দেশের মানুষ সচেতন হবেন।

প্রশ্ন: ৯৯। ইসলামের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক সহায়তার কিছু ধারণা পেয়েছি। একদল বিভ্রান্ত যুবকে দিয়ে এই ষড়যন্ত্রকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। জেনে অথবা না জেনে মিডিয়ার উপরে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। এক্ষেত্রে আমাদের দাওয়াতের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিবেন।

উত্তর: আসলেই এটা বাস্তব সত্য। আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে, এদেশের মানুষ আস্তিক এবং ধর্মপ্রাণ। মুসলিমদের ভেতরে শতকরা ১৫ জন প্র্যাকটিসিং মুসলিম বাকি ৮৫ জন প্র্যাক্টিসিং না হলেও ইসলামকে শ্রদ্ধা করে, কুরআনকে ভালোবাসে। তারা নিজেদেরকে কোনো অবস্থায়ই ইসলামবিরোধী মানতে রাজি না। দেশের রাজনীতি এই ৮৫ ভাগ মানুষই নিয়ন্ত্রণ করে। এরা ইসলাম বিরোধীও নন, আবার ইসলাম প্র্যাক্টিসিংও নন। আমাদের সমাজে এক শতাংশেরও কম নাস্তিক আছে। তারা যে কোনো মূল্যে এ দেশ থেকে ইসলামি

মূল্যবোধ দূর করতে চান। তারা সংখ্যায় অতিঅল্প, কিন্তু অর্থনীতি মিডিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী। আমাদের দায়িদের ভুল আছে। বাংলাদেশের মাত্র ১৫% মুসলিম, আমরা আমাদের অন্তত ৩০ থেকে ৪০ পার্সেন্টকে ইসলাম না বুঝিয়ে আগেই রাজনীতির মাধ্যমে ইসলাম ইসলামকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টার মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়াটা হয়েছে, ইসলামের শত্রুরা ভেবেছে বাংলাদেশ মনে হয় তালেবান হয়ে গেল। তারা প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আমাদের দেশ থেকে ইসলামি মূল্যবোধ নষ্ট করার চেষ্টা করছেন মিডিয়ার মাধ্যমে। এটা বাস্তবতা। আর এ জন্যই কয়েকশ' নাস্তিক কয়েক কোটি আস্তিক জনগোষ্ঠীকে অচল করে রেখেছেন। যারা রাজনীতি করেন তারা রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হয়তোবা তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছেন।

আমাদের যেটা করতে হবে, প্রথম কথা, আমি আমার বইগুলোতে লিখেছি, আমি রাজনীতিবিমুখ নই। রাজনীতির ভালো মন্দ আমার এই **এহইয়াউস সুনান** এবং **ইসলামের নামে জঙ্গিবাদে** এনেছি। সেটা হল, অবশ্যই ইসলামি রাজনীতি থাকবে। তবে অধিকাংশ দীনদার আলিমদের জন্য ক্ষমতার রাজনীতি নয়, জাতীয় সংস্কারের রাজনীতি থাকবে। এখানে দুটো জিনিস আছে, একটা হল আমাদের যেটা গণতান্ত্রিক রাজনীতি, সেটা হল, তুমি ক্ষমতা থেকে যাও আমি ক্ষমতায় গিয়ে সব ঠিক করে ফেলব। আর সালফে সালিহীনের যে রাজনীতি দেখতে পাই, তুমি ক্ষমতায় থাকলে এটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, তোমাকে এইভাবে চলতে হবে না হলে আল্লাহর গযব তোমার উপর আসবে। জনগণকে আমি তোমার ব্যাপারে বলব। ক্ষমতার রাজনীতি অবশ্যই থাকবে। একদল ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের দাওয়াত হবে রাজনীতি সচেতন, কিন্তু ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আমাদের এই দিকে অন্তত একটি ধারা তৈরি করা জরুরি। দুই নাম্বার হল, আমরা যেটা দেখছি সেটা সাময়িক। কোনো খেলা শুরু শেষ করা এত সহজ না। কাজেই এটা বেশিদিন

থাকবে না। সাময়িক বিষয়ের চেয়েও আমাদের স্থায়ী বিষয়ের দিকে এগোনো দরকার।

আসলে ব্যাপারটা যা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কুরআন উঠে গেছে, ইসলাম উঠে গেছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন কুরআন নিয়ে উঠতে পারে, এজন্য আমাদের প্রাথমিকে প্রাক-প্রাথমিকে কুরআন শিক্ষা, কুরআন বুঝার ব্যবস্থা করা জরুরি। আপনারা সবাই চেষ্টা করেন। দেশের অধিকাংশ মানুষ চায় যে, শিশুরা কুরআন শিখুক। প্রাইমারি তো কুরআন নেই। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এখন এনজিওদের দখলে। আমাদের কোটিকোটি সন্তান কুরআন থেকে মুক্ত হয়ে গড়ে উঠছে। ইসলামও জানে না, কিছুই জানে না। আমরা যদি এটা রোধ করতে না পারি, উপর থেকে কিছু দিয়ে আমরা উম্মাতকে বাঁচাতে পারব না। কাজেই কুরআনের শিক্ষা প্রচার করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে যেকোনো ভাবে কুরআন পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলে এসেছে, বলে, স্যার, আমরা ইসলাম নিয়ে জানতে চাই। আমরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানি না। যার কাছেই যাই, কেউ আহলে হাদীস বানায়, কেউ পীর সাহেব বানায়। আমাদেরকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মৌলিক ইসলাম শিক্ষা সুযোগ করে দেন। আসলেই আমাদের দেশে এসব নেই। একটা যুবক সহজে দল-মতের ঊর্ধ্বে ইসলাম শিখবে এমন ব্যবস্থা নেই। আমরা প্রত্যেকে নিজের আঙ্গিকে লিখি। দলমতের ঊর্ধ্বে শিক্ষামূলক কোনো বই নেই। এজন্য আমাদের উচিত তাদের জন্য কোর্স তৈরি করা, উইক-এন্ড তৈরি করা। এগুলো যদি আমরা ব্যাপকভাবে না ছড়াতে পারি, তাহলে উম্মাতের অবস্থা মোটেও ভালো না। আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন।

প্রশ্ন: ১০০। ইদানিং নারী এবং শিশু নির্যাতন মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। ইসলাম এই অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কী বলে?

উত্তর: ইসলামের সঙ্গে আমাদের আধুনিক সভ্যতার পার্থক্য মূলত এক জায়গায়। ইসলাম বলছে যে, এই অবস্থা আনতে গেলে, যে কারণে এটা ঘটছে সেই মৌলিক পথগুলোকে বন্ধ করতে হবে। আর না ঘটার জন্য মৌলিক ব্যবস্থা নিতে হবে। ধরেন, আমরা একটা মানুষের সুস্থতা চাই। সবাই বলছে সুস্থ হতে হবে। একজন ডাক্তার বলছেন সুস্থ হতে গেলে, যে যে কারণে আপনার অসুস্থতা সেগুলোকে বন্ধ করতে হবে এবং যে যে কারণে সুস্থতা আসবে– আপনাকে নিয়মিত হাঁটতে হবে, আপনার নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে; আর সুস্থ থাকার জন্য টেনশন, ধূমপান, মদপান– এগুলো বন্ধ করতে হবে। তাহলে আপনি সুস্থ হবেন। আর একজন বলছে এসব কিছুই লাগবে না। আপনি ট্যাবলেট খান সুস্থ হয়ে যাবেন। এটা হল আমাদের পার্থক্য।

সারা বিশ্বে নারী এবং শিশুদের উপরে অত্যাচারের প্রবণতা মারাত্মক বেড়ে গেছে। এটার কারণ অনেকগুলো। একটা কারণ মিডিয়া। মিডিয়াতে নাটকের নামে, সিনেমার নামে যেগুলো দেখানো হচ্ছে এগুলো এটার একটা কারণ। মানুষের ভেতরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। যখন আমাদের শিশু-কিশোরেরা, একেবারে পাঁচসাত বছরের বাচ্চারা, তারা খেলা করতে কিন্তু গুলি করা বোঝে। গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে আর একটা গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া বোঝে। কারণ তাদের বিনোদনের নামে যেটা শেখানো হচ্ছে সেটা হল ভায়োলেন্স। তাদের ভেতরে মানুষকে সাহায্য করা, উপহার দেওয়া, হাসিখুশি– সেগুলো কিন্তু বিনোদনের নামে এখন আর নেই। এখন বিনোদনটাই হয়ে গেছে অপরাধ।

আমার ছোট্ট বাচ্চাটা আনন্দ পাবে গুলি করে কাউকে ফেলে দিয়ে। গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে আর একটা গাড়িকে ফেলে দিয়ে। এটাতেই সে আনন্দ পায়, অথবা মিথ্যা বলে কাউকে ফাঁকি দিল। কিছু কার্টুনে এগুলো দেখানো হয়। আমরা এভাবে তাদের ভেতরে এগুলো

ঢুকিয়েছি। একটু বড় হয়ে তারা যে বিনোদনগুলো পায়, সেগুলোতে মাদকতা অশালীনতা উস্কে দিচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে ভয়ঙ্কর অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে, এটা তরুণ প্রজন্মের ভেতরে পশু প্রবৃত্তিটাকে উস্কে দিচ্ছে। এগুলো যদি আমরা বন্ধ না করি, নিয়ন্ত্রণ না করি...!

নারীদের উপর আক্রমণের জন্য ইসলাম যেটা দিয়েছে, নারীদেরকে শালীন পোশাক পরতে হবে। নারীর পরিবারকে সংহত করতে হবে। পারিবারিক জীবনব্যবস্থা, পারিবারিক সম্প্রীতিকে বাড়াতে হবে। এজন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা দিয়েছে, একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা। এটাকে কেটে ব্যবহার করা যায় না। আর পারিবারিক সম্প্রীতি বাড়াতে হবে, নারী-পুরুষকে শালীন পোশাক পরতে হবে, ধর্মীয় মূল্যবোধ বাড়াতে হবে। যেগুলো মানুষকে পশুত্বের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো কমাতে হবে। এটাকে যদি আমরা মৌলবাদিতা বলি, এটা ধার্মিকতা বলি। হতে পারে। কিন্তু এর বাইরের কোনো টোটকা দিয়ে এর কোনো চিকিৎসা হবে না।

আমরা ছোটকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জুতা আবিষ্কার নামে একটি কবিতা পড়েছিলাম। রাজা হবুচন্দ্র বললেন, আমার পায়ে ধুলা লাগবে কেন? মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে বললেন, আমার পায়ে যেন ধুলা না লাগে। তিনি সারা দেশটাকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দিতে চাইলেন। কিন্তু এত চামড়া কোথায় পাবেন? রাজা রাগ করলেন, আমার পায়ের ধূলা লাগানো তিনদিনের মধ্যে বন্ধ করতে না পারলে তোমাদের সকলকে কতল করা হবে। সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তৃতীয় দিনে এক মুচি আসল। তখনকার মানুষ জুতা চিনত না। মুচি এসে বলছে, রাজামশাই একটু আসতে চাই। রাজামশাই তাকে আসতে বললেন। মুচি এসে রাজা মশাইয়ের পায়ের কাছে এসে দুটো চামড়ার থলি বের করে দুই পায়ে চামড়ার টুকরো দুটো বেঁধে দিয়ে বলল, রাজামশাই! সারা দুনিয়া চামড়া দিয়ে ঢাকা যায় না। নিজের পাদুটো চামড়া দিয়ে ঢাকালেই

ধুলো থেকে বাঁচা যায়।

এটা বলার উদ্দেশ্য হল, বিশ্বব্যবস্থা আমরা হয়তো পরিবর্তন করতে পারব না। মিডিয়া যারা নিয়ন্ত্রণ করেন, অশ্লীলতা প্রচার করেন, মাদকের প্রসারে যারা কাজ করেন, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কারণ তাদের ক্ষমতা আছে, টাকা আছে। আমি যেটা করব, আমার সন্তানকে আমি সালাত শেখাব, কুরআন শেখাব, পর্দা শেখাব। তাহলে দুনিয়ার সবাই অশ্লীলতায় পড়ে গেলেও বিশ্বব্যবস্থায় অশালীনতা বেড়ে গেলেও আমার ছেলে ধর্ষক হবে না, হত্যাকারী হবে না, আমার মেয়ে ধর্ষিত হবে না। টিজড হবে না। এটা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বিশ্ব ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন, কিন্তু নিজের পাদুটো চামড়া দিয়ে ঢেকে নেয়া সহজ। আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে সালাত শেখাই, ধার্মিকতা শেখাই, পর্দা শেখাই, স্বাধীনতা শেখাই, ইনশাআল্লাহ, আমরা বেঁচে থাকতে পারব।

প্রশ্ন: ১০১। কুরুচিপূর্ণ ব্লগারকে মেরে পালিয়ে যাওয়াকে ইসলাম কী চোখে দেখে?

উত্তর: এর দুটো দিক আছে। ইসলাম সকল কিছুকেই আইনের ভেতরে আনতে চায়। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া যায় না। এটা কিন্তু ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তার অপরাধ কতটুকু, সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কি না, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। সহীহ বুখারিতে এসেছে, উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেছেন, আমি নিজে যদি কাউকে দেখি শরীআতের শাস্তিমূলক ব্যভিচার করছে, চুরি করছে, মদ খাচ্ছে– তিনি যেহেতু রাতে বের হতেন, এজন্যই প্রশ্নটা করলেন– তাহলে আমি শাস্তি দিতে পারব কি না। সাহাবি আব্দুর রাহমান ইবন আউফ, আলী رضي الله عنه বললেন, না! আপনি তো শাস্তি দিতে পারবেনই না...

شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المسْلِمِينَ

আপনি তাকে কোর্টে দেবেন। আপনি সাক্ষী দেবেন যে আপনি দেখেছেন। সে ক্ষেত্রে আপনি একজন সাক্ষী হবেন, রাষ্ট্রপ্রধান বলে আপনার সাক্ষ্যের দুটো দাম হবে না।৫ এর অর্থ হল উনি যদি কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখেন, উনি উনার মন্ত্রী গার্ড তিনজন দেখেন, চতুর্থ সাক্ষী না হয়, তাইলে উনাদের তিনজনের পিঠে আশি ঘা বেত্রাঘাত করা হবে। অর্থাৎ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলাম এত কড়াকড়ি করেছে, অপরাধী বেঁচে যাক, কিন্তু নিরাপরাধ যেন কোনো শাস্তি না পায়। এটা হল একটা দিক। দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাপার হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে যদি কেউ কুরুচিপূর্ণ নোংরা কথা বলে এবং হঠাৎ করে ওই কথাটা শুনে যদি রাগের মাথায় মেরে ফেলে, ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কিন্তু এর মৃত্যুদণ্ড হলেও এই ক্ষেত্রে তার ওযর ইসলাম কবুল করবে। ইসলামের আইনে গেলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না। যদিও ইসলাম এই কাজটা উৎসাহ দেয় না। কিন্তু কাজটা করে ফেললে মৃত্যুদণ্ড হবে না। এই হল দুটো দিক।

প্রশ্নঃ ১০২। আমার সামনে আল্লাহর রাসূলকে কেউ গালি দিলে, আমি যদি তাকে খুন করে ফেলি, তাহলে আমার পাপ হবে?

উত্তরঃ কেউ যদি খুন করে ফেলে ইসলামি আইনে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না। যদি সত্যিই সে আবেগের বশে করে ফেলে। কিন্তু ইসলাম এটাকে উৎসাহ দেয় না। ইসলাম বলে, কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারবে না। এটা কিন্তু অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক নেতার নামে, বাবার নামে, গালি দিলে কিন্তু এই শাস্তি না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে কুরুচিপূর্ণ কথা বললে কেউ যদি React করে তাহলে ইসলামি আইনে তার মৃত্যুদণ্ড হয় না।

৫. সহীহ বুখারি ৯/৬৯; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৫৪৫৬।
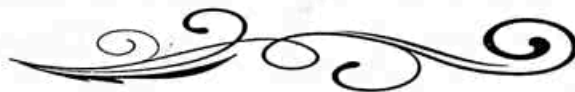
বিবিধ

প্রশ্ন: ১০৩। আমরা সম্প্রতি নেপালে যে ভূমিকম্প দেখতে পেয়েছি, সেখানে অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে এবং তার প্রভাবে আমাদের বাংলাদেশেও হয়েছে কিছুটা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করেছেন। সে রকম বড় কোনো দূর্ঘটনা হয় নি। আমার প্রশ্ন হল, ভূমিকম্প কেন হয়? এটা আযাব, নাকি প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা?

উত্তর: 'প্রাকৃতিক' কথাটার একটা মজা আছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃতি মানে ঈশ্বর। আমরা যদিও আল্লাহকে ঈশ্বর, গড, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি বলতে অনেক সময় সংকোচ বোধ করি। মৌলবাদী মৌলবাদী একটা ঘ্রাণ আসে। কিন্তু প্রকৃতি মানেও কিন্তু... পুরুষ বা প্রকৃতি মানেও ঈশ্বর। দ্বিতীয় কথা হল, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে কে? একটা নার্গিস বা আয়লা বা সাইক্লোন ছুটে আসছে, আমরা দেখছি। আমাদের আবহাওয়া পূর্বাভাসে ছুটে আসছে এত গতিতে, এই দিকে। এই গতিতে চললে এমন জায়গায় আঘাত করবে। হঠাৎ গতি পরিবর্তন হল। একই গতিতে চলল না, গতি পাল্টে গেল, গতি বেড়ে গেল, কমে গেল। কে নিয়ন্ত্রণ করে? আমরা ইসলামি চেতনায় বিশ্বাস করি, এ প্রকৃতি বা নেচার যা-ই আছে না কেন, এটা সবকিছু আল্লাহ তৈরি করেছেন। এটাকে একটা সিস্টেমে দিয়েছেন। পাশাপাশি সিস্টেমটাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে

যেটা বোঝায়, এ প্রাকৃতিক দুর্যোগটাও আল্লাহতালার অনাদি অনন্ত ইলম, জ্ঞান, হেকমতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আমরা যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখি, প্রার্থনা দুআ...। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোনো দুর্যোগের আগে দুআ করতেন। আল্লাহ দিযো না। এবং কুরআন বারবার বলেছে, এই যে বিশ্বে যেসব দুর্যোগ আসে, এটা আল্লাহ তাআলা এজন্য দেন, যেন মানুষ তওবা করে ভালো হয়। ধর্মের বিধিবিধান দুই ধরনের। একটা হল ব্যক্তিগত। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। সালাত, সিয়াম, জিকির ইত্যাদি। আরেকটা হল মানুষের সাথে সম্পর্ক, সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক।

কুরআন এবং হাদীস থেকে আমরা দেখি, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো মূলত আল্লাহতালার গযব। এটা কখন আসবে? যখন মানুষের অধিকার নষ্ট হয়, ওযনে কম দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া, ধর্ষণ, জুলুম জড়িয়ে পড়া, মাদকাসক্তি ছড়িয়ে পড়া, অশ্লীলতা বেড়ে যাওয়া। যেগুলো মানুষের অধিকার নষ্ট করে, পরিবার নষ্ট করে , মানুষের চোখে পানি বাড়িয়ে দেয়, ক্রন্দন বাড়িয়ে দেয়, ইনসাফ নিশ্চিত করে না– এ ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর গযব বেশি দেন। যখন এটা সমাজে ব্যাপক হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে থাকে না। সামাজিক পর্যায়ে চলে যায়। এজন্য গযব আসে । আল্লাহ প্রথমে ছোট দেন। যদি মানুষ তওবা না করে, বড় গযব দেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে বলেছেন। এজন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ– যেটাই বলি না কেন! এই দুর্যোগ গযব। এগুলো আল্লাহ তাআলা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আয়াত, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন। তোমরা দেখো, তোমাদের সকল শক্তির সকল কিছুসহই তোমরা অসহায়।

আমরা অনেক সময় বলি এটাকে মোকাবেলা করব। মোকাবেলা করার মতো একটা প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এটা কি আদৌ মোকাবেলা

করা সম্ভব? না! এটাকে মোকাবেলা করা যায় না। দুর্যোগে প্রস্তুতি নেওয়া ভালো কাজ। আল্লাহ না করুক কোনো দুর্যোগ হয়ে গেলে, দুর্যোগের আগের প্রস্তুতি; যেমন সাইক্লোন আমাদের দেশে ঘটে। বিভিন্ন দেশে ঘটে। আগে প্রস্তুতি নিতে বলা, ইসলামে নির্দেশ যে, তোমরা কোনো সমস্যার আগে প্রস্তুতি নাও। কুরআনে ইউসুফ ﵇ এর ঘটনা আছে। তিনি দূর্যোগের কথা জেনে প্রস্তুতি নিয়েছেন। অর্থাৎ দুর্যোগের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি, এটা ভালো। কিন্ত মোকাবেলা বলতে, প্রতিরোধ করা। দুর্যোগ তো প্রতিরোধ করা যায় না। দুর্যোগ আসবে যখন আমি ঠেকাব– এটা তো অসম্ভব ব্যাপার। একটা হল নৈতিক প্রস্তুতি, একটা হল আল্লাহতালার সাথে সর্ম্পকের প্রস্তুতি। সমাজ থেকে জুলুম অনাচার দূর করা, আল্লাহর হক, বান্দার হক প্রতিষ্ঠা করা, অশ্লীলতা, অশালীনতা দূর করা। এর পরেও যদি ঘটে, এর জন্য যত সম্ভব কম ক্ষয়-ক্ষতি হওয়া– যেমন ইউসুফ ﵇ । আল্লাহ কুরআনে আমাদেরকে দেখিয়েছেন নববি জ্ঞানের মাধ্যমে। আগে থেকে সংরক্ষণ করেছেন সম্পদ, যেন দূর্ভিক্ষের সময় মানুষ বিপদে না পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরকম পাওয়া যায়। এই জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে, এটা শরীআত বিরোধী না। কিন্তু প্রস্তুতির পাশাপাশি... মূল প্রস্তুতি কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। অর্থাৎ আমি জুলুম উঠালাম না, বেইনসাফ উঠালাম না, মানুষ বিচারের অভাবে কাঁদতে লাগল, নিরাপরাধের রক্ত ঝরতে লাগল, অশ্লীলতা-অশালীনতা পরিবার ধ্বংস করতে লাগল, আর আমি কিছু চাল ডাল জমা করে রাখলাম অথবা দুর্যোগ প্রতিরোধে বড়বড় বিল্ডিং শক্ত করে বানালাম। এটার নাম কিন্তু প্রস্তুতি নয়। ইসলামি পরিভাষায় প্রস্তুতি হল নৈতিক প্রার্থনার, আত্মার। এবং এই প্রস্তুতি একসাথে লাগবে।

প্রশ্নঃ ১০৪। সম্প্রতি আমরা দেখতে পারছি বাংলাদেশে ধর্ষণ বেড়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের উপজাতিদের উপর নির্যাতন বেড়ে গেছে।

এই বাড়ার কারণটা কী?

উত্তর: আসলে কারণটা তো আমরা জানি। বিষয়টা হল, আপনি যখন নৈতিক অবক্ষয়কে মেনে নিচ্ছেন। আমরা ধর্ষণের প্রতিবাদ করছি। কিন্তু ধর্ষণ উস্কে দেয় যেগুলো, সেগুলো কিন্তু বন্ধ করছি না। তাহলে তো এটা হতেই থাকবে, আমরা ঠেকাতে পারব না। এখানে বিষয় হল, যাকেই দুর্বল পাওয়া হচ্ছে তার উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। সমাজে যে দুর্বল, সমাজপতিরা তার সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে, তাকে বিনা বিচারে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাকে ধর্ষণ করছে। আর এই দুর্বলদের বিচার পেতে কষ্ট হয়। এই দুর্বলদের ভেতরে সংখ্যালঘুরাও রয়েছেন। তারা সামাজিকভাবে দুর্বল। দুর্বলদের ভিতরে উপজাতিরাও রয়েছেন। তারা সামাজিকভাবে দুর্বল। অথবা যারা ধর্ষক সে লক্ষ্য করে নি সে উপজাতি না সংখ্যালঘু। সে লক্ষ্য করেছে এটাকে হাতের কাছে শিকার হিসেবে পাওয়া গেছে । যেমন একটা পশু যখন শিকার করে, তখন ওই শিকার কোন জাতের হরিণ এটা সে বোঝে না। তার আওতার ভেতরে হরিণ অথবা খরগোশ যেটাই আছে, সে শিকার করে।

বর্তমান সভ্যতা পাশবিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। লক্ষ্য করেন, আগে আমাদের নাটক, উপন্যাস, গল্পে পেতাম দানের আনন্দ। একজন মানুষকে জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে, আনন্দ পাচ্ছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে আরেকজনকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে, এর ভিতরে একটা আনন্দ আছে, যা চোখে পানি এনে দেয়। সাহিত্যের এ বিষয়গুলো আমাদের ভেতরে মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করত। এখন আপনি দেখেন, ভিডিও গেম বলেন, আর বিনোদন বলেন– এখানে একদিকে অশালীনতা, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, আরেকদিকে ভায়োলেন্সের ছড়াছড়ি। আমি মাঝে মাঝে দেখি আমাদের শিশুদের জন্য যে ভিডিও গেমসগুলো... খ্যাট খ্যাট করে মেরে দাও, হত্যা করো অথবা ধাক্কা মেরে ফেলে দাও। একটা গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে আরেকটা গাড়ি ফেলে দাও।

অর্থাৎ শুধু হত্যা এবং ধ্বংসের আনন্দ। জীবন দাও, বাঁচাও– এসব কোথাও নেই। একজন গরীব পানিতে ডুবে যাচ্ছে, আরেকজন তাকে বাঁচাচ্ছে। একজন অসহায় মানুষকে বাঁচানোর ভেতর যে আনন্দ আছে সেটার অনুশীলনটা হচ্ছে না। না বিনোদনে, না গেমসে। আর সমাজেও এর কোনো প্রচার হচ্ছে না। এইগুলো প্রচার হয় ধর্মীয় অনুভূতির ভেতর দিয়ে।

যেকোনো ধর্ম মানুষের কাছে যাওয়া শেখায়। এর পুরস্কারটা আখিরাতে। আমরা মনে করি, ধর্ম বাদ দিয়েই মূল্যবোধ শেখাব, এটা আসলে হয় না। আমরা যখন বলি; যদি বলি, তুমি ভালো কাজ করো; কিন্তু ভালোর মূল্যায়নটা আমি পাচ্ছি না। খারাপের মূল্যায়ন নগদ পাচ্ছি। তখন মানুষ খারাপের দিকে চলে যায়। কাজেই যদি সমাজ থেকে অশালীনতা, অশ্লীলতা, উস্কানিমূলক সাহিত্য, নাটক, সিনেমা বন্ধ করতে না পারি, মূল্যবোধ বাড়িয়ে দেওয়ার মতো সাহিত্য, বিনোদন তৈরি করতে না পারি, তাহলে আমাদেরকে এক সময় এ ধর্ষণকে মেনে নিয়ে চলতে হবে। এটাকে 'দুষ্টামি' নাম দিতে হবে। আমরা মনে করি, এসব ইউরোপে বা পাশ্চাত্যে নেই। আমরা সেদিনও রিপোর্ট পড়লাম, পাশ্চাত্যে নারীদের উপর ধর্ষণ ব্যাপকভাবে বাড়ছে। ... ছিল এবং আছে। অনেকে বলতে চান না। কত জায়গায় বলবেন? কিন্তু ইচ্ছার বাইরে মহিলাদেরকে অত্যাচার করাটা ব্যাপক।

একটা ঘটনা মনে পড়ল। আমি যখন সৌদি আরব ছিলাম, এটা সম্ভবত ১৯৯৬ এর দিকের কথা। একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে আসলেন। আমরা একটা ইসলামিক সেন্টারে কাজ করতাম। যেখানে ইসলামি দাওয়াহমূলক কিছু কাজ হত। যে কেউ ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারত। ওই ভদ্রলোক তার এক ফিলিস্তিনি বন্ধুর সাথে আমার কাছে আসলেন। ভদ্রলোকটি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। উনি ব্রিটিশ ইংরেজি বলেন। আমি

একটু সামান্য ভাঙাচোরা ইংরেজি পারতাম। এজন্য আমার কাছে নিয়ে আসল। তো, উনি অনেক কথা বললেন। তার মূল কথা ছিল ইসলামের অনেক কিছু ভালো। তাওহীদ যেটা (monotheism) এটা যৌক্তিক। তার কথা, আমাদের খ্রিস্টধর্মে ট্রিনিটি যেটা, ঈশ্বর একজন আবার তিনজন। তিনজন আবার একজন। এটা কোনো যুক্তিতে হয় না। ইসলামের অনেক কিছুই আমার ভালো লাগে। কিন্তু ইসলামের দুটো জিনিস আমার পছন্দ হয় না। একটা হল মদ নিষেধ। মদ না খেলে ভালো লাগে না। আরেকটা হল মেয়েদেরকে সেগ্রিগ্রেট করা হয়েছে, বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এটা আমি মোটেও অনুমোদন করতে পারি না। তাই আমি মদের কথা বললাম। দেখেন, মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য একটাই। সেটা চেতনা। আর মানুষ যখন মদ খেয়ে মাতাল হয় তখন পশুর মতো হয়ে যায়। আপনি যদি নিজে ইচ্ছা করে পশু হতে চান তাহলে আমার কিছু বলার নেই। ইসলাম এটা অনুমোদন করে না। আর মেয়েদের ব্যাপারে বললাম, দেখেন! আপনারা তো ব্রিটেনে থাকেন, শতভাগ শিক্ষিত। আপনাদের দেশে এমনি নারী-পুরুষের স্বেচ্ছায় একত্রিত হওয়ার বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু তারপরও অনিচ্ছাকৃত অত্যাচার বা হ্যারাসমেন্ট কেমন হয়? তিনি বললেন, ব্যাপক। বললাম, কেন? আপনারা তো সুশিক্ষিত এবং সবার জন্য সবকিছু সুযোগ রয়েছে। উনি কিছু বললেন না। তখন আমি বললাম, দেখেন ইসলাম আসলে মেয়েদের সেগ্রিগ্রেট করে নি। ইসলাম শুধু শালীন পোশাক এর মাধ্যমে মেয়েদেরকে প্রটেক্ট করেছে যে, মেয়েরা সমাজে যাবে, চাকরি করবে, কর্ম করবে। কিন্তু তারা এমন একটা পোশাক পরবে, যে পোশাকে প্রথম নজরে তাকে লেডি মনে হবে। ওম্যান বা গার্ল মনে হবে না। ভদ্রমহিলা; পোশাক যেন বলে এই মেয়েটা ভদ্রমহিলা। ইনি দুষ্টুমি করার মহিলা না। এটা তাকে প্রটেক্ট করবে। আমরা যদি এই শালীন পোশাক, এই শালীনতা, এটাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আবার যুবকদের ভেতরে,

পুরুষের ভিতরে শালীনতাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে পারি, আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবকিছু দিয়ে, তাহলেই এটা থেকে আমরা রক্ষা পাব। না হলে আমরা এমন এক জায়গায় যাব, যেখানে এটাকে চোখ বুজে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

প্রশ্ন: ১০৫। আমার প্রথম ছেলের বয়স ১৬ মাস, আর দ্বিতীয় ছেলের বয়স ১ মাস। তো, আমি এই মুহূর্তে আর্থিক সমস্যার মধ্যে আছি। আমার জন্য কি জন্মনিয়ন্ত্রণ করা জায়িয হবে?

উত্তর: জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মূলনীতি হল, এটা এক ধরনের চিকিৎসা। আমাদের দুটো বিষয় বিশ্বাসের জগতে রাখতে হবে। একটা হল, আল্লাহ তাআলা যাকে জন্ম দেবেন, তাকে দেবেন। অর্থাৎ যার মৃত্যু দেবেন, তার দেবেন। যার সুস্থতা দেবেন, তাকে দেবেন। তবে এই বিশ্বাসের সাথে চিকিৎসা নিষিদ্ধ নয়। যদি সেটা শরীআতসম্মত হয়। এজন্য জন্মবিরতিকরণ বৈধ। যদি কোনো মুমিন মনে করেন, আপাতত আমার সন্তান নেওয়া দরকার নেই। আমি চেষ্টা করি, যদি একটু দেরি হয়, ভালো। বেশি সন্তান গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। তবে যদি কোনো মুমিন মনে করেন, আমার একটু দেরি করে নিলে ভালো কিংবা আমি একটু বিরতি করব, কিছুদিন সময় নেব, অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেটাতে শরীআতের কোনো বিধি-নিষেধ অমান্য হয় না, কাউকে সতর দেখাতে হয় না। এই ধরনের অস্থায়ী বিরতিকরণ বিলম্বিতকরণ প্রক্রিয়া শরীআতে বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে আযল ব্যবস্থা অনেকেই নিয়েছেন। ফুকাহারাদের মধ্যে আবু হানীফা, মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ ইবন হাম্বাল (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআলা আজমাঈন) মোটামুটি সবাই একমত যে এই ধরনের অস্থায়ী বিরতিকরণের প্রচেষ্টা বৈধ।

(উপস্থাপক: আমাদের কাছে যিনি প্রশ্ন করলেন, কথার মধ্যে এসেছে

যে, দুটি সন্তানের পরে আর্থিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, তো, আর্থিক ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কি জন্মবিরতিকরণ ঠিক হবে?) আমরা অনেক সময় মনে করি, যে রিযিক তো আল্লাহর হাতে। কাজেই, আর্থিক চিন্তা করলে বোধহয় এটা... । বিষয়টা আমরা একটু দেখি, আমার শরীরটা খুবই খারাপ। আমি মরে যেতে পারি, কাজেই চিকিৎসা করব। এটা মুমিন যখন চিন্তা করে, তার মানে এই না যে মুমিন মনে করে, আমি আল্লাহর সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলব। সে চিন্তা করে, একটু চেষ্টা করে দেখি। আমি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, কাজেই বিবাহটা এখন করব না, দুমাস লেট করব, হারাম হবে কি না? তাও হবে না। কাজেই এটা মুমিনের চিন্তার জগতের মূল অবস্থা। যদি মনে করেন যে, এখন আপাতত আমার সামগ্রিক অবস্থা ভালো না, অর্থনৈতিক বা শারীরিক, আমি আমার জন্য বিলম্ব করার চেষ্টা করলে ভালো হয়, দেখি বিলম্ব হয় কি না। যদিও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি বিলম্ব করলেও অর্থনীতি ভালো হতে পারে, নাও পারে। এটাই বাস্তবতা। আমার অবস্থা অনেক বিলম্ব করার পরেও অনেক পরিবার আছেন, অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যেই আছেন। এটা বিশ্বাসসহ যদি কেউ মনে করেন, বর্তমান অবস্থা আমার এরকম, আমি যদি বিলম্ব করি, চেষ্টা করে দেখি, কী হয়। এটা চিকিৎসার মতোই একটা বিষয়। যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে... যখন আমার মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে, আমি চিন্তা করলাম, আমি ওষুধটা খাব। কিন্তু আমার এখানে বিশ্বাস আছে, ব্যথাটা দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এই চেতনাসহ যদি মানুষ নিজের পারিপার্শ্বিকতার কারণে বিলম্ব করার চেষ্টা করেন এবং তার ইয়াকীন থাকে যে, তার রিযক, তার সুস্থতা সবকিছুর মালিক আল্লাহ। স্বাভাবিক যেটা আমার মনে হচ্ছে, এজন্য আমি একটু চেষ্টা করি, এবং এজন্য কোনো শরীআতবিরোধী স্থায়ী বন্ধ্যা করা হারাম! কিন্তু অস্থায়ী বিলম্বিতকরণ, এটা আমি যতটুকু জানি, ফিকহের কিতাবে রয়েছে, এই ব্যাপারে অনেক স্টাডি রয়েছে।

ফুকাহারাও এই ধরনের অস্থায়ী বিলম্বিতকরণ জায়িয বলেছেন। সাহাবিদের সময়ে আযলের যেটা হত, সেটা অর্থনৈতিক কারণেই। এটা তারা অর্থনৈতিক কারণেই চিন্তা করত।

প্রশ্ন: ১০৬। হাদীসে আগুন দিয়ে প্রাণি নিধন নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাট দিয়ে কি মশা মারা যাবে?

উত্তর: এটা না ব্যবহার করতে পারলেই ভালো। এখানে প্রশ্ন হল এটা পুড়ে মরে, নাকি মরে পোড়ে। যদি পুড়ে মরে তাহলে এটা ব্যবহার ঠিক হবে না। আর যদি এমন হয় মরে পোড়ে, হাইভোল্টেজ শক এর মধ্যে পড়ে যায়, আগে যদি মরে তারপরে পোড়ে, তাহলে আশা করি নাজায়িয হবে না।

প্রশ্ন: ১০৭। সড়ক দুর্ঘটনায় যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তবে কি তাকে শহীদ বলা যাবে?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের বললেন, শহীদ কে? তারা বললেন, যারা ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নিহত হন তারা শহীদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদ অনেক কম হয়ে যাবে। যারা চাপা পড়ে মারা যায় তারা শহীদ, যারা পানিতে ডুবে মারা যায় তারা শহীদ, যারা পেটের কোনো হঠাৎ পীড়ায় মারা যায় তারা শহীদ।[১] এভাবে তিনি দুর্ঘটনা বা হঠাৎ আকস্মিক মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে মৃত্যু সুযোগ পায় নি। এজন্য আল্লাহ তাকে অতিরিক্ত সম্মান বা মর্যাদা দিয়েছেন। শাহাদাতের মৃত্যু দিয়েছেন।

সড়ক দুর্ঘটনা চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করার মতো। তবে শাহাদাতের

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯১৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৮০৪।

মর্যাদা লাভ করার জন্য ঈমান থাকতে হবে। শুধু ঈমান থাকলে চলবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছেন তারও জাহান্নামের কথা এসেছে। যুদ্ধের ময়দানে সে কিছু সরকারি মাল চুরি করেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তাকে জাহান্নামে পড়তে হবে। শাহাদাতের মর্যাদা একটি মর্যাদা। কিন্তু কুরআন এবং সুন্নাহর অন্যান্য মর্যাদা পাপপুণ্যের সাথে সমন্বিত হতে হবে। একজন মানুষ চুরি করেছেন বা অন্য ব্যক্তির হক নষ্ট করেছেন অথবা শিরক করেছেন, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন বলে মাফ হয়ে গেল এরকম নয়। এজন্য শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার জন্য অন্যান্য অনেক কন্ডিশন রয়েছে। এটা তাকে অবশ্যই করতে হবে।

প্রশ্ন: ১০৮। আমার বাচ্চার বয়স ২ বছর পূর্ণ হবার আগে একজন আলিমকে দুধ পান করানো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আড়াই বছর পর্যন্ত পান করানো যাবে। তারপর হারাম হবে। এখন জানতে পারলাম, দুই বছরের পরে দুধ পান করানো যাবে না। আমার জানার বিষয়, দুই বছরের পরে দুধ পান করানোয় কোনো সুযোগ আছে কি না?

উত্তর: এখানে দুটো বিষয়। একটা হল, কোন পর্যন্ত আমরা আমাদের শিশুকে দুধ খাওয়াব, যেটা শিশুর হক। আরেকটা হল, হারাম হবে কি না। এখানে কনফিউশন হয়, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

মায়েরা সন্তানকে পূর্ণ দুইবছর দুধপান করাবে।২ এটা সন্তানের হক। প্রথমে শুধু মায়ের দুধ, এরপর অন্য খাদ্যের পাশাপাশি মায়ের দুধ, এর আগে যদি খাওয়ানো বন্ধ হয়, তাহলে শিশু তার হক থেকে বঞ্চিত হল। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, এই অধিকারটা আড়াই

২. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত: ২৩৩।

বছর পর্যন্ত সন্তানের হক। এটা একটা ইজতিহাদ। যদিও কুরআনের নসটা দুই বছরই বলে। কিন্তু দুই বছরের পরে খাওয়ালে হারাম হবে কি না। এটা কিন্তু ভিন্ন বিষয়। আমার যতটুকু জানা আছে দুই বছরের পর যদি শিশু মায়ের দুধ খায় তাহলে মায়ের গুনাহ হবে, এরকম কিন্তু নয়। দুইবছর পর্যন্ত খাদ্যটা শিশুর জন্য বৈধ ছিল, দুইবছর এক দিনের দিন খাদ্যটা হারাম হয়ে গেল– এর জন্য শরীআতে নস লাগে। শিশুর জন্য মায়ের দুধ দুইবছর পর হারাম হয়ে যায়, কিংবা মায়ের জন্য খাওয়ানো হারাম হয়ে যায়– এটা বলা হয় সমাজে, কিন্তু এর পক্ষে কোনো দলীল নেই বা কোনো ভালো আলিমের মতামত আমি এখনো দেখতে পাই নি। তবে আমরা দুই বছরের মধ্যেই ছাড়ানোর চেষ্টা করব। দুইবছর পর মায়ের দুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকলে অনেক ক্ষতি হয়। কারণ (এতে অন্য খাবার) খেতে চায় না। কারণ মায়ের দুধ খাবার বদঅভ্যাস তৈরি হয়। এজন্য আমরা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেব।

প্রশ্ন: ১০৯। আমেরিকাতে মসজিদের ভেতরে অনেক কালচারাল প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। সেখানে তারা বিভিন্ন কাসিদা ইসলামি সঙ্গীত– এসব করে থাকে। মসজিদগুলোতে এসব সামাজিক কাজ কতটুকু করা যায়?

উত্তর: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদ থেকে এতই দূরে চলে এসেছি যে, আমাদের কাছে এগুলোকে সমস্যা মনে হচ্ছে। কারণ আমাদের দেশের মসজিদগুলো হয়ে গেছে, ২৪ ঘণ্টায় ৪ ঘণ্টা খুলবে। সালাতের পরেই তালা দিয়ে দেবে। আর মুহাম্মাদ ﷺ এর মসজিদ ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকত। আর আপনি যেগুলো আমেরিকায় দেখছেন, সেগুলো সব রাসুল ﷺ এর মসজিদে হত। মসজিদের ভেতরেই কাসিদা পাঠ হত। মসজিদের পাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়গা করে দিয়েছিলেন কাসিদা পাঠের জন্য। মসজিদের ভেতরে পড়াশোনা হত, বাচ্চাদের

নিয়ে মহিলারা নামাযে আসতেন। কবির জন্য আলাদা মেম্বার করে দেয়া হয়েছিল। বিচার আচার ফতোয়া মাসআলা; আহলে সুফফার জন্য জায়গা ছিল, সামাজিক বিচারগুলো মসজিদের ভেতরে হত। মসজিদ মূলত মুসলিম উম্মাহর কমিউনিটি সেন্টার। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ, অর্থাৎ শাস্তিটা মসজিদে হত না। বাকি সব কিছু মসজিদের ভেতরেই হত। মসজিদের পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা রক্ষা করে, হারাম নয় এ ধরনের সামাজিক সকল কাজ মসজিদে করা যাবে। কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ মসজিদে কালচারাল প্রোগ্রাম হবে, পর্দার সাথে মুসলিমরা সেখানে বসবেন, হারাম নয় এমন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে কালচারাল প্রোগ্রাম হবে। কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: ১১০। মহিলাদের অপবিত্রতার সময় তিলাওয়াতের নিয়ত ব্যতীত দলীল পেশ করার উদ্দেশ্যে একশ্বাসে অথবা শ্বাস ছেড়ে ছেড়ে একাধিক আয়াত একসাথে পড়া যাবে কি না?

উত্তর: মহিলাদের অপবিত্রতার সময় বা অসুস্থতার সময় তিলাওয়াত করা যাবে কি যাবে না– এ বিষয়ে সাহাবিদের যুগ থেকে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রথমত পুরুষদের যে অপবিত্রতা বা অস্থায়ী অপবিত্রতা, তা ইচ্ছা করলে দূর করা যায়। Delay করলে, যে Delay করছে, সে দায়ি। কিন্তু যেটা নিয়মিত শারীরিক অসুস্থতা, বিশেষত মেয়েদের যেটা হয়। সেটা ইচ্ছা করলে দূর করা যায় না। দুটো এক প্রকৃতির নয়। এজন্য কোনো কোনো সাহাবি তাবিয়ি বলেছেন, মেয়েরা এই অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে না। স্পর্শ করার ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।[৩] এবং সাহাবিদের

৩. মুআত্তা মালিক, হাদীস-২৩৪; সুনান দারিমি, হাদীস-২৩১২; তাবারানি, আল মু'জামুল

ইজমা রয়েছে, অপবিত্র অবস্থায় অথবা গোসলের প্রয়োজন হলে সে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। তবে তিলাওয়াতের ব্যাপারে সাহাবিদের যুগ থেকেই ইখতিলাফ রয়েছে। যদিও আমাদের সমাজের মশহুর কথা হলো গোসল ফরয থাকা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। তবে ভিন্নমত আছে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় হল, দলীল প্রদানের জন্য কোনো আয়াতের আংশিক পাঠ করাতে তেমন কোনো আপত্তি কোনো ফকীহ করেন নি।

প্রশ্ন: ১১১। কোনো বিধর্মীকে কি আমরা কুরআন দিতে পারব?

উত্তর: বিধর্মীদের জন্য তো দীনের কোনো বিধানই নেই। এটাতো আমাদের বুঝতে হবে। একজন, যিনি মুসলিম নন, তার জন্য ইসলামের কোনো বিধান প্রযোজ্য নয়। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের ভেতরে অবস্থান করার পারমিশন দিয়েছেন। যদিও তারা হয়তো গোসল করেন না, অযু-গোসল জানেন না। এজন্য বিধর্মীদেরকে আরবি কুরআন দিয়ে কোন লাভ নেই। তাদের কোনো অনুবাদ দিতে হবে। কারণ বিধর্মী তো আরবি পড়তে পারে না। যদি কোনো আরবি ভাষা জানা বিধর্মী থাকেন, ইসলামি বিধানের মুকাল্লাফ না, আমরা শরীআত পালনের জন্য বাধ্য করতে পারি না। এটা ভিন্ন জিনিস। কিন্তু যিনি মুসলিম, তার জন্য দীনের বিধান পালন করা ফরয হয়ে যায়। আর দীনের বিধানের একটা অংশ হল, কুরআন স্পর্শ করতে ওযু লাগে। এটা একটা লজিক্যাল কথা। মানুষ কুরআন মুখস্ত রাখবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন যেখানে লেখা রয়েছে সেটা পবিত্র...।

যারা ধর্ম পালন করেন না তারাও শহীদ মিনারে ওঠার আগে জুতা খুলে রাখেন। পবিত্রতার অনুভূতি তাদের আসে। কাজেই কুরআন

কাবীর, হাদীস-১১৬২, ১৩২১৭; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৩৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-১৯৩৫; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-২৭৫।

স্পর্শ করার জন্য পবিত্র হওয়ার অনুভূতিটা আমাদের থাকা দরকার। এটা আল্লাহর কালামের সম্মান করার একটা পদ্ধতি এবং এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে ইবন কুদামা মুগনিতে ১২ জন সাহাবির নাম নিয়ে লেখেছেন যে, এ ব্যাপারে সাহাবিদের ঐক্যমত রয়েছে যে, কুরআন স্পর্শ করতে হলে তোমাদের পবিত্র হতে হবে। আর এই ১২ জন সাহাবির বিপরীতে কোনো একজন সাহাবি থেকেও ভিন্নমত নেই যে, তিনি বলেছেন স্পর্শ করা যাবে। তবে তিলাওয়াত করার মত আছে। ওযু ছাড়া করা যাবে, গোসল ছাড়াও করা যাবে। এই ব্যাপারে মত আছে।

প্রশ্ন: ১১২। মোবাইলে কি কুরআন শোনা যাবে? কুরআন হাদীসের বাংলা তরজমা মোবাইলে জমা রাখা যাবে কি?

উত্তর: জি! অবশ্যই যাবে। বরং রাখাটাই উচিত। আমরা যত বেশিভাবে পারি নিজেদের সময়গুলোকে কুরআনের পেছনে কাটাব। এক্ষেত্রে অনেকে না বুঝে বলেন যে, মোবাইলে কুরআন শুনলে সাওয়াব হবে না। তাহলে আমি প্রশ্ন করি, মোবাইলে গান শুনলে গোনাহ হবে না!! যদি সাওয়াব গুনাহ মোবাইলের সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে এটাই হওয়ার কথা। অবশ্যই কুরআন মোবাইলে রাখবেন। অনেকে মনে করেন, মোবাইলটা মাটিতে পড়ে থাকে অথবা বাথরুমে যাই...! আসলে এটা তো ডিজিটাল, আমরা যখন বন্ধ করি এটার ভেতরে তখন আর কুরআন থাকে না। তখন এটা ভাঙলেও কুরআন বেরাবে না। কাজেই বন্ধ করার পর এটাকে মাটিতে রাখলে বা এটাকে নিয়ে বাথরুমে গেলে কোনো সমস্যা নেই। কুরআন চালু অবস্থায় মাটিতে রাখা যাবে না বা ফেলা যাবে না

প্রশ্ন: ১১৩। খতনা করার হুকুম কী? কত বছর বয়সে খতনা করা উত্তম? আমাদের এলাকায় একজন নতুন মুসলিম হয়েছে। তার বয়স

৩৫ বছর। তার খতনার বিধান কী?

উত্তর: খতনা করা মূলত একটি ওয়াজিব সুন্নাত। এটাকে সুন্নাত বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ হিসেবে। একটা হাদীস এসেছে, একটু দুর্বলতা আছে, সাত দিনের দিন খতনা করানো। শিশু অবস্থায় খতনা করানোটাই উত্তম। এর পরে যে কোনো সময় করা যেতে পারে, অর্থাৎ যখন সাবালক হয়ে যায়, ১১/১২, তখন তো তার জন্য সতর ফরয হয়ে যায়। এত দূরে নেওয়া উচিত নয়।

যারা নতুন মুসলিম হন তাদের ক্ষেত্রে আলিমরা বলেছেন, তাদের উচিত বয়োপ্রাপ্ত হলেও তাদের খতনা করে নেয়া। এটা তার মুসলিম পরিচয় বোঝানোর জন্য। শারীরিক উপকারের জন্য। এজন্য যদি বয়স হয় তখন তার খতনা করে নেয়া উত্তম। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আছে, তিনি বয়স হলে খতনা করেছিলেন। তখন তার উপর ফরয হয়। ৮০ বছর বয়সে তার উপর খতনা ফরয হয়। আল্লাহ তাঁকে বলেন, খতনা করতে হবে। তখন তিনি ওই অবস্থা খতনা করিয়ে নেন। এটা সুন্নাতে ইবরাহীমি। এটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, ইয়াহুদিরা খতনা করে। এটা ইয়াহুদিদের চিরন্তন বিধান। এটা বাইবেল এভাবে আছে। যদিও খ্রিস্টানরা খতনা করে না। বাইবেলকে ধর্মগ্রন্থ মানে, কিন্তু খতনা করে না। কিন্তু বাইবেলে বলা হয়েছে খতনা করার চিরস্থায়ী বিধান। খতনা না করলে সে সদাপ্রভুর সমাজে ঢুকতে পারবে না। ঈসা মসীহ খতনা করেছেন। তবে সাধুপল উল্টো করেছেন, সাধুপল বলেন, খতনা করা লাগবে না। তিনি আরো বেশি বলেছেন, যদি কেউ খতনা করে তাকে যিশুখ্রিস্ট মুক্তি দিতে পারবে না। তুমি যদি খতনা কর যিশুখ্রিস্ট তোমাকে কোনো কল্যাণ দিতে পারবে না। অর্থাৎ তুমি সব গুনাহ করলে তোমাকে মুক্তি দিতে পারবেন, কিন্তু খতনা করলে আর মুক্তি দিতে পারবেন না।

অর্থাৎ খতনা কিন্তু ইবরাহীমি সুন্নাত। বাইবেলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদিরা খতনা করে। খ্রিস্টধর্মে নির্দেশ আছে। যদিও তারা পালন করে না। আর ইসলামে তো আছেই।

প্রশ্ন: ১১৪। কোনো মেয়ের বাবা-মা আছেন। বাবা-মার খেদমতের জন্য উনি স্বামীর পরিবার থেকে কোনো জিনিস না বলে নিতে পারবেন কি না?

উত্তর: স্বামীর সম্পদ নিজের জন্য খরচ করতে পারবেন। স্বামী যদি দিতে কৃপণতা করেন, না বলেও নিতে পারবেন। তার জন্য, তার সন্তানদের জন্য। কারণ তার এবং তার সন্তানদের জন্য স্বামীর উপর ব্যয় করা ফরয। আর এই ফরযে অবহেলা করলে তিনি নিতে পারবেন। আপনি তো পড়েছেন, বুখারিতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমোদন দিয়েছেন। যেহেতু সে দিচ্ছে না, সুতরাং তুমি নিতে পার। তুমি স্বাভাবিকভাবে যেটা প্রয়োজন সেটা নিতে পার। কিন্তু এর বাইরে নিজের পিতা-মাতাকে দেওয়ার জন্য স্বামীকে না বলে স্বামীর সম্পদ তিনি নিতে পারেন না। স্বামী যদি স্ত্রীকে হাত খরচ দেয়, তবে তা থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন। এটা তো তাকে দেয়া হয়ে গেছে। স্ত্রীর যদি কোনো সম্পদ থাকে, তবে স্বামীকে না বলে তিনি বাবা-মাকে যথা খুশি দিতে পারেন। আর স্বামী এটা জানলে স্ত্রীকে বাধা দিতে পারবে না। এটা স্ত্রীর সম্পদ। কিন্তু স্বামীর সম্পদ থেকে নিয়ে তিনি নিজে খরচ করতে পারবেন, ছেলে-মেয়ের জন্য খরচ করতে পারবেন, কিন্তু পিতা-মাতাকে দিতে হলে স্বামীর অনুমোদন লাগবে।

প্রশ্ন: ১১৫। একভাই প্রশ্ন করেছেন, আমি পথ চলতে গিয়ে রাস্তায় কিছু টাকা পেয়েছি। এখন ওই টাকাটা নিয়ে আমি কী করব?

উত্তর: এই বিষয়ে হাদীস শরীফে খুব স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটা যেখানে পাওয়া গিয়েছে; যদি এমন পরিমাণ হয় কেউ গুরুত্বই

দেবে না, অতিঅল্প, তাহলে ওটা কাউকে দান করে দিলেই হবে। কারণ এটা মানুষ খুঁজবেই না। এটা হারিয়ে গেছে বুঝবেই না। কিন্তু এমন কিছু যদি হয়, যেটা মানুষ স্বভাবতই খুঁজতে পারে, তাহলে যেখানে পাওয়া গেছে ওখানে ঘোষণা দিতে হবে যে, এখানে কিছু সম্পদ বা টাকা বা দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। মালিক নিয়ে যাবেন। একটা ফোন নাম্বার বা ইত্যাদি দিতে হবে। একবছর এটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি সংরক্ষণযোগ্য কিছু হয়। এই সময়ের ভেতরে যদি কেউ এটার খোঁজ না করেন তাহলে যিনি এটা পেয়েছেন তিনি এটাকে ভোগ করতে পারেন অথবা দান করতে পারেন। এটা তার জন্য তখন বৈধ হবে। এরপরেও যদি মালিক এসে চায় তবে মালিককে দিতে হবে অথবা তার কাছ থেকে মাফ নিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন: ১১৬। আমাদের দেশে সালামের সময় পুরুষদের মধ্যে মুসাফাহা করার প্রচলন আছে। কিন্তু মহিলাদের ভেতরে এই ধরনের মুসাফাহা করার কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর: ইসলামের সকল বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্যই হবে, যতক্ষণ না এর ব্যতিক্রম কিছু পাওয়া যাবে। কাজেই মহিলারাও সাক্ষাত করলে, যখন মুসাফাহা করবেন তখন এটা সুন্নাহর ভেতরেই পড়বে। এবং যেটা হাদীস শরীফে এসেছে, দুজন মুসলিম যখন পরস্পরে হাত মেলান গুনাহগুলো হাত দিয়ে ঝরে চলে যায়। সুতরাং মেয়েরা মেয়েরা অবশ্যই মুসাফাহা করবেন। করলে এই সাওয়াবটা তারাও পাবেন। আর পুরুষ মহিলা করতে চাইলে শুধু মাহরামদের সাথে মুসাফাহা করতে পারবে।

লেখকের প্রকাশিত কয়েকটি বই

০১ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
০২ এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
০৩ রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিকির ও ওযীফা
০৪ হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
০৫ ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষনাত্মক পর্যালোচনা
০৬ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
০৭ খুতবাতুল ইসলাম: জুমুয়ার খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
০৮ বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
০৯ ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
১০ ইমাম আবু হানিফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১১ সিয়াম নির্দেশিকা
১২ ইসলামে পর্দা
১৩ মুসলমানী নেসাব: আরাকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল ﷺ
১৪ সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
১৫ সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৬ আল্লাহর পথে দাওয়াত
১৭ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবেবরাত: ফযীলত ও আমল
১৮ সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান
১৯ মুনাজাত ও নামায
২০ বুহুসুন ফী উলূমিল হাদীস (আরবি ভাষায় রচিত)
২১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক ও ইসলামী পোশাকের বিধান
২২ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ
২৩ কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম
২৪ পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা
২৫ মুসনাদ আহমাদ (ইমাম আহমাদ রচিত) বঙ্গানুবাদ, (আংশিক)
২৬ ইযাহারুল হক্ক বা সত্যের বিজয় (আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত), বঙ্গানুবাদ
২৭ ইসলামের তিন মূলনীতি: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বঙ্গানুবাদ)
২৮ ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতি আমীমুল ইহসান রচিত হাদীস ভিত্তিক ফিকহ গ্রন্থ), বঙ্গানুবাদ
২৯ A Woman From Desert
৩০ জিজ্ঞাসা ও জবাব (১ম খণ্ড)
৩১ জামায়াত ও ঐক্য
৩২ ঈদে মিলাদুন্নবী
৩৩ হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা
৩৪ রামাদানের সাওগাত
৩৫ সালাত, দু'আ ও যিক্‌র
৩৬ জিজ্ঞাসা ও জবাব (২য় খণ্ড)
৩৭ জিজ্ঞাসা ও জবাব (৩য় খণ্ড)
৩৮ জিজ্ঞাসা ও জবাব (৪র্থ খণ্ড)
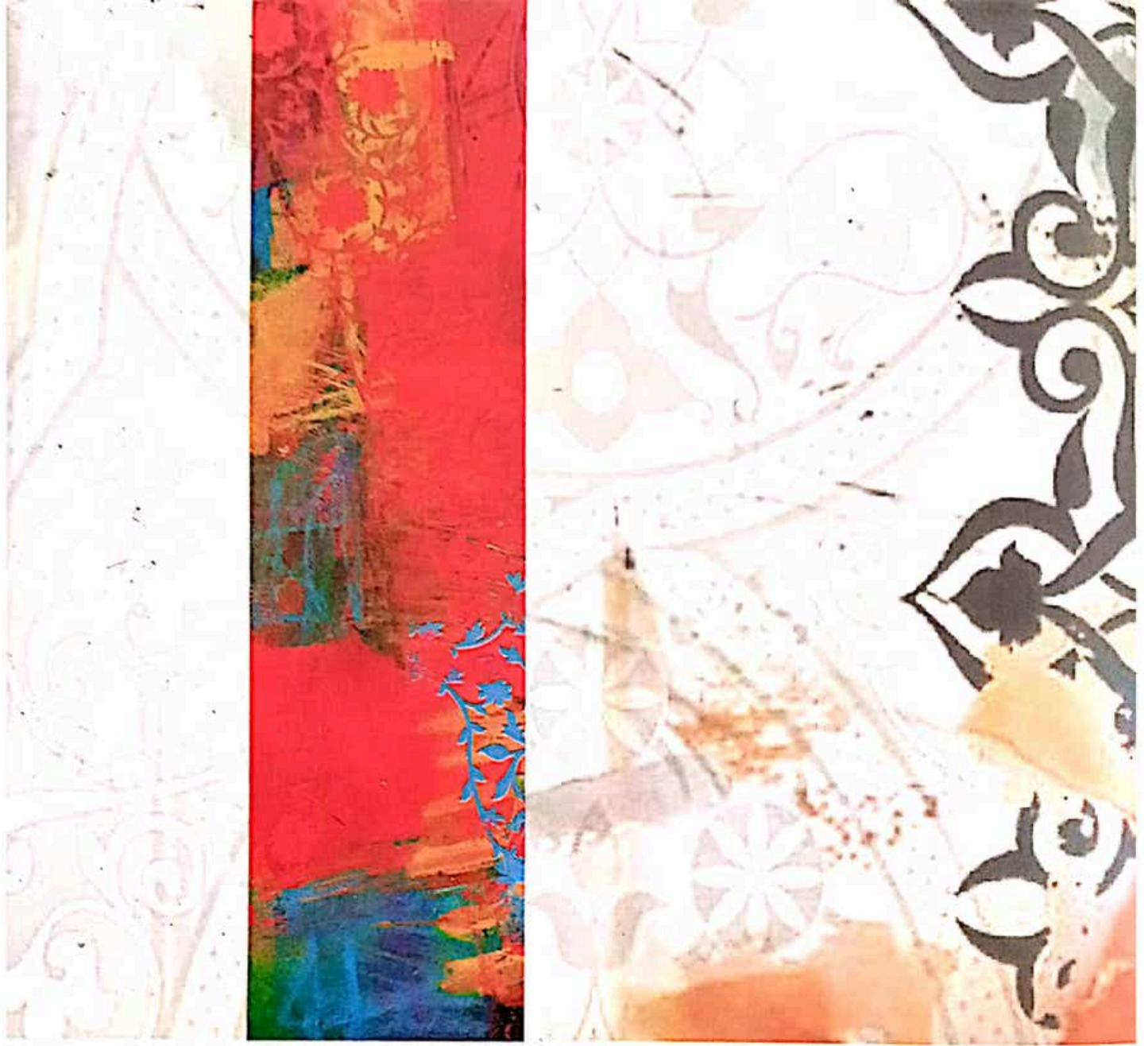
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮

dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust

www.assunnahtrust.com